আসান ফেকাহ

২

মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী

আসান ফেকাহ

২য় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.icsbook.info

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

১৩তম প্রকাশ

সাবান	১৪২৭
ভাদ্র	১৪১৩
সেপ্টেম্বর	২০০৬

বিনিময় মূল্য ঃ ৯৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ASAN FIQAH 2nd Volume by Maulana Mohammad Yousuf Islahee. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 95.00 Only.

দীর্ঘদিন থেকে ইলমে ফেকাহের উপর এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল যা হবে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রত্যেক মুসলিমের জীবনের সর্ব দিকের প্রয়োজন মেটাবে। আল্লাহর শোকর মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত "আসান ফেকাহ" আমাদের সে প্রয়োজন পূর্ণ করেছে।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক জনাব আব্বাস আলী খান কর্তৃক ভাষান্তর হওয়ায় বইটির অনুবাদ যথার্থ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ খণ্ডে 'সাওম', 'যাকাত' ও 'হজ্জ' নামে তিনটি অধ্যায় রয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ইলমে ফিকাহের চারটি মত প্রচলিত রয়েছে, তাহলো হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। এছাড়াও ভিন্ন একটি মতেরও অনুসারী রয়েছে যাঁরা উপরোক্ত চার মতের কারো অনুসরণ করেন না। তাঁরা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের পক্ষপাতী। তাঁরা 'সালাফী' বা 'আহলে হাদীস' নামে পরিচিত। উপরোক্ত সব মতই সঠিক। সব মতের ভিত্তিই কুরআন ও হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেরই প্রচেষ্টা ছিল কুরআন ও হাদীসের সার্বিক অনুসরণ। উপরোল্লেখিত মতপার্থক্যের কারণে একে অন্যের উপর দোষারোপ করা একে অন্যকে দীন থেকে খারেজ মনে করে মুসলিম উম্মার ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির প্রচেষ্টা কোনো মুখলেস হকপন্থীর কাজ হতে পারে না।

উপমহাদেশে সব মতের অনুসারীই রয়েছে। কিন্তু হানাফী মতের অনুসারীদের সংখ্যাই অধিক বিধায় মতপার্থক্য এড়িয়ে শুধুমাত্র হানাফী মতের উপর ভিত্তি করেই এ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। যাতে করে সাধারণ মুসলমান দ্বিধাহীন চিত্তে ও পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে নিজস্ব মাযহাবের অনুসরণ করতে পারে। তবে প্রায় ক্ষেত্রে আহলে হাদীসের অভিমতও সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন যুগে ওলামায়ে কেরাম কোনো কোনো মাসয়ালার ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণার পর বিভিন্ন মতের সুপারিশ করেছেন এসব মতের যেটিকে সঠিক মনে করা হয়েছে তাও টিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে যে চায় প্রশস্ত অন্তকরণে তার উপরও আমল করতে পারে। এছাড়া মাসয়ালা মাসায়েলের সাথে সাথে ইবাদাত ও আমলের ফযীলত ও গুরুত্ব হাদীসের আলোকে বর্ণিত হয়েছে যাতে ইবাদাতের প্রতি অন্তরে জযবা পয়দা হয়।

আমাদের সাফল্য পাঠকদেরই বিচার্য। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তার দীনের পূর্ণ অনুসরণের তাওফীক দিন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

আহকামের ফযীলত ও হেকমত সংক্রান্ত আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ

১. তাফসীরে নাসাফী ২. তাফসীরে খাযেন ৩. তাফসীরে বায়যাবী ৪. তরজমানুল কুরআন–মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ৫. তাফহীমুল কুরআন–মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ৬. তরজমা ও তাফসীর–মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী ৭. সিহাহ সিত্তা ৮. মুয়াত্তা–ইমাম মালেক (র) ৯. রিয়াদুস সালেহীন ১০. আল-আদাবুল মুফরেদ ১১. হিসনে হাসীন ১২. মিশকাত ১৩. এহইয়াও উলুমদ্দীন ১৪. কাশফুল মাহজুব।

মাসায়েল ও আহকামগুলো ইজতেহাদী আলোচনা ছাড়া নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং শুধু মাত্র সর্বসম্মত মতে সাধারণ্যে প্রযোজ্য মাসয়ালাগুলোই গ্রহণ করা হয়েছে।

১. হেদায়া ২. আইনুল হেদায়া–শরহে হেদায়া ৩. ফাতহুল কাদীর ৪. কুদুরী ৫. শরহে বেকায়া ৬. নূরুল ইয়াহ ৭. ফিকহুস সুন্নাহ ৮. ইলমুল ফিকাহ ৯. তা'লীমুল ইসলাম ১০. ইসলামী তা'লীম ১১. আলাতে জাদীদাহ কে শরয়ী আহকাম–মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) ১২. রাসায়েল ও মাসায়েল–মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ১৩. বেহেশতি জেওর ১৪. ফতোয়া–দারুল উলুম দেওবন্দ ইত্যাদি।

সূচীপত্র

যাকাত অধ্যায় ঃ ২১
যাকাতের বিবরণ ঃ ২৩
যাকাতের মর্যাদা ২৩
যাকাতের অর্থ ২৩
যাকাতের মর্মকথা ২৪
যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ২৬
যাকাত পূর্ববর্তী শরীয়তের ২৬
যাকাতের মহত্ব ও গুরুত্ব ২৮
যাকাত অবহেলার ভয়ংকর পরিণাম ৩০
যাকাতের তাকীদ ও প্রেরণা ৩৩
যাকাতের হুকুম ৩৬
যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ৩৬
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ৩৭
যাকাত আদায় সহীহ্ হওয়ার শর্ত ৩৯
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কিছু মাসায়েল ৩৯
যাকাত দানের মাসায়েল ৪১
মালিকানা দানের প্রসংগ ৪৪
যাকাতের নেসাব ৪৯
অর্থনৈতিক ভারসাম্য ৪৯
নেসাবের মধ্যে পরিবর্তনের প্রশ্ন ৫০
সোনা চাঁদির নেসাব ৫১
মুদ্রা ও নোটের যাকাত ৫১
দিরহামের ওজনের যাচাই ৫২
ব্যবসার মালের যাকাত ৫২
অলংকারের যাকাত ৫৩
যাকাতের হার ৫৫
যেসবের উপর যাকাত নেই ৫৬
পশুর যাকাত ৫৮
ভেড়া-ছাগলের নেসাব ও যাকাতের হার ৫৮
নেসাব ও যাকাতের হার আদায় ৫৮

গরু-মহিষের নেসাব ও যাকাতের হার ৫৯
নেসাব ও যাকাতের হার ৫৯
উটের নেসাব ও যাকাতের হার ৬০
নেসাব ও যাকাতের হারের বিবরণ ৬০
যাকাত দানের ব্যাপারে একটি জরুরী ব্যাখ্যা ৬০
কোন্ কোন্ খাতে যাকাত ব্যয় করা যায় ৬১
খাতগুলোর বিশদ বিবরণ ৬২
যাকাতের অর্থ ব্যয় সম্পর্কে কিছু কথা ৬৪
যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয় ৬৫
যাকাতের বিভিন্ন মাসয়ালা ৬৬
ওশরের বিবরণ ৬৯
ওশরের অর্থ ৬৯
ওশরের শরয়ী হুকুম ৬৯
ওশরের হার ৬৯
কোন্ কোন্ জিনিসের ওশর ওয়াজিব ৭০
ওশরের মাসয়ালা ৭১
গুপ্তধন ও খনিজ দ্রব্যাদির মাসয়ালা ৭২
সদকায়ে ফিতরের বয়ান ৭২
সদকায়ে ফিতরের অর্থ ৭২
সদকায়ে ফিতরের তাৎপর্য ও উপকারিতা ৭৩
সদকায়ে ফিতরের হুকুম ৭৩
সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় ৭৪
সদকায়ে ফিতর পরিশোধ করার সময় ৭৪
কাদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব ৭৫
সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ ৭৬
সকদায়ে ফিতরের বিভিন্ন মাসায়েল ৭৬
রোযার অধ্যায় ঃ ৭৭
রোযার বিবরণ ৭৯
রমযানুল মুবারকের ফযীলত ৭৯
কুরআনে রমযানের মহত্ত্ব ও ফযীলত ৭৯
রমযানের ফযীলতের কারণ ৭৯
রমযানের মহত্ত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে হাদীস ৮০
ইতিহাসে রমযানের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব ৮১

রোযার অর্থ ৮১
রোযা ফরয হওয়ার হুকুম ৮২
রোযার গুরুত্ব ৮২
রোযার উদ্দেশ্য ৮৩
প্রকৃত রোযা ৮৩
রোযার ফযীলত ৮৪
রুইয়েতে হেলাল বা চাঁদ দেখার নির্দেশাবলী ৮৪
নতুন চাঁদ দেখার পর দোয়া ৮৭
রোযার প্রকারভেদ ও তার হুকুম ৮৭
রোযার শর্তাবলী ৮৮
রোযার ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ৮৯
রোযা সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী ৮৯
রোযার ফরয ৮৯
রোযার সুন্নাত ও মুস্তাহাব ৯০
কি কি কারণে রোযা নষ্ট হয় ৯০
কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কিছু নীতিগত কথা ৯০
যেসব ব্যাপারে শুধু রোযা কাযা করতে হবে ৯২
যে যে অবস্থায় কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় ৯৪
যেসব জিনিসে রোযা মাকরূহ হয় ৯৪
যেসব জিনিসে রোযা মাকরূহ হয় না ৯৬
রোযার নিয়তের মাসয়ালা ৯৭
সিহ্রী ও ইফতার ৯৯
সিহ্রী বিলম্বে করা ১০০
ইফতার তাড়াতাড়ি করা ১০০
কোন্ জিনিস দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব ১০১
ইফতারের দোয়া ১০২
ইফতারের পরের দোয়া ১০২
ইফতার করাবার সওয়াব ১০২
সিহ্রী ছাড়া রোযা ১০২
যেসব ওজরের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে ১০৩
সফর ১০৩
রোগ ১০৪
গর্ভ ১০৪

স্তন্যদান ---------- ১০৫
ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা ---------- ১০৫
দুর্বলতা ও বার্ধক্য ---------- ১০৫
জীবনের আশংকা ---------- ১০৫
জিহাদ ---------- ১০৬
হুঁশ না থাকা ১০৬
মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া ---------- ১০৬
যেসব অবস্থায় রোযা ভাঙ্গা জায়েয ---------- ১০৬
কাযা রোযার মাসায়েল ---------- ১০৭
কাফ্ফারার মাসায়েল ---------- ১০৮
ফিদিয়া ---------- ১০৯
ফিদিয়ার পরিমাণ ---------- ১০৯
ফিদিয়ার মাসায়েল ---------- ১০৯
রোযার বিভিন্ন হুকুম ও নিয়মনীতি ---------- ১১০
নফল রোযার ফযীলত ও মাসায়েল ১১১
শাওয়ালের ছ' রোযা ---------- ১১১
আশুরার দিনের রোযা ---------- ১১২
আরাফাতের দিনের রোযা ---------- ১১২
আইয়ামে বীযের রোযা ---------- ১১৩
সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা ---------- ১১৩
নফল রোযার বিভিন্ন মাসায়েল ১১৪
তারাবীর নামাযের বয়ান ---------- ১১৪
তারাবীর নামাযের হুকুম ---------- ১১৫
তারাবীর নামাযের ফযীলত ---------- ১১৫
তারাবীহ নামাযের সময় ---------- ১১৫
তারাবীহ্ নামাযের জামায়াত ---------- ১১৬
তারাবীহ্ নামাযের রাকয়াতসমূহ ---------- ১১৭
চার রাকায়াত পরপর বিশ্রামের সময় কি আমল করা যায় ---------- ১১৮
বেতের নামাযের জামায়াত ---------- ১১৯
তারাবীতে কুরআন খতম ১২০
জরুরী হেদায়াত ---------- ১২১
তারাবীহ্ নামাযের বিভিন্ন মাসায়েল ---------- ১২১
কুরআন তেলাওয়াতের নিয়মনীতি ---------- ১২৫

তাহারাত–পাক-পবিত্রতা ১২৫
খাঁটি নিয়ত ১২৫
নিয়মিত পাঠ এবং একে অপরিহার্য মনে করা ১২৫
কুরআন শুনার ব্যবস্থাপনা ১২৬
চিন্তা গবেষণা ১২৭
একনিষ্ঠা ও বিনয় ১২৯
তাউয-তাসমিয়া ১২৯
প্রভাব গ্রহণ ১২৯
আওয়াজে ভারসাম্য ১২৯
তাহাজ্জুদে তেলাওয়াতের বিশেষ যত্ন ১৩০
কুরআন শরীফ দেখে তেলাওয়াতের বিশেষ যত্ন ১৩০
ক্রমিক পদ্ধতির লক্ষ্য ১৩০
মনের গভীর একাগ্রতা ১৩০
তেলাওয়াতের পর দোয়া ১৩০
সিজদায়ে তেলাওয়াতের বয়ান ১৩১
সিজদায়ে তেলাওয়াতের হুকুম ১৩১
সিজদায়ে তেলাওয়াতের স্থানগুলো ১৩১
সিজদায়ে তেলাওয়াতের শর্ত ১৩২
সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ম ১৩৩
সিজদায়ে তেলাওয়াতের মাসায়েল ১৩৩
শুক্‌রানা সিজদাহ ১৩৫
এতেকাফের বয়ান ১৩৬
এতেকাফের অর্থ ১৩৬
এতেকাফের মর্মকথা ১৩৬
এতেকাফের প্রকারভেদ ১৩৬
ওয়াজেব এতেকাফ ১৩৬
মুস্তাহাব এতেকাফ ১৩৬
সুন্নাতে মুয়াক্‌কাদাহ এতেকাফ ১৩৭
সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এতেকাফ ১৩৭
এতেকাফের শর্ত ১৩৭
মসজিদে অবস্থান ১৩৮
নিয়ত ১৩৮
হাদাসে আকবার থেকে পাক হওয়া ১৩৮

রোযা ১৩৮
এতেকাফের নিয়মনীতি ১৩৮
এতেকাফের মসনূন সময় ১৩৯
ওয়াজিব এতেকাফের সময় ১৪০
মুস্তাহাব এতেকাফের সময় ১৪০
এতেকাফের সময়ে মুস্তাহাব কাজ ১৪০
এতেকাফের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয ১৪০
এতেকাফের যেসব কাজ নাজায়েয ১৪২
লায়লাতুল কদর ১৪২
লায়লাতুল কদরের অর্থ ১৪৩
লায়লাতুল কদর নির্ধারণ ১৪৩
লায়লাতুল কদরের খাস দোয়া ১৪৪
সদকায়ে ফিতরের হুকুম-আহকাম ১৪৪
হজ্জের অধ্যায় ঃ ১৪৯
হজ্জের বিবরণ ১৪৯
হজ্জের অর্থ ১৪৯
হজ্জ একটি সার্বিক ইবাদাত ১৫০
হজ্জের হাকীকত ১৫১
হজ্জের মহত্ব ও গুরুত্ব ১৫৩
হজ্জের ফযীলত ও প্রেরণা ১৫৫
হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী ১৫৭
হজ্জ সহীহ হওয়ার শর্ত ১৫৮
হজ্জের আহকাম ১৫৯
মীকাত ও তার হুকুম ১৬০
যুল হুলায়ফাহ ১৬০
যাতে ইরক ১৬০
হুজফাহ ১৬০
কারনুল মানাযেল ১৬১
ইয়ালামলাম ১৬১
হজ্জের ফরয ১৬১
ইহরাম ও তার মাসয়ালা ১৬১
তালবিয়া ও তার মাসয়ালা ১৬৪
তালবিয়ার হিকমত ও ফযীলত ১৬৫

তালবিয়ার পর দোয়া ---------- ১৬৬
ওয়াকুফ ও তার মাসয়ালা ---------- ১৬৮
আরাফাতের ময়দানের দোয়া ১৭১
তাওয়াফ ও তার মাসায়েল ---------- ১৭১
বায়তুল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা ---------- ১৭০
তাওয়াফের ফযীলত ---------- ১৭২
ইস্তেলাম ১৭৩
রুকনে ইয়ামেনীর দোয়া ১৭৪
তাওয়াফের প্রকার ও তার হুকুমাবলী ১৭৪
তাওয়াফের ওয়াজিব সমূহ ---------- ১৭৫
তাওয়াফের দোয়া ---------- ১৭৬
তাওয়াফের মাসায়েল ---------- ১৭৮
রমল ---------- ১৭৮
ইযতেবাগ ---------- ১৭৯
হজ্জের ওয়াজিব সমূহ ---------- ১৭৯
সায়ী ---------- ১৮০
সায়ীর হাকীকত ও হিকমত ---------- ১৮০
সায়ীর মাসায়েল ---------- ১৮২
সায়ী করার পদ্ধতি ও দোয়া ---------- ১৮২
রামী ---------- ১৮৪
রামীর মর্মকথা ও হিকমত ---------- ১৮৪
রামীর মাসায়েল ---------- ১৮৫
রামী করার পদ্ধতি ও দোয়া ---------- ১৮৭
মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটার মাসায়েল ---------- ১৮৭
কুরবানীর বর্ণনা ---------- ১৮৯
মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কুরবানী ---------- ১৮৯
সকল খোদায়ী শরীয়তে কুরবানী ---------- ১৯০
কুরবানী এক বিরাট স্মরণীয় বস্তু ---------- ১৯২
নবী (স)-এর প্রতি নির্দেশ ১৯২
কুরবানীর আধ্যাত্মিক দিক ---------- ১৯৩
কুরবানীর প্রাণ শক্তি ---------- ১৯৪
উট কুরবানীর আধ্যাত্মিক দিক ---------- ১৯৫
কুরবানীর পদ্ধতি ও দোয়া ---------- ১৯৬

কুরবানীর ফযীলত ও তাকীদ ১৯৭
কুরবানীর আহকাম ও মাসায়েল ১৯৮
কুরবানী দাতার জন্য মসনুন আমল ১৯৮
কুরবানীর পশু ও তার হুকুম ১৯৮
কুরবানীর হুকুম ২০১
কুরবানীর দিনগুলো ও সময় ২০২
কুরবানীর বিভিন্ন মাসায়েল ২০৩
মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানী ২০৪
হাদী'র বয়ান ২০৪
আবে যমযম, আদব কায়দা ও দোয়া ২০৬
মুলতাযেম ও তার দোয়া ২০৭
দোয়া কবুলের স্থানসমূহ ২০৮
ওমরা ২০৯
হজ্জের প্রকার ২১১
হজ্জে এফরাদ ২১১
হজ্জে কেরান ২১১
কেরানের মাসায়েল ২১১
হজ্জে তামাত্তু ২১২
তামাত্তুর মাসায়েল ২১৩
নবীর বিদায় হজ্জ ২১৪
জেনায়েতের বয়ান ২২১
হেরেমে মক্কা ও তার মহত্ত্ব ২২১
জেনায়েতে হেরেম ২২২
এহরামের জেনায়েত ২২৩
যাতে দু' কুরবানী ওয়াজিব ২২৩
যেসব জেনায়েতের জন্য এক কুরবানী ২২৪
যেসব জেনায়তে শুধু সদকা ওয়াজিব ২২৫
নীতিগত হেদায়াত ২২৬
শিকারের বিনিময় ২২৭
শিকার ও তার বদলার মাসায়েল ২২৮
এহসারের বয়ান ২২৯
এহসারের কয়েকটা উপায় ২৩০
এহসারের মাসায়েল ২৩০

বদলা হজ্জ ---------- ২৩১
বদলা হজ্জ সহীহ হওয়ার শর্ত ---------- ২৩২
মদীনায় উপস্থিতি ---------- ২৩৪
মদীনা তাইয়েবার মহত্ত্ব ও ফযীলত ---------- ২৩৪
মসজিদে নববীর মহত্ত্ব ---------- ২৩৭
রওযা পাকের যিয়ারত ---------- ২৩৭
রওযা পাকের যিয়ারতের হুকুম ---------- ২৩৮
এক নজরে হজ্জের দোয়া ---------- ২৩৮
হজ্জের স্থানসমূহ ---------- ২৩৯
বায়তুল্লাহ ২৩৯
বাতনে উরনা ---------- ২৩৯
জাবালে রহমত ---------- ২৩৯
জাবালে কাযাহ ---------- ২৪০
জাবালে আরাফাত ---------- ২৪০
হুজফা ---------- ২৪০
জমরাত ---------- ২৪০
হেরেম ---------- ২৪০
হাতীম ---------- ২৪১
যাতে ইরক ---------- ২৪২
যুল হুলায়ফাহ ২৪২
রুকনে ইয়ামেনী ---------- ২৪২
যমযম ---------- ২৪২
সাফা ---------- ২৪২
আরাফাত ---------- ২৪৩
কারনুল মানাযিল ---------- ২৪৩
মুহাস্‌সাব ---------- ২৪৩
মুযদালফা ২৪৩
মাসজিদুল হারাম ২৪৪
মসজিদে নববী ২৪৩
মসজিদে খায়েফ ---------- ২৪৪
মসজিদে নিমরা ---------- ২৪৪
মাশয়ারুল হারাম ২৪৪
মুতাফ ২৪৫

মাকামে ইবরাহীম ২৪৫
মুলতাযেম ২৪৫
মিনা ২৪৬
মাইলাইনে আখদারাইনে ২৪৬
ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সার ২৪৬
ইয়ালামলাম ২৪৬
পরিভাষা ২৪৭
ইহরাম ২৪৭
এহ্‌সার ২৪৭
ইস্তেলাম ২৪৭
ইস্তেবাগ ২৪৭
এতেকাফ ২৪৭
আফাকী ২৪৮
ইফরাদ ২৪৮
আলমাম ২৪৮
উকীয়া ২৪৮
আইয়ামে বীয ২৪৮
আইয়ামে তাশরীফ ২৪৮
তালবিয়া ২৪৮
তামত্তু ২৪৮
তামলিক ২৪৯
জেনায়েত ২৪৯
দমে এহ্‌সার ২৪৯
রমল ২৪৯
রামী ২৪৯
সায়েমা ২৪৯
তাওয়াফে কদুম ২৪৯
তাওয়াফে যিয়ারত ২৫০
তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ ২৫০
ওমরাহ ২৫০
ফিদিয়া ২৫০
কেরান ২৫০
কীরাত ২৫০

কাফ্ফারা ---------- ২৫০
মিসকাল ---------- ২৫১
মুহরেম ---------- ২৫১
মুহাস্সার ২৫১
মীকাত ---------- ২৫১
ওয়াসাক---------- ২৫১
হাদী ---------- ২৫২
ইয়াওমে তারবিয়া ---------- ২৫১
ইয়াওমে আরাফাত ---------- ২৫২
ইয়াওমে নহর ---------- ২৫২

كِتَابُ الزكوة

যাকাত অধ্যায়

যাকাতের বিবরণ

নামায ও যাকাত প্রকৃতপক্ষে গোটা দ্বীনের প্রতিনিধিত্বকারী দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। দৈহিক ইবাদাতে নামায সমগ্র দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করে। আর আর্থিক ইবাদাতে যাকাত সমগ্র দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করে। দ্বীনের পক্ষ থেকে বান্দাহর ওপরে যেসব হক আরোপ করা হয় তা দু' প্রকারের। আল্লাহর হক এবং বান্দাহর হক। নামায আল্লাহর হক আদায় করার জন্যে বান্দাহকে তৈরী করে এবং যাকাত বান্দাহদের হক আদায় করার গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে। আর এ দু' প্রকারের হক ঠিক ঠিক আদায় করার নামই ইসলাম।

যাকাতের মর্যাদা

যাকাত ইসলামের তৃতীয় বৃহৎ রুকন বা স্তম্ভ। দ্বীনের মধ্যে নামাযের পরই যাকাতের স্থান। বস্তুত কুরআন পাকে স্থানে স্থানে ঈমানের পরে নামাযের এবং নামাযের পরে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। যার থেকে একদিকে এ সত্য সুস্পষ্ট হয় যে, দ্বীনের মধ্যে নামায এবং যাকাতের মর্যাদা কতখানি। অপরদিকে এ ইংগিতও পাওয়া যায় যে, নামাযের পরে মর্যাদা বলতে যাকাতেরই। এ তথ্য নবী পাক (স)-এর হাদীস থেকেও সুস্পষ্ট হয় ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মায়ায বিন জাবাল (রা)-কে ইয়ামেনে পাঠাবার সময় নিম্নোক্ত অসিয়ত করেন ঃ তুমি সেখানে এমন সব লোকের মধ্যে পৌঁছতেছ যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছিল। তুমি সর্ব প্রথম তাদেরকে ঈমানের সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দেবে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল।' তারা যখন এ সত্য স্বীকার করে নেবে তখন তাদেরকে বলে দেবে যে, আল্লাহ্ রাত ও দিনের মধ্যে তাদের ওপর পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা এটাও মেনে নিলে তাদেরকে বল যে, আল্লাহ্ তাদের ওপর সাদকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তা নেয়া হবে তাদের সচ্ছল ব্যক্তিদের কাছ থেকে এবং বন্টন করা হবে তাদের মধ্যকার অক্ষম ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে। তারা একথাও যখন মেনে নেবে তখন যাকাত আদায় করার সময় বেছে বেছে তাদের ভালো ভালো মাল নেবে না এবং মযলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ মযলুম ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দার প্রতিবন্ধকতা থাকে না।-(বুখারী, মুসলিম)

যাকাতের অর্থ

যাকাতের অর্থ পাক হওয়া, বেড়ে যাওয়া, বিকশিত হওয়া। ফেকার পরিভাষায় যাকাতের অর্থ হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদাত। প্রত্যেক সাহেবে

নেসাব মুসলমান তার মাল থেকে শরীয়াতের নির্ধারিত পরিমাণ মাল ঐসব লোকদের জন্যে বের করবে শরীয়াত অনুযায়ী যাকাত নেয়ার যারা হকদার।

যাকাত দিলে মাল পাক পবিত্র হয়। তারপর আল্লাহ্ মালে বরকত দান করেন। তার জন্যে আখেরাতে যাকাত দানকারীকে এতো পরিমাণ প্রতিদান ও পুরস্কার দেন যে, মানুষ তা ধারণাও করতে পারে না। এজন্যে এ ইবাদাতকে যাকাত অর্থাৎ পাককারী এবং বর্ধিতকারী আমল বলা হয়েছে।

যাকাতের মর্মকথা

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যখন মু'মিন তার প্রিয় এবং পছন্দসই মাল আল্লাহর পথে সন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় করে তখন সে মু'মিনের দিলে এক নূর এবং উজ্জ্বলতা পয়দা হয়। বস্তুগত আবর্জনা ও দুনিয়ার মহব্বত দূর হয়ে যায়। তারপর মনের মধ্যে একটা সজীবতা, পবিত্রতা এবং আল্লাহর মহব্বতের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। অতপর তা বাড়তেই থাকে। যাকাত দেয়া স্বয়ং আল্লাহর মহব্বতের স্বরূপ এবং এ মহব্বত বাড়াবার কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য উপায়ও।

যাকাতের মর্ম শুধু এ নয় যে, তা দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তের ভরণ-পোষণ ও ধনের সঠিক বণ্টনের একটা প্রক্রিয়া-পদ্ধতি। বরঞ্চ তা আল্লাহ তায়ালার ফরয করা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতও বটে। এছাড়া না মানুষের মন ও রূহের পরিশুদ্ধি বা পবিত্রকরণ সম্ভব আর না সে আল্লাহর মুখলেস ও মুহসেন (সৎ) বান্দাহ হতে পারে। যাকাত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের জন্যে তার শোকর গুযারীর বহিঃপ্রকাশ। অবশ্যি আইনগত যাকাত এই যে, যখন সচ্ছল লোকের মাল এক বছর পার হয়ে যাবে তখন সে তার মাল থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ হকদারদের জন্যে বের করবে। কিন্তু যাকাতের মর্ম শুধু তাই নয়। বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা এ আমলের দ্বারা মু'মিনের দিল থেকে দুনিয়ার সকল প্রকার বস্তুগত মহব্বত বের করে নিয়ে সেখানে তার আপন মহব্বত বসিয়ে দিতে চান। এভাবে তিনি তরবিয়ত দিতে চান যে, মু'মিন আল্লাহর পথে তার মাল জান সকল শক্তি ও যোগ্যতা কুরবান করে রূহানী শান্তি ও আনন্দ লাভ করুক। সবকিছু আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞতার আবেগ প্রকাশ করুক যে, আল্লাহ তার ফযল ও করমে তারপথে জানমাল কুরবান করার তাওফীক তাকে দিয়েছেন। এজন্যে শরীয়াত যাকাতের একটা আইনগত সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছে যে, এতোটুকু ব্যয় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য। এতোটুকু খরচ না করলে তো ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার সাথে সাথে সর্বশক্তি দিয়ে এ প্রেরণাও দিয়েছে যে, একজন মু'মিন যেন অতটুকু ব্যয় করাকেই যথেষ্ট মনে না করে। বরঞ্চ বেশী বেশী আল্লাহর পথে

খরচ করার অভ্যাস যেন করে। নবী (স) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর জীবন থেকেও এ সত্যই আমাদের সামনে প্রকটিত হয়।

হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী পাক (স)-এর দরবারে হাযির হলো। সে নবীর কাছে সওয়াল করলো। তখন নবী (স)-এর কাছে এতো সংখ্যক ছাগল ছিল যে, দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা ছাগলে পরিপূর্ণ ছিল। নবী (স) সওয়ালকারীকে সেসব ছাগল দান করে দিলেন। সে যখন তার কওমের কাছে ফিরে গেল তখন তাদেরকে বললো—লোকেরা ! তেমারা সব মুসলমান হয়ে যাও। মুহাম্মাদ (স) এতোবেশী পরিমাণে দান করেন যে, অভাবগ্রস্ত হওয়ার কোনো ভয় আর থাকে না।—(কাশফুল মাহজুব)

একবার হযরত হুসাইন (রা)-এর দরবারে এক ভিখারী এসে বললো—হে নবীর পৌত্র আমার চারশ' দিরহামের প্রয়োজন। হযরত হুসাইন (রা) তক্ষণি ঘর থেকে চারশ' দিরহাম এনে তাকে দিয়ে দিলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কাঁদছি এজন্যে যে, তার চাইবার আগেই তাকে কেন দিয়ে দিলাম না যার জন্যে তাকে সওয়াল করতে হলো। কেন এ অবস্থা হলো যে, সে ব্যক্তি আমার কাছে এসে ভিক্ষার জন্যে হাত বাড়ালো ?—(কাশফুল মাহজুব)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার বাড়ীতে একটি ছাগল যবেহ হলো। নবী (স) ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ছাগলের গোশত কিছু আছে কিনা ? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, শুধু একটা রান বাকী আছে (আর সব বন্টন করা হয়েছে)। নবী বললেন, না বরঞ্চ ঐ রান ছাড়া আর যা কিছু বন্টন করা হয়েছে তাই আসলে বাকী রয়েছে (যার প্রতিদান বা মূল্য আখেরাতে আশা করা যায়।—(জামে তিরমিযি)

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা) বলেন, নবী (স) তাকে বলেন, আল্লাহর ভরসা করে মুক্ত হস্তে তার পথে দান করতে থাক। গুণে গুণে হিসেব করে দেবার চক্করে পড়ো না যেন। গুণে গুণে আল্লাহর রাস্তায় দান করলে তিনিও গুণে গুণেই দিবেন। সম্পদ গচ্ছিত করে রেখো না। নতুবা আল্লাহও তোমার সাথে এ ব্যবহারই করবেন এবং অগণিত সম্পদ তোমার হাতে আসবে না। অতএব যতোটা হিম্মত কর খোলা হাতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। —(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তার প্রত্যেক বান্দাহকে বলেন, হে বনী আদম ! আমার পথে খরচ করতে থাক।

আমি আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে দিতে থাকবো।-(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু যার (রা) বলেন, একবার আমি নবী (স)-এর দরবারে হাযির হলাম। তিনি তখন কা'বা ঘরের ছায়ায় আরাম করছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, কা'বার রবের কসম। ওসব লোক ভয়ানক ক্ষতির সম্মুখিন। বললাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কুরবান হোক, বলুন তারা কে যারা ভয়ানক ক্ষতির সম্মুখিন। ইরশাদ হলো, ঐসব লোক যারা পুঁজিপতি ও সচ্ছল। হাঁ, তাদের মধ্যে ঐসব লোক ক্ষতি থেকে নিরাপদ যারা খোলা মনে সামনে-পেছনে, ডানে-বামে তাদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করছে। কিন্তু মালদারের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।-(বুখারী, মুসলিম)

যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

যাকাত ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে মু'মিনের দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত ও তার মূল থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে আল্লাহর মহব্বত পয়দা করতে চায়। এটা তখনই সম্ভব যখন মু'মিন বান্দাহ শুধু যাকাত দিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। বরঞ্চ যাকাতের সে প্রাণশক্তি নিজের মধ্যে গ্রহণ করার চেষ্টা করে এবং মনে করে আমার কাছে যাকিছু আছে তা সবই আল্লাহর। সেসব তাঁরই পথে খরচ করেই তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যেতে পারে। যাকাতের ঐ প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য আত্মস্থ না করে না কেউ আল্লাহর জন্যে মহব্বত করতে পারে, আর না আল্লাহর হক জেনে নিয়ে তা পূরণ করার জন্যে সজাগ ও মুক্ত হস্ত হতে পারে।

যাকাত ব্যবস্থা আসলে গোটা ইসলামী সমাজকে কৃপণতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, মনের কঠিনতা এবং শোষণ করার সূক্ষ্ম প্রবণতা থেকে পাক পবিত্র করে। তার মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, ত্যাগ, দয়া-দাক্ষিণ্য, নিষ্ঠা, শুভাকাঙ্ক্ষা, সহযোগিতা, সাহচর্য প্রভৃতি উন্নত ও পবিত্র প্রেরণার সঞ্চার করে এবং সেগুলোকে বিকশিত করে। এ কারণেই যাকাত প্রত্যেক নবীর উম্মতের ওপর ফরয ছিল। অবশ্যি তার নেসাব এবং ফেকার হুকুম-আহকামের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কিন্তু যাকাতের হুকুম প্রত্যেক শরীয়াতের মধ্যেই ছিল।

যাকাত-পূর্ববর্তী শরীয়াতে

যাকাতের এ মর্মকথা ও প্রাণশক্তি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলে জানা যায় যে, যাকাত মুমিনের জন্যে একটি অপরিহার্য আমল এবং একটি অপরিহার্য

গুণ। এ কারণে প্রত্যেক নবীর শরীয়াতে এর হুকুম বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়।

কুরআন সাক্ষ্য দেয় যে, যাকাত সকল আম্বিয়ার উম্মতের ওপর তেমনি ফরয ছিল যেমন নামায ফরয। সূরা আম্বিয়াতে হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ)-এর প্রসঙ্গে বর্ণনার পর বিস্তারিতভাবে সে চিন্তামূলক কথোপকথন বর্ণনা করা হয়েছে যা হযরত ইবরাহীম (আ) ও তার জাতির মধ্যে হয়েছিল। অতপর এ প্রসঙ্গেই হযরত লূত (আ) হযরত ইসহাক (আ) এবং হযরত ইয়াকুব (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝(الانبياء : ٧٣)

"এবং আমরা তাদের সকলকে নেতা বানিয়েছি। তারা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী হেদায়াতের কাজ করতো। এবং আমরা তাদেরকে ওহীর মাধ্যমে নেক কাজ করার, নামাযের ব্যবস্থাপনা করার, যাকাত দেয়ার হেদায়াত করেছিলাম এবং তারা সকলে ইবাদাতকারী বান্দাহ ছিল।"

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঐ ওয়াদা ও শপথের উল্লেখ করা হয়েছে যা ইহুদীদের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। তার গুরুত্বপূর্ণ দফাগুলোর মধ্যে একটি দফা এটাও ছিল যে, তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ـ(البقرة ٨٣)

"এবং স্মরণ কর সেই কথা যখন আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট পাকা ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া তোমরা কারো বন্দেগী যেন না কর, মা-বাপের সাথে যেন ভালো ব্যবহার কর। আত্মীয়-স্বজন এতীম ও মিসকীনের সাথেও যেন ভালো ব্যবহার কর এবং লোকের সাথে ভালোভাবে কথা বলবে। নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।"

—(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩)

অন্য একস্থানে বনী ইসরাঈলকেই আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ ـ

"এবং আল্লাহ (বনী ইসরাঈলকে) বলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি যদি তোমরা নামায কায়েম করতে থাক এবং যাকাত দিতে থাক।"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১২)

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র এবং নবী (স)-এর পূর্ব পুরুষ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে কুরআন বলে যে, তিনি তার আপন লোকজনদেরকে নামায কায়েম করার ও যাকাত দেয়ার তাকীদ করতেন ঃ

وَكَانَ يَامُرُ اَهْلَه بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّه مَرْضِيًّا ○(مريم ٥٥)

"এবং (ইসমাঈল) তার আপন লোকজনকে নামায ও যাকাতের জন্যে তাকীদ করতো এবং সে তার রবের পছন্দসই বান্দাহ ছিল।"

–(সূরা মরিয়ম ঃ ৫৫)

হযরত ঈসা (আ) তাঁর পরিচয় পেশ করতে গিয়ে তাঁর নবুয়াতের পদে ভূষিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই এটা বলেন, আমার আল্লাহ আমাকে আজীবন নামায কায়েম করার ও যাকাত দেয়ার অসিয়ত করেন।

وَاَوْصٰنِى بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ○(مريم ٣١)

"এবং তিনি আমাকে হুকুম করেছেন যে, নামায কায়েম করি এবং যাকাত দিতে থাকি যতোদিন বেঁচে থাকবো।"–(সূরা মরিয়ম ঃ ৩১)

যাকাতের মহত্ব ও গুরুত্ব

ইসলামে যাকাতের যে অসাধারণ মহত্ব ও গুরুত্ব রয়েছে তার অনুমান এর থেকে করা যায় যে, কুরআন পাকে অন্তত বত্রিশ স্থানে নামায ও যাকাতের এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের পর প্রথম দাবীই হচ্ছে নামায ও যাকাতের। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি ইবাদাত পালন করার অর্থ গোটা দ্বীন পালন করা। যে বান্দাহ মসজিদের মধ্যে আল্লাহর সামনে গভীর আবেগ সহকারে তার দেহ ও মন বিলিয়ে দেয়, সে মসজিদের বাইরে আল্লাহর হক কিভাবে অবহেলা করতে পারে ? ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি তার প্রিয় ধন-সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আল্লাহর পথে সন্তুষ্ট চিত্তে বিলিয়ে দিয়ে মনে গভীর শান্তি অনুভব করে, সে অন্যান্য বান্দাদের হক কিভাবে নষ্ট করতে পারে ? আর ইসলাম তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও বান্দার হকেরই বহিঃপ্রকাশ। এজন্যে কুরআন নামায এবং যাকাতকে ইসলামের পরিচায়ক এবং ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশের সাক্ষ্য বলে গণ্য করে। সূরা তাওবায় আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা ও অসন্তোষ প্রকাশের পর মুসলমানদেরকে এ হেদায়াত দেন যে, তারা যদি কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে নামায কায়েম করতে ও

যাকাত দিতে থাকে, তাহলে তারা দ্বীনী ভাই বলে গণ্য হবে। তারপর ইসলামী সমাজে তাদের সেস্থান হবে যা মুসলমানদের আছে।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط

"যদি তারা (কুফর ও শিরক থেকে) তাওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।"

-(সূরা আত তাওবা ঃ ১১)

এ আয়াত একথাই বলে যে, নামায ও যাকাত ইসলামের সুস্পষ্ট আলামত এবং অকাট্য সাক্ষ্য। এজন্যে কুরআন যাকাত না দেয়াকে মুশরিকদের নিদর্শন ও কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেছে। এ ধরনের লোককে আখেরাতে অস্বীকারকারী ও ঈমান থেকে বঞ্চিত বলা হয়েছে।

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

"ধ্বংস ওসব মুশরিকদের জন্যে যারা যাকাত দেয় না এবং আখেরাত অস্বীকার কারী।"-(সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৬-৭)

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর খেলাফত কালে যখন কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করলো তখন তিনি তাদেরকে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ও মুরতাদ হওয়ার সমতুল্য মনে করলেন এবং ঘোষণা করলেন, এসব লোক নবীর যামানায় যে যাকাত দিতো তার মধ্য থেকে একটি ছাগলের বাচ্চা দিতেও যদি অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবো। হযরত উমর (রা) সিদ্দিকে আকবরকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনি তাদের বিরুদ্ধে কি করে জেহাদ করবেন—যেহেতু তারা কালেমায় বিশ্বাসী। তিনি আরও বলেন, নবী (স)-এর ইরশাদ হচ্ছে যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে তার জান মাল আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ। হযরত আবু বকর (রা) তার দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করে বলেন।

وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ـ (بخارى ومسلم)

"আল্লাহর কসম যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করবো।-(বুখারী, মুসলিম)[১]

---

১. হযরত আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদের যুক্তি হিসেবে সূরা তাওবার ৫নং আয়াত পেশ করেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ـ

"তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও।"-(অনুবাদক)

নামায ও যাকাত দ্বীনের এমন দুটি রুকন বা স্তম্ভ যা অস্বীকার করলে অথবা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করলে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে পড়া এবং মুরতাদ হওয়ার সমতুল্য। আর মু'মিনের কর্তব্য হচ্ছে মুরতাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেন, আমাদেরকে নামায পড়ার এবং যাকাত দেয়ার হুকুম করা হয়েছে। যে যাকাত দেবে না, তার নামাযও নেই।-(তাবারানী)

যারা যাকাত দেয়া থেকে বিরত, কুরআন তাদেরকে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত বলেছে ঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ (البقرة ٢-٣)

"হেদায়াত ঐসব মুত্তাকীদের জন্যে যারা গায়েবের ওপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং যা আমি তাদেরকে দিয়েছি তার থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২-৩)

কুরআনের দৃষ্টিতে সত্যিকার অর্থে তারাই সাচ্চা মু'মিন যারা যাকাত দেয়-

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط -(انفال : ٣-٤)

"যারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তার থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে তারাই সাচ্চা মু'মিন।"-(সূরা আনফাল ঃ ২-৩)

নবী করীম (স) যাকাতের মহত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, আল্লাহর বান্দাহদের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। অপরদিকে কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাহদের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একজন জাহেল দানশীল একজন কৃপণ আবেদের তুলনায় আল্লাহর নিকটে অনেক বেশী পসন্দনীয়।"-(তিরমিযি)

যাকাত অবহেলার ভয়ংকর পরিণাম

যাকাতের অসাধারণ গুরুত্বের কারণে, কুরআন ঐসব লোকদের জন্যে চরম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা বলেছে যারা যাকাত দেয় না। ক্ষয়শীল ধন-

সম্পদের মহব্বতে উন্মত্ত হয়ে তারা যেন ভয়াবহ পরিণাম ডেকে না আনে, তার জন্যে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তারা যেন সে ভয়াবহ শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, যার ধারণা করতেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

"যারা সোনা চাঁদি জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (সে শাস্তি হলো এই যে,) এমন একদিন আসবে যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেসব সোনা চাঁদি উত্তপ্ত করা হবে এবং তারপর তা দিয়ে তাদের চেহারা ও মুখমণ্ডল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে) এ হলো সেই ধন-সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে। অতএব এখন তোমাদের জমা করা সম্পদের আস্বাদ গ্রহণ করো।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪-৩৫)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এ আয়াতে كنز বলে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা বলতে কি বুঝায়। তিনি বলেন كنز বলতে সে ধন-সম্পদ বুঝায় যার যাকাত দেয়া হয়নি। যারা যাকাত দেয় না তাদেরকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে নবী (স) আখেরাতের ভয়ংকর আযাবের চিত্র এভাবে এঁকেছেন।

"যাকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দিয়েছেন তারপর সে তার ধনের যাকাত দিলো না। তখন তার ধনকে কিয়ামতের দিন বিষধর সাপের রূপ দেয়া হবে। বিষের তীব্রতায় সে সাপের মাথা লোমহীন হবে। তার চোখে দুটি কালো দাগ হবে। কেয়ামতের দিন সে যাকাত না দেয়া কৃপণ ব্যক্তির গলা জড়িয়ে ধরবে এবং তার দু' চোয়ালে তার বিষধর দাঁত বসিয়ে দিয়ে বলবে আমি তোর ধন-সম্পদ আমি তোর সঞ্চিত ধন-দৌলত।"

তারপর নবী (স) নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط-(ال عمران ١٨٠)

"যাদেরকে আল্লাহ তার অনুগ্রহে ধন-দৌলত দিয়েছেন এবং কৃপণতা করে তারা যেন এ ধারণা না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্যে মংগলজনক, বরঞ্চ এ তাদের জন্যে অত্যন্ত অমংলজনক। কৃপণতা করে যাকিছু তারা জমা করে রেখেছে কেয়ামতের দিন তা হাঁসুলি বানিয়ে তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০)

উপরন্তু নবী পাক (স) যাকাত অবহেলা করার ভয়ানক পরিণাম থেকে বাঁচার জন্যে সাহাবায়ে কেরামকে নসীহত করেন, তিনি বলেন–

"কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আমার কাছে এ অবস্থায় না আসে যে, তার ছাগল তার ঘাড়ের ওপর চাপানো থাকবে এবং সে সাহায্যের জন্যে আমাকে ডাকবে। আমি তখন বলবো আজ তোমার জন্যে আমি কিছুই করতে পারবো না। আমি তোমাকে আল্লাহর হুকুম আহকাম পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর দেখ, সেদিন তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার উট তার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে আমার নিকটে না আসে। সে সাহায্যের জন্যে আমাকে ডাকবে এবং আমি তাকে বলবো আজ তোমার জন্যে আমি কিছুই করতে পারবো না। আমি তো আল্লাহর হুকুম আহকাম তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।"–(বুখারী)

একদিন নবী (স) দেখলেন যে, দু'জন মহিলা হাতে সোনার কংকন পরিধান করে আছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এর যাকাত দাও কিনা। তারা না বললে নবী বললেন, তোমরা কি তাহলে এটা চাও যে, এ সবের পরিবর্তে তোমাদের আগুনের কংকন পরানো হবে? তারা বললো—না না, কখনোই না।

তখন নবী (স) বললেন, এ সবের যাকাত দিতে থাকো।–(তিরমিযি)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেন, নবী (স) খুতবা দিতে গিয়ে বলেন, হে লোকেরা! লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকো। তোমাদের পূর্বে যারা ধ্বংস হয়েছে তারা এ লোভ-লালসার জন্যেই হয়েছে। লোভ তাদের মধ্যে কৃপণতা ও মনের সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেছিল। ফলে তারা কৃপণ ও ধনের পূজারী হয়ে পড়ে। এ তাদেরকে আপনজনের প্রতি দয়া মায়ার সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্রেরণা দেয় এবং তারা দয়া মায়া ছিন্ন করার অপরাধ করে বসে। এ তাদেরকে পাপাচারে প্রেরণা দেয় এবং তারা পাপাচার করে।–(আবু দাউদ)

কুরআন ও সুন্নাতের এসব সাবধান বাণীর ফলে সাহাবায়ে কেরাম (রা) [illegible]—সপকার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। অনেকের অনুভূতি এতোটা

তীব্র ছিল যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কপর্দকও কাছে রাখা হারাম মনে করতেন। আবু যর (রা)-এর তো চির অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি একত্রে কিছু লোক দেখতেন তখন যাকাতের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

যাকাতের তাকীদ ও প্রেরণা

যাকাতের অসাধারণ গুরুত্ব ও মহত্বের কারণে কুরআন পাকের বিরাশি স্থানে এর তাকীদ করা হয়েছে। সাধারণত নামায ও যাকাতের কথা এক সাথে বলা হয়েছে। যেমন ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ـ

"এবং নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও।"

কুরআন ও সুন্নাতে তার বিরাট দ্বীনী ও দুনিয়াবী ফায়দার কথা বলে বিভিন্নভাবে এজন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○(البقرة ٢٦١)

"যারা তাদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের এ খরচের দৃষ্টান্ত একটি শস্যদানার মতো যে দানা থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রত্যেক শীষে একশটি দানা হয়। এভাবে আল্লাহ যে আমলকে চান তাকে বাড়িয়ে দেন এবং আল্লাহ প্রশস্ত ও মুক্ত হস্ত এবং জ্ঞানী।"-(সূরা বাকারা ঃ ২৬১)

কৃষক তার শস্যবীজ আল্লাহর যমীনের কাছে হস্তান্তর করে আশায় দিন গুণতে থাকে এবং বৃষ্টির জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে। তারপর আল্লাহ তাকে একটি বীজের পরিবর্তে অগণিত শস্য কণা দান করেন। এ ঈমান উদ্দীপক অভিজ্ঞতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে আল্লাহ একথা বুঝাতে চান যে, বান্দাহ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যাকিছু খরচ করবে আল্লাহ তা এতোটা বাড়িয়ে দেবেন যে, এক একটি দানার বিনিময়ে সাতশ' দানা দান করবেন। বরঞ্চ এর চেয়ে অধিকও তিনি দিতে পারেন। বান্দাহর গভীর নিষ্ঠা এবং আবেগ উচ্ছ্বাসের স্বীকৃতি আল্লাহ দিয়ে থাকেন। তিনি এতো পরিমাণে দান করেন যে, বান্দাহ তার ধারণাই করতে পারে না। আর এ দান ও [illegible] আখেরাতের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়, বরঞ্চ দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা [illegible] সমাজকে মংগল ও বরকত, সচ্ছলতা ও উন্নতি দান করে থাকেন।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -(روم ٣٩)

"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তোমরা যে যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার মাল বর্ধিত করে।"-(সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যাকাত, সদকা প্রভৃতি তারাই দেয় যারা উদার, দানশীল, পরস্পর সহানুভূতিশীল, শুভাকাঙ্ক্ষী। আর এসব গুণাবলী সৃষ্টি করে যাকাত ও সদকা। দুনিয়াতে মংগল ও বরকত, শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি ও সচ্ছলতা ঐ সমাজের ভাগ্যে জোটে যার লোকের মধ্যে এসব গুণাবলী সাধারণভাবে পাওয়া যায়, ধন মুষ্টিমেয় স্বার্থপর, সংকীর্ণচেতা ও কৃপণের হাতে পুঞ্জিভূত হয় না। বরঞ্চ গোটা সমাজে তার সুষম বন্টন হয় এবং সকলের আপন আপন সাহস ও যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকা অর্জন ও খরচ করার স্বাধীনতা থাকে এবং সকলে একই প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুরও সদকা করে, আল্লাহ সেটা নিজ হাতে নিয়ে বর্ধিত করতে থাকেন যেমন তোমরা তোমাদের সন্তান প্রতিপালন কর, তারপর সেটা একটা পাহাড়ের সমান হয়ে যায়।-(বুখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) আরও বলেন, নবী (স) বলেছেন, সদকা দেয়াতে মাল কম হয় না (বেড়েই যায়) কাউকে ক্ষমা করাতে মহত্বই বাড়ে (তাতে অপমান হয় না) এবং যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর জন্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাকে উচ্চমর্যাদা দান করেন।-(মুসলিম)

কুরআন সুস্পষ্ট করে বলে যে, অন্তরকে পাক-পবিত্রকারী, সৎ পথের পথিক, হিকমতের গুণে গুণান্বিত, আল্লাহর সন্তুষ্টি, মাগফেরাত ও রহমত লাভকারী, আখেরাতের চিরন্তন শান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ঐসব লোক যারা সন্তুষ্টচিত্তে হরহামেশা যাকাত দিয়ে থাকে।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -(توبة ١٠٣)

"(হে নবী!) তাদের মাল থেকে সদকা গ্রহণ করে তাদেরকে পাক কর এবং নেকীর পথে তাদেরকে অগ্রসর কর।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩)

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ج وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ط -(البقرة : ٢٦٨-٢٦٩)

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব ও দৈন্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল ও লজ্জাজনক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করায় প্ররোচনা দেয়। অন্যদিকে আল্লাহ তোমাদেরকে তার মাগফেরাত ও করুণার আশ্বাস দেন এবং তিনি মুক্তহস্ত এবং বিজ্ঞ। তিনি যাকে চান হিকমত দান করেন। আর যে হিকমত লাভ করে প্রকৃতপক্ষে সে বিরাট সম্পদ লাভ করে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৮-২৬৯)

وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ط اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ط
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○(توبة ٩٩)

"এবং তারা যাকিছু আল্লাহর পথে খরচ করে তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে রহমতের দোয়া নেবার উপায় বানায়। মনে রেখো, এ অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে নিয়ে নেবেন। নিসন্দেহে তিনি ক্ষমা ও দয়াশীল।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৯৯)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى○ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَا لَهٗ يَتَزَكّٰى○(اليل : ١٧-١٨)

"এবং জাহান্নামের আগুন থেকে ঐ ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে এবং যে এজন্য অপরকে মাল দান করে যাতে করে তার মন কৃপণতা, লোভ ও দুনিয়ার মোহ থেকে পাক হয়।"
–(সূরা আল লাইল ঃ ১৭-১৮)

"হযরত আদী বিন হাতিম (রা) বলেন, নবী (স)-কে একথা বলতে শুনেছি —হে লোকেরা! জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ, খুরমা-খেজুরের এক টুকরা দিয়ে হলেও।"–(বুখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, "কেয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশ ছাড়া যখন কোথাও কোনো ছায়া থাকবে না, তখন সাত রকমের লোক আরশের ছায়ায় থাকতে পারবে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন হবে, যে এমন গোপনে আল্লাহর পথে খরচ করে যে, তার বাম হাত জানতে পারবে না ডান হাত কি খরচ করলো।"–(বুখারী)

নবী (স)-এর দরবারে যখন কেউ সদকার মাল নিয়ে হাযির হতো যখন তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন এবং তার জন্যে রহমতের দোয়া করতেন। একবার হযরত আবু আওফা (রা) সদকা নিয়ে নবীর দরবারে হাযির হন। তখন নবী (স) তার জন্যে নিম্নের দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى -(بخارى)

"হে আল্লাহ ! আবু আওফার পরিবারের ওপর তোমার রহমত নাযিল কর।"-(বুখারী)

একবার নবী পাক (স) আসরের নামাযের পরেই ঘরে চলে যান এবং কিছুক্ষণ পর বাইরে আসেন। সাহাবায়ে কেরাম কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সোনার এক টুকরা ঘরে রয়েছিল। রাত পর্যন্ত তা ঘরে পড়ে থাকবে এটা আমি ঠিক মনে করলাম না। তাই তা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে এলাম।-(বুখারী)

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, সদকা ও দান করার ফলে আল্লাহর রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং খারাপ ধরনের মৃত্যু থেকে মানুষ রক্ষা পায়।

একথা ঠিক যে, আল্লাহর গযব থেকে নিরাপদ এবং খাতেমা বিল খায়ের (ঈমানের সাথে মৃত্যু) ছাড়া একজন মুমিনের চরম ও পরম বাসনা আর কি হতে পারে ?

যাকাতের হুকুম

প্রত্যেক সাহেবে নেসাবের (সচ্ছল ব্যক্তি) ওপর ফরয যে, যদি তার কাছে নেসাব পরিমাণ মাল এক বছর যাবত মওজুদ থাকে, তাহলে তার যাকাত সে অবশ্যই দেবে। যাকাত অপরিহার্য ফরয। এ ফরয কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হবে। আর যে ফরয হওয়া অস্বীকার করে না বটে কিন্তু যাকাত দেয় না সে ফাসেক এবং কঠিন গুনাহগার।

যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণের ওপর যে ট্যাক্স ধার্য করা হয়, যাকাত এ ধরনের কোনো জিনিস নয়। এ হচ্ছে একটা আর্থিক ইবাদাত এবং দ্বীন ইসলামের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইসলামের রুকন। কুরআনে নামাযের সাথে সাথেই সাধারণত যাকাতের উল্লেখ আছে। এ হচ্ছে আল্লাহর সেই দ্বীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যা প্রত্যেক যুগে নবীগণের দ্বীন ছিল।

যাকাত ব্যবস্থার ফলে মানুষের মনে ও ইসলামী সমাজে যে বিরাট নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুফল হয় তা একমাত্র তখনই হতে পারে যখন ইবাদাত ও ট্যাক্সের মৌলিক পার্থক্য মনে বদ্ধমূল থাকবে এবং যাকাত আল্লাহর ইবাদাত মনে করেই দেয়া হবে।

অবশ্য যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যবস্থাপনা ইসলামী রাষ্ট্রের ওপরই ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এ আইন-শৃংখলার একটা দায়িত্ব। কিন্তু এজন্যে নয় যে, এ একটা ট্যাক্স বা সরকার আরোপিত কোনো কর। বরঞ্চ ইসলামের সকল সামষ্টিক ইবাদাতে একটা শৃংখলা বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সাতটি।[১]

(১) মুসলমান হওয়া (২) নেসাবের মালিক হওয়া (৩) নেসাব প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া (৪) ঋণগ্রস্ত না হওয়া (৫) মাল এক বছর স্থায়ী হওয়া (৬) জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া (৭) বালেগ হওয়া।

নিম্নে এসব শর্তের বিশ্লেষণ দেয়া হলো ঃ

১. মুসলমান হওয়া। অমুসলিমের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অতএব যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলো, তাকে তার অতীত জীবনের যাকাত দিতে হবে না।

২. নেসাবের মালিক হওয়া। অর্থাৎ এতো পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে যার ওপর শরীয়াত যাকাত ওয়াজিব করেছে।

৩. নেসাবের পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। প্রকৃত প্রয়োজন বলতে বুঝায় এমন সব জিনিস যার ওপর মানুষের জীবন যাপন ও ইয়যত-আবরু নির্ভরশীল যেমন খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসের বাড়ী-ঘর, পেশাজীবী লোকের যন্ত্র-পাতি, মেশিন প্রভৃতি। যানবাহনের পশু, সাইকেল মোটর প্রভৃতি, গৃহস্থালি সরঞ্জাম, পড়াশুনার বই-পুস্তক (বিক্রির জন্যে নয়)। এসব কিছু প্রকৃত প্রয়োজনের জিনিস। এসবের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে এ সবের অতিরিক্ত মাল নেসাবের পরিমাণ হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি অন্যান্য শর্তগুলোও থাকে।

---

১. আহলে হাদীসের দৃষ্টিতে প্রথম পাঁচটি শর্ত জরুরী। তাদের নিকটে জ্ঞান সম্পদ্ন (সজ্ঞান) ও বালেগ হওয়া যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্যে জরুরী নয়। তাদের দলিল হচ্ছে–কুরআনের বাণী وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ। "যাকাত দাও।" এবং প্রত্যেক মুলমান নারী-পুরুষের জন্যে এবং خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا "(হে নবী) তাদের মাল থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পাক কর এবং তাদের তাযকিয়া কর। পবিত্রতা ও তাযকিয়া প্রত্যেক মুষলমানদের আবশ্যক।" সে জন্যে প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর যাকাত ফরয। সে জ্ঞানবান ও বালেগ হোক বা না হোক। আহলে হাদীস ছাড়া অন্যান্য আলেমগণও পরের দুটি শর্ত স্বীকার করেন না। অর্থাৎ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্যে জ্ঞান সম্পন্ন ও বালেগ হওয়াকে শর্ত বলে গণ্য করেন না।

৪. ঋণগ্রস্ত না হওয়া। যেমন কোনো ব্যক্তির নিকটে নেসাবের পরিমাণ মাল আছে বটে কিন্তু অপরের কাছে তার ঋণ রয়েছে। তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে এতো পরিমাণ মাল আছে যে, ঋণ পরিশোধ করার পরও নেসাবের পরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

৫. মাল এক বছরকাল স্থায়ী হওয়া। নেসাব পরিমাণ মাল হলেই তার যাকাত ওয়াজিব হবে না। বরঞ্চ সে পরিমাণ মাল এক বছর স্থায়ী হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজেব হবে।

হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি যে কোনো উপায়েই সম্পদ লাভ করুক তার ওপর যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে যখন তা পূর্ণ এক বছরকাল স্থায়ী থাকবে।"-(তিরমিযি)

৬. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। যে ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত, যেমন পাগল। তার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

৭. বালেগ হওয়া। নাবালেগ শিশুর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়, তার কাছে যতোই মাল থাক না কেন। তার ওপরও যাকাত ওয়াজিব নয়। তার অলীর ওপরও ওয়াজিব নয়।[১]

---

১. এ প্রসংগে আল্লামা মওদূদী নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। নাবালেগ শিশুদের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটা মত এই যে, এতিমের ওপর যাকাত ওয়াজেব নয়। দ্বিতীয় মত হচ্ছে এই যে, এতিম সাবালক হওয়ার পর তার অলী তার সম্পদ তাকে হস্তান্তর করার সময় তাকে যাকাতের বিবরণ বলে দেবে। তখন তার কাজ হচ্ছে এই যে, সে তার এতিম থাকাকালীন সময়ের পুরো যাকাত আদায় করবে। তৃতীয় মত এই যে, এতিমের মাল যদি কোনো কারবারে লাগানো হয়ে থাকে এবং তার মুনাফা হচ্ছে, তাহলে তার অলী যাকাত দেবে। অন্যথায় যাকাত ওয়াজিব হবে না। চতুর্থ মত এই যে, এতিমের মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব এবং তা দেয়ার দায়িত্ব অলীর। এ চতুর্থ অভিমত অধিকতর সঠিক। হাদীসে আছে ঃ

الا من ولى يتيما له مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتاكله الصدقة -(ترمذى - دار قطنى - بيهقى)

"অর্থাৎ সাবধান, যে ব্যক্তি এমন এতিমের অলী যার মাল আছে তার উচিত, তার মালে কোনো ব্যবসা করবে এবং তা এমনি পড়ে থাকতে দেবে না, যাতে তার সব মাল যাকাতে খেয়ে না ফেলে।"-(তিরমিযি, দারে কুতনী, বায়হাকী)

এর সম অর্থবোধক একটি মুরসাল হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র) এবং মরফু হাদীস তাবারানী ও আবু উবায়দ থেকে বর্ণিত আছে। তার সমর্থন সাহাবা ও তাবেঈন দ্বারা পাওয়া যায় যা হযরত উমর (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) এবং হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

মস্তিষ্ক বিকৃত লোকের সম্পর্কেও এ ধরনের মতভেদ আছে যেমন উপরে বলা হয়েছে। এতেও আমাদের মতে সঠিক অভিমত এই যে, পাগলের মালেরও যাকাত ওয়াজিব এবং তা আদায় করার দায়িত্ব অলীর। ইমাম মালেক (র) এবং ইবনে সোহাব যুহরী এ অভিমতেরই ব্যাখ্যা করেছেন।-(রাসায়েল ও মাসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩০, ১৩১)

যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার শর্ত

যাকাত আদয় সহীহ হওয়ার শর্ত ছয়টি। এ ছয়টি শর্ত পাওয়া গেলে যাকাত আদায় হবে। অন্যথায় হবে না। যেমন-

(১) মুসলমান হওয়া, (২) যাকাত দেয়ার নিয়ত করা, (৩) নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা, (৪) মালিকানা বানিয়ে দেয়া, (৫) জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া (৬) বালেগ হওয়া। নিম্নে এ সবের বিশ্লেষণ ও ফায়দা বর্ণিত হলো ঃ

১. মুসলমান হওয়া। যাকাত সহীহ হওয়ার শর্ত এই যে, যাকাতদাতাকে মুসলমান হতে হবে। যেহেতু অমুসলিমের ওপর যাকাত ওয়াজিবই নয়। সে জন্যে কোনো অমুসলিম যাকাত দিলে তা হবে না। অতএব ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যদি কেউ ভবিষ্যতের যাকাত দিয়ে দেয় এবং তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে পূর্বের দেয়া যাকাত সহীহ হবে না। মুসলমান হওয়ার পর পুনরায় যাকাত দিতে হবে।

২. যাকাত দেয়ার নিয়ত করা। যাকাত বের করার সময় অথবা হকদারকে দেয়ার সময় যাকাত দেয়ার নিয়ত জরুরী। যাকাত বের করার সময় যাকাতের নিয়ত না করলে হবে না। যাকাতের জন্য এটা প্রয়োজন যে, সে মাল হকদারের কাছে পৌছে যেতে হবে।

৩. যাকাত দেবার সময় যাকাত গ্রহণকারীকে তার মালিক বানাতে হবে। সে মালিক হকদারকে বানানো হোক অথবা যাকাত আদায়কারী ও বণ্টনকারী সংস্থাকে করা হোক।

৪. নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা। যাকাত দেয়ার খাত কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এসব ছাড়া অন্য কোনো খাতে ব্যয় করলে তা হবে না।

৫. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। মস্তিষ্ক বিকৃত অথবা পাগল যাকাত দিলে তা হবে না।

৬. বালেগ হওয়া। নাবালেগ শিশু যাকাত দিলে তা হবে না।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কিছু মাসায়েল

১. প্রকৃত প্রয়োজনের জন্যে যে অর্থ রাখা হয়েছে তা যদি ঐ বছরেই খরচ করার প্রয়োজন হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না। আর যদি সে বছরের পর ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।-(ইলমুল ফেকাহ-৪র্থ)

২. যে মালের মধ্যে অন্য কোনো হক, যেমন ওশর, খেরাজ প্রভৃতি ওয়াজিব হয়, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।-(ইলমুল ফেকাহ-৪র্থ)

৩. কেউ যদি কোনো কিছু কারো কাছে রেহেন বা বন্ধক রাখে তাহলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যে রেহেন দেবে এবং যে নেবে তাদের কারো ওপরেই ওয়াজিব হবে না।-(ইলমুল ফেকাহ-৪র্থ)

৪. কারো কোনো মাল হারিয়ে গেল কিংবা অর্থ হারিয়ে গেল। তারপর কিছুকাল পরে আল্লাহর ফজলে তা পাওয়া গেল এবং হারানো অর্থ হস্তগত হলো, তাহলে হারানোর সময়ের যাকাত ওয়াজিব হবে না। এজন্যে যে, যাকাত ওয়াজেব হওয়ার জন্যে মাল নিজের আয়ত্বে এবং মালিকানায় থাকা দরকার।

৫. কারো কাছে বছরের প্রথমে নেসাবের পরিমাণ মাল মওজুদ ছিল। মাঝখানে কিছু সময় তা হারিয়ে গেল অথবা নিঃশ্বেস হয়ে গেল। তারপর বছরের শেষ ভাগে আল্লাহর ফজলে নেসাবের পরিমাণ মাল হয়ে গেল, তাহলে সে মালের যাকাত ওয়াজিব হবে। মাঝামাঝি সময়ে মাল না থাকা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে না।-(ইলমুল ফেকাহ)

৬. কেউ গ্রেফতার হলে তার মালেরও যাকাত দিতে হবে। তার অবর্তমানে যে ব্যক্তিই তার কারবার চালাবে অথবা তার মালের মোতাওয়াল্লী হবে সে যাকাত দেবে।-(রাসায়েল ও মাসায়েল-২য় খণ্ড)

৭. মুসাফিরের মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব যদি সে সাহেবে নেসাব হয়। অবশ্যি মুসাফির হওয়ার কারণে গ্রহণেরও হকদার হবে। কিন্তু যেহেতু সে ধনী ও সাহেবে নেসাব। সে জন্যে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব। তার সফর তাকে যাকাতের হকদার বানায় এবং তার মালদার হওয়া তার ওপর যাকাত ফরয করে।-(বেহেশতী জিউর-৩য় খণ্ড)

৮. কেউ কাউকে কিছু দান করলো। তা যদি নেসাবের পরিমাণ হয় এবং এক বছর অতীত হয় তাহলে তার যাকাত ওয়াজিব হবে। (ঐ)

৯. ঘরের সাজ-সরঞ্জাম, যেমন তামা, পিতল, এলুমুনিয়ম, ষ্টীল প্রভৃতির বাসনপত্র, পরণের এবং গায়ে দেয়ার কাপড়-চোপড়, সতরঞ্চি, ফরাশ, ফার্নিচার প্রভৃতি, সোনা চাঁদি ছাড়া অন্য ধাতুর অলংকার, মতির হার প্রভৃতি, যতোই মূল্যবান হোক, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।-(ঐ)

১০. কোনো উৎসবের জন্যে কেউ বহু পরিমাণ শস্যাদি খরিদ করলো। তারপর মুনাফার জন্যে তা বিক্রি করে দিল। তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যাকাত ঐ মালের ওপর ওয়াজিব হবে যা ব্যবসার নিয়তে কেনা হবে।-(ঐ)

১১. কারো কাছে হাজার টাকা ছিল। বছর পূর্ণ হওয়ার পর পাঁচশ টাকা নষ্ট হয়ে গেল এবং বাকী পাঁচশ সে ব্যক্তি খয়রাত করে দিল। তাহলে নষ্ট হওয়া টাকার যাকাতই ওয়াজিব রইলো–খয়রাতের টাকার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।[১]

১২. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর কারো সব সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

১৩. কোনো ব্যবসায় কয়েক ব্যক্তি অংশীদার। সকলের টাকাই লাগানো হয়েছে। যদি প্রত্যেক অংশীদারের পৃথক পৃথক অংশ নেসাবের কম হয় তাহলে কারো ওপরে যাকাত ওয়াজিব হবে না, তাদের সকলের মোট অংশ নেসাব পরিমাণ হোক বা তার অধিক হোক।

১৪. কোনো ব্যক্তি রমযান মাসে দু হাজার টাকার যাকাত দিয়ে দিল। এ দু হাজার টাকা তার কাছে সংরক্ষিত রয়ে গেল। এখন রজব মাসে আল্লাহর ফজলে আরও দু হাজার অতিরিক্ত সে পেয়ে গেল। এখন বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাকে চার হাজারের যাকাত দিতে হবে। তার একথা মনে করলে চলবে না যে, সে রজব মাসে যা পেলো তা এক বছর পূর্ণ হয়নি। বছরের ভেতরে যে টাকা বা মাল বাড়বে, তা ব্যবসার মুনাফার কারণে হোক অথবা পশুর বাচ্চা হওয়ার কারণে হোক। অথবা দান বা মীরাস পাওয়ার কারণে হোক, মোটকথা যেভাবেই মাল বা অর্থ পাওয়া যাক না কেন, সব মালের যাকাত দিতে হবে—পরবর্তী সময়ে পাওয়া মাল বা অর্থ এক বছর পূর্ণ না হলেও তার যাকাত দিতে হবে।

যাকাতদানের মাসায়েল

১. যাকাত দেয়ার সময় হকদারকে বা যাকাত গ্রহীতাকে একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, এ যাকাত। বরঞ্চ উপহার, বাচ্চাদের জন্যে তোহ্‌ফা এবং ঈদের উপহার বলে দেয়াও জায়েয। এতটুকু যথেষ্ট যে যাকাতদাতা যাকাত দেয়ার নিয়ত করবে।

---

১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে সমুদয় টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি ব্যবসায় মোট টাকা নেসাবের পরিমাণ বা তার বেশী হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে–পৃথকভাবে প্রত্যেক অংশীদারের অংশ নেসাব পরিমাণ না হলেও।

২. শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক হিসেবে এবং কর্মচারী বা খাদেমকে বেতন হিসেবে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। তবে বায়তুলমালের পক্ষ থেকে যেসব লোক যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্যে নিযুক্ত থাকে তাদের বেতন যাকাতের টাকা থেকে দেয়া যেতে পারে।

৩. বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অগ্রিম যাকাত দিয়ে দেয়া জায়েয এবং মাসিক কিস্তিতে দেয়াও জায়েয এ শর্তে যে দাতা সাহেবে নেসাব হবে। যদি কেউ এ আশায় অগ্রিম যাকাত দেয় যে, সে সাহেবে নেসাব হয়ে যাবে তাহলে এমন ব্যক্তির যাকাত হবে না। যে সময়ে সে সাহেবে নেসাব হবে এবং বছর পূর্ণ হবে তখন তাকে আবার যাকাত দিতে হবে।-(বেহেশতী জিওর)

হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত আব্বাস (রা) অগ্রিম যাকাত দেয়া সম্পর্কে নবীর কাছে জানতে চাইলে তিনি অনুমতি দেন।-(আবু দাউদ, তিরমিযি)

৪. যাকাতে মধ্যম ধরনের মাল দিয়ে দেয়া উচিত। এটা ঠিক নয় যে, যাকাত দাতা সাধারণ মাল যাকাত হিসেবে দিবে এবং এটাও ঠিক নয় যে, যাকাত সংগ্রহকারী সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাল যাকাত হিসেবে নিয়ে নেবে। দাতা আল্লাহর পথে ভালো জিনিস দেবার চেষ্টা করবে এবং আদায়কারী কারো ওপরে বাড়াবাড়ি করবে না।

৫. যাকাত যে আদায় করবে (সংগ্রহ করবে) সে ইচ্ছা করলে যে বস্তুর ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে সে বস্তুও নিতে পারে, যেমন সোনা অথবা পশু এবং ইচ্ছা করলে তার মূল্যও নিতে পারে। উভয় অবস্থায় যাকাত হয়ে যাবে। একথা মনে রাখতে হবে মূল্য আদায় করতে হলে তা যাকাত দেবার সময়ে যে মূল্য হবে তাই আদায় করতে হবে—যে সময়ে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে সে সময়ের মূল্য নয়। যেমন মনে করুন এক ব্যক্তি ছাগল প্রতিপালন করে। বছর পূর্ণ হবার পর একটি ছাগল তার যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। এখন তার মূল্য ৫০ টাকা। এখন কোনো কারণে যাকাত কয়েক মাস বিলম্বে দেয়া হচ্ছে। আর এ সময়ে সে ছাগলটির মূল্য যদি বেড়ে গিয়ে ৬০ টাকা হয় অথবা কমে গিয়ে ৪০ টাকা হয় তাহলে এ ষাট অথবা চল্লিশ টাকা যাকাত দিতে হবে।

৬. যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালেই জমা হওয়ার কথা। ইসলামী রাষ্ট্রেরই এ দায়িত্ব যে, সে যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থাপনা করবে। যেখানে মুসলমানগণ তাদের অবহেলার কারণে গোলামির জীবন যাপন করছে অর্থাৎ যেখানে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই, সেখানে মুসলমানদের

কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের উদ্যোগে মুসলমানদের বায়তুলমাল কায়েম করবে এবং সেখানে সকল যাকাত জমা করবে। তারপর সেই বায়তুলমাল থেকে যাকাত নির্দিষ্ট খাতগুলোতে ব্যয় করবে। আর এ ধরনের সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা থেকে যদি মুসলমান বঞ্চিত হয় তাহলে নিজের পক্ষ থেকেই হকদারদের কাছে যাকাত পৌছিয়ে দেবে এবং অবিরাম শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে যাতে করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া আল্লাহ তায়ালার বহু নির্দেশ ও আইন-কানুন মেনে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

৭. যারা সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে যাকাতের হকদার যেমন পংগু, রোগী, স্বাস্থ্যহীন ও দুর্বল, গরীব-দুস্থ, মিসকীন, বিধবা, এতিম প্রভৃতি। তাদেরকে সাময়িকভাবেও বায়তুলমাল থেকে সাহায্য দেয়া যেতে পারে এবং স্থায়ীভাবেও তাদের ভরণ পোষণের অথবা ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮. বায়তুলমাল থেকে যাকাত হকদার কোনো এক ব্যক্তিকেও দেয়া যায় এবং কোনো সংগঠন বা সংস্থাকেও দেয়া যায়। স্বয়ং এ ধরনের কোনো সংস্থাও কায়েম করা যেতে পারে যা যাকাত ব্যয় করার উপযোগী, যেমন এতিমখানা, দুঃস্থদের জন্যে বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৯. অভাবগ্রস্তদেরকে যাকাত খাত থেকে কর্জে হাসানা দেয়াও জায়েয। বরঞ্চ অভাবগ্রস্তদের অবস্থার উন্নয়নের জন্যে এবং তাদের আপন পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে তাদেরকে কর্জে হাসানা দেয়া অতি উত্তম কাজ।

১০. যেসব আত্মীয় স্বজনকে যাকাত দেয়া জায়েয তাদেরকে দিলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাওয়া যাবে। এক যাকাত দেয়ার এবং দ্বিতীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার প্রতিদান বা সওয়াব। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন যাকাত গ্রহণ করতে যদি লজ্জাবোধ করে অথবা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও যাকাত নেয়া খারাপ মনে করে, তাহলে তাদেরকে একথা বলা ঠিক নয় এ যাকাতের টাকা বা বস্তু। কারণ হকদারকে যাকাতের কথা বলে দেয়া শর্ত নয়। উকৃষ্ট উপায় এই যে, কোনো ঈদের পূর্বে অথবা বিয়ে শাদীতে সাহায্য বা উপঢৌকন স্বরূপ অথবা অন্য কোনো প্রকারে যাকাত তাদেরকে পৌছিয়ে দিতে হবে।

১১. চাঁদ মাস হিসেবে যাকাত হিসেব করে দিয়ে দেয়া ভালো। তবে এটা জুরুরী নয়। সৌর মাস হিসেবেও যাকাত দেয়া যায়। কোনো বিশেষ মাসে যাকাত দিতে হবে তাও জরুরী নয়। কিন্তু যেহেতু রমযান মাস মুবরাক ও বেশী নেকী করার মাস এবং সওয়াব বেশী গুণে পাওয়া যায়, সে জন্যে এ

মাসে যাকাত দেয়া সবচেয়ে ভালো। তাই বলে এমন করা ওয়াজিব নয়। যাকাত আদায়ের এ কোনো শর্তও নয়।

১২. সাধারণভাবে এটাই ন্যায়সংগত যে, এক অঞ্চলের যাকাত সেই অঞ্চলেই ব্যয় বা বণ্টন করা। কিন্তু অন্য অঞ্চলেও বিশেষ প্রয়োজনে দেয়া যায়। যেমন-বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন অন্য এলাকায় বাস করে এবং তারা অভাবগ্রস্ত অথবা অন্য এলাকায় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, এমন অবস্থায় সেসব এলাকায়ও যাকাত পাঠানো যায়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রথম এলাকা বা বস্তির কোনো দুঃস্থ লোক যেন বঞ্চিত না হয়।

১৩. যাকাত আদায় হওয়ার জন্যে এটাও শর্ত যে, যাকে যাকাত দেয়া যাবে তাকে যাকাতের মালিক বানাতে হবে এবং যাকাত তার হস্তগত হতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি খানা তৈরী করে হকদারকে খাইয়ে দিলো, তাহলে সে যাকাত সহীহ্ হবে না। হাঁ, খানা তৈরী করে—তার হাতে দিয়ে তাকে যদি এ এখতিয়ার দেয়া হবে যে, সে তা নিজেও খেতে পারে কিংবা অন্যকে খাওয়াতে অথবা যা খুশী তাই করতে পারে, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কোনো সংস্থা বা বায়তুলমালকে যাকাত দিলেও মালিক বানাবার শর্ত পূরণ হয়ে যায়। এভাবে যাকাত সংগ্রহ বা আদায়কারীকে দিয়ে দিলেও মালিক বানাবার শর্ত পূরণ হয়। তারপর বায়তুলমাল অথবা যাকাত আদায়কারীর দায়িত্ব এসে গেল। যাকাত দাতার এ দায়িত্ব নয় যে, হকদারকে পুনরায় মালিক বানিয়ে দেবে।

১৪. যদি কোনো ব্যক্তি নিজের কোনো আত্মীয়, বন্ধু অথবা যে কোনো লোকের পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দিলে তা হয়ে যাবে। যেমন–স্বামী তার স্ত্রীর গহনা প্রভৃতির যাকাত নিজের কাছ থেকে দিয়ে দিলে স্ত্রীর যাকাত দেয়া হয়ে যাবে।

একবার নবী পাক (স)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) নবীর নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী–হযরত ওমর (রা)-কে যাকাত দিলেন না। তাতে নবী (স) বললেন, তার যাকাত আমার দায়িত্ব। বরঞ্চ তার চেয়েও বেশী। ওমর তুমি বুঝ না যে, চাচা পিতার সমতুল্য।–(মুসলিম)

মালিকানা দানের প্রসংগ

হানাফী আলেমগণের মতে যাকাত সহীহ্ হওয়ার অনিবার্য শর্ত হচ্ছে অন্যকে মালিক না বানালে যাকাত আদায় হবে না। এ প্রসংগে আল্লামা মওদূদী

বিশদ টীকা লিখেছেন যা মালিক বানাবার প্রসংগে উপলব্ধি করার জন্যে অত্যন্ত সহায়ক। নিম্নে তার দূরদৃষ্টিমূলক টীকা বা মন্তব্য দেয়া হলো ঃ

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ .....

"সদকা তো গরীব দুঃখীদের জন্যে এবং মিসকীনের জন্যে। তাদের জন্যেও যারা এর জন্যে কাজ করে এবং তাদেরও জন্যে যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য-----।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

লক্ষ্য করুন এখানে লামের (ل) কার্যকারিতা শুধুমাত্র গরীব-দুঃখীর ওপর নয়। বরঞ্চ মিসকীন, যাকাত ব্যবস্থাপনার কর্মচারী এবং মুয়াল্লাফাতে কুলুবুহুম (যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য) এর ওপরও বটে। এ 'লাম' (ل) মালিক বানিয়ে দেবার জন্যে, অধিকার দেয়ার জন্যে। অথবা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্যে হোক এবং অন্য যে কোনো অর্থেই হোক, মোটকথা যে অর্থেই গরীব দুঃখীর জন্যে সম্পৃক্ত হবে, ঐ অর্থে বাকী তিন প্রকার লোকের জন্যেও হবে। এখন হানাফীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি লাম তামলিক বা মালিকানা দানের দাবী করে তাহলে যাকাত এবং ওয়াজিব সদকার মাল এ চার প্রকারের লোকের যে কাউকেই দেয়া হোক তাতে মালিকানা দানের দাবী পূরণ হয়ে যায়। তারপর আবার বার বার মালিকানা প্রদানের হুকুম কোথা থেকে বের হয়? ফকির মিসকীনদের মালিকানায় যাকাতের মাল পৌঁছে যাওয়ার পর তা ব্যয় করার ব্যাপারে কোনো বাধা-নিষেধ আছে নাকি ? যদি না থাকে তাহলে যাকাত ব্যবস্থাপনার কর্মচারীদের (عاملين عليها) হাতে যাকাত পৌঁছে যাওয়ার পর মালিক বানিয়ে দেয়ার লামের (ل) দাবী যেহেতু পূরণ হয়ে যায়, সে জন্যে পুনরায় মালিক বানিয়ে দেয়ার বাধ্যবাধকতার যুক্তি কি হতে পারে ? লামকে (ل) যদি মালিকানা প্রদানের অর্থেই গ্রহণ করা হয়, তাহলে এক ব্যক্তি যখন যাকাত ও ওয়াজিব সদকার মাল যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের হাতে তুলে দেয়, তখন সে তো বলতে গেলে তাদেরকে তার মালিক বানিয়ে দিল এবং এ মাল এভাবে তাদের মালিকানা ভুক্ত হয়ে গেল যেমন 'ফাই' ও গনীমতের মাল সরকারের (ইসলামী রাষ্ট্রের) মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়। তারপর তাদের ওপর এ বাধ্যবাধকতা আর থাকে না যে, পরে সেসব মাল তারা যেসব হকদারের ওপর ব্যয় করবে তা মালিকের আকারেই করবে। বরঞ্চ তাদের এ অধিকার রয়েছে যে, অবশিষ্ট সাতটি যাকাতের খাতে যেভাবে মুনাসিব এবং প্রয়োজন বোধ করবে—খরচ করবে তামলিকে লামের (ل) দৃষ্টিতে (মালিক

বানানো যে শর্ত সে দিক দিয়ে) তাদের ওপর কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে না। অবশ্যি যে বাধা নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে তা শুধু এই যে, যে ব্যক্তিই যাকাত সংগ্রহ এবং বন্টনের কাজ করবে সে তার কাজের পারিশ্রমিক নেবে। অবশিষ্ট মাল সে অন্যান্য হকদারদের জন্যে ব্যয় করবে। এজন্যে যে, এসব লোককে যাকাত বিভাগের কর্মচারী (عاملين عليها) হওয়ার কারণে ওসব মালের মালিক বানিয়ে দেয়া হয় স্বয়ং হকদার হওয়ার দিক দিয়ে নয়। (عاملين عليها) যাকাত আদায় ও বন্টনের কর্মচারী শব্দগুলো স্বয়ং সে উদ্দেশ্য প্রকাশ করে যার জন্যে যাকাত তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়। অতপর এ শব্দগুলো এটাও নির্ধারিত করে দেয় যে, কর্মচারী হিসেবে এ মালের কত অংশ বৈধভাবে নিজের জন্যে ব্যয় করার অধিকার রাখে।

এ বিশ্লেষণের পর সেই হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক যা ইমাম আহমদ (র) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো–

اذا اديت الزكوة الى رسولك فقد برئت منها الى الله ورسوله ـ

"আপনার প্রেরিত কর্মচারীকে যখন আমি যাকাত দিয়ে দিলাম তখন আমি আল্লাহ এবং তার রসূলের কাছে দায়মুক্ত হলাম তো?"

নবী (স) জবাবে বললেন ঃ

نعم اذا اديتها الى رسولى فقد برئت منها الى الله ورسوله فلك اجرها، واثمها على من بدلها ـ

"হাঁ, তুমি যখন তা আমার প্রেরিত কর্মচারীর হাতে তুলে দিলে তখন তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে দায়মুক্ত হয়ে গেলে। এর প্রতিদান তোমার জন্যে রয়েছে। যে নাজায়েয ভাবে তা ব্যয় করবে তার গোনাহ তার হবে।"

এর থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যাকাতদাতা তার যাকাত (عاملين عليها) যাকাত কর্মচারীর হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে যায়। অন্য কথায় যেভাবে ফকীর মিসকীনকে যাকাত দিলে মালিক বানাবার শর্ত পূরণ হয়, ঠিক তেমনি عاملين عليها কে দিলেও তা পূরণ হয়ে যায়।

এখন একথাও বুঝে নেয়া দরকার যে, عاملين عليها -এর শব্দগুলো যা কুরআনে বলা হয়েছে–তা কোন্ কোন্ লোকের ওপর প্রযোজ্য হয়। লোক তা শুধু ঐসব কর্মচারী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করে যাদেরকে ইসলামী সরকার

নিযুক্ত করে। কিন্তু কুরআন পাকের শব্দগুলো সাধারণভাবে বলা হয়েছে যা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হতে পারে যে যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ করে। সাধারণ অর্থে ব্যবহার্য এ শব্দগুলোকে বিশেষ অর্থে ব্যবহারের কোনো যুক্তি আমার জ্ঞান-বুদ্ধিতে নেই। যদি কোনো ইসলামী সরকার না থাকে, অথবা আছে কিন্তু তার দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন এবং মুসলমানদের কোনো একটি দল এ কাজ (যাকাত আদায় ও বন্টন) করার জন্যে মাঠে নামলো, তাহলে কোন্ যুক্তি বলে একথা বলা যেতে পারে যে, 'না, তোমরা عاملين عليها নও'? আমার দৃষ্টিতে এতো আল্লাহ তায়ালার এক রহমত যে, عاملين (যাকাত কর্মচারী) সরকারের জন্যে নির্দিষ্ট করার পরিবর্তে তাঁর হুকুম এমন সাধারণ শব্দে দিয়েছেন যে, তার ফলে এ অবকাশ পাওয়া যায় যে, ইসলামী সরকারের অবর্তমানে অথবা কর্তব্যে অবহেলাকারী সরকার বিদ্যমান থাকলেও মুসলমান নিজেদের পক্ষ থেকে যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা করতে পারে। যদি আল্লাহ তায়ালার এ সাধারণ হুকুমকে সাধারণই থাকতে দেয়া হয়, তাহলে গরীব ছাত্রদের শিক্ষা, এতিমদের প্রতিপালন, বৃদ্ধ, অপারগ ও পংগু ব্যক্তিদের দেখাশুনা, দুস্থ রোগীদের চিকিৎসা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজের জন্যে যেসব সংস্থা কায়েম হবে সে সবের ব্যবস্থাপকগণ একেবারে ন্যায়সংগত ভাবেই عاملين عليها -এর পর্যায়েই পড়বে। ফলে তাদের যাকাত গ্রহণ করার এবং প্রয়োজন অনুসারে খরচ করার এখতিয়ার থাকবে। এমনিভাবে এমন ধরনের সংস্থা কায়েম করারও অবকাশ থাকবে যা বিশেষভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের জন্যেই কায়েম করা হবে। তাদের ব্যবস্থাপকগণও عاملين عليها বলে গণ্য হবে এবং যাকাত বন্টন করার ব্যাপারে 'তামলিকের' ফতোয়া দ্বারা তাদের হাত বাঁধবার প্রয়োজনও থাকবে না।

আমার দৃষ্টিতে কুরআনের শব্দগুলোকে যদি সাধারণ অর্থে রাখা যায় তাহলে উপরোক্ত عاملين (যাকাত কর্মচারী ও ব্যবস্থাপকদের)-এর ওপরই তা প্রযোজ্য হবে না, বরঞ্চ অন্যান্য বহু কর্মচারীও এর সংজ্ঞায় পড়বে। যেমন একজন এতিমের অলী, একজন রোগী ও পংগু ব্যক্তির দেখাশুনা করার লোক এবং একজন অসহায় বৃদ্ধ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষাকারী ব্যক্তিও আমেল (যাকাত কর্মী)। যাকাত সংগ্রহ করে ঐসব লোকের প্রয়োজন পূরণ করার তার অধিকার রয়েছে। প্রচলিত পন্থায় তার কাজের পারিশ্রমিক সে নিতে চাইলেও নিতে পারবে।

যাকাতের টাকা পয়সা যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার জন্যে ডাক খরচ এবং ব্যাংকের পারিশ্রমিকও তার থেকে

দেয়া যেতে পারে। কারণ তারাও এ খেদমত করার সময় পর্যন্ত عاملين عليها (যাকাতের কর্মচারী) বলে বিবেচিত হবে।

যাকাত আদায় করতে, যাকাতের মাল একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে অথবা যাকাতের হকদারদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্যে রেলগাড়ী, বাস, টাংগা, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি যা কিছু ব্যবহার করা হবে, সে সবের ভাড়া যাকাত থেকে দেয়া যেতে পারে। কারণ এসব খেদমত করার সময় এ সবই عاملين عليها (যাকাত কর্মচারী)-এর মধ্যে গণ্য হবে।

যাকাতের হকদারদের জন্যে যত প্রকার কর্মচারী ও মজুর কাজে লাগানো হবে তাদের বেতন ও পারিশ্রমিক যাকাত খাত থেকে দেয়া যেতে পারে। কারণ তারা সব عاملين عليها -এর মধ্যে গণ্য হবে। কেউ রেলওয়ে ষ্টেশনে খাদ্য শস্যের বস্তা বয়ে নিয়ে গেলে, কেউ দরিদ্র রোগীদের খেদমতের জন্যে গাড়ী চালালে অথবা কেউ এতিম শিশুদের দেখাশুনা করলে তারাও ঐ পর্যায়ে পড়বে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, عاملين عليها (যাকাত কর্মচারীগণ) যে খরচ পত্রাদি করবে তার মধ্যে এমন কোনো বাধা-নিষেধ আছে নাকি যে, তারা যাকাতের হকদারদের খেদমতের জন্যে কোনো ঘর-দোর বানাতে পারবে না এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন, গাড়ী, ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি, কাপড় প্রভৃতি খরিদ করতে পারবে না? আমি একথা বলি যে, হানাফীগণ এ আয়াতের যে ব্যাখ্যাদান করেছেন তার দৃষ্টিতে এ বাধা-নিষেধ শুধুমাত্র তাদের জন্যে যারা যাকাত দেয়। তারা স্বয়ং নিসন্দেহে এ ধরনের কোনো খরচপত্রাদি করতে পারে না। তাদের কাজ হলো এই যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত "যাদের জন্যে" তাদের অথবা তাদের মধ্যে কারো মালিকানায় তা দিয়ে দেবে। এখন রইলো عاملين عليها (যাকাত কর্মচারী)-এর ব্যাপারে তো তাদের বেলায় এ ধরনের কোনো বাধা-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে না। তারা যাকাতের সকল হকদারদের জন্যে আপন স্থানে অলী বা উকিল। প্রকৃত হকদার এ মাল থেকে যেভাবে খরচপত্র করতে পারে, সে সমুদয় খরচপত্রও তারা তাদের অলী অথবা উকিল হিসেবে করতে পারে। তারা যখন ফকীর মিসকীনদের প্রয়োজনে কোনো ঘর-দোর তৈরী করে অথবা কোনো যানহান খরিদ করে তখন তা যেন ঠিক এমন যে, বহু ফকীর-মিসকীন প্রত্যেকে আলাদা আলাদা যাকাত পাওয়ার পর সম্মিলিতভাবে কোনো ঘর-দোর তৈরী করলো অথবা কোনো যানবাহন খরিদ করলো, যেসব খরচপত্রাদী করার জন্যে তাদের ওপর কোনো বাধা-নিষেধ নেই। যাকাত কর্মচারীদেরকে (عاملين عليها) যাকাত দেয়ার পন্থা আল্লাহ তায়ালা এজন্যে নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের

হাতে যারা যাকাত দেয় তাদেরকে আল্লাহর রসূল এজন্যে ফরয থেকে দায়মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন যে, তাদেরকে এ মাল দেয়ার অর্থ সকল হকদারকে নিয়ে দেয়া। তারা হকদারদের পক্ষ থেকেই যাকাত সংগ্রহ করে এবং তাদের প্রতিনিধি ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তা খরচ করে। তাদের খরচপত্রের ব্যাপারে এ দিক দিয়ে অবশ্যই আপত্তি ও অভিযোগ করা যেতে পারে যে, তারা অমুক খরচ অপ্রয়োজনে করেছে অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করেছে অথবা আপন পারিশ্রমিক প্রচলিত হার থেকে অধিক নিয়েছে অথবা কর্মচারীকে প্রচলিত হার থেকে অধিক পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার জানা মতে শরীয়াতের এমন কোনো কায়দা-কানুন নেই যার ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে, অমুক অমুক খরচ করা যাবে আর অমুক অমুক খরচ করা যাবে না। যাকাতের হকদারদের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করার অনুমতি শরীয়াত তাদেরকে দিয়েছে।-(তরজুমানুল কুরআন, ডিসেম্বর, ১৯৫৪)

যাকাতের নেসাব

যাকাতের নেসাব বলতে বুঝায় মূলধনের সেই সর্বনিম্ন পরিমাণ যার ওপর শরীয়াত যাকাত ওয়াজিব করে। যে ব্যক্তির কাছে নেসাব পরিমাণ মূলধন থাকবে তাকে সাহেবে নেসাব বলা হয়।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য

যাকাতের অন্যতম বুনিয়াদী উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা। ধন আবর্তনশীল রাখার জন্যে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর সুবিধা ভোগের জন্যে ধনশালী ও পুঁজিপতিদের নিকট থেকে যাকাত নেয়া হয় এবং দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। নবী করীম (স) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা লোকের ওপর সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তা নেয়া হবে ধনীদের কাছ থেকে এবং বিলিয়ে দেয়া হবে দুঃস্থদের মধ্যে।-(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি)

শরীয়াতের দৃষ্টিতে ধনী ও সচ্ছল তারা যাদের কাছে নেসাব পরিমাণ মাল মওজুদ থাকে এবং বছর অতীত হওয়ার পরও মওজুদ থাকে। নবীর যমানায় ঐসব লোক ধনী ও সচ্ছল ছিল যাদের কাছে খেজুরের বাগান, সোনা, চাঁদি, গৃহপালিত পশু ছিল এবং শরীয়াত ঐসব জিনিসের একটা বিশিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে বলে যে, অন্তত এতটুকু পরিমাণ যার কাছে মওজুদ থাকবে শরীয়াতের দৃষ্টিতে সে সচ্ছল। তার মাল থেকে সদকা আদায় করে সমাজের দুঃস্থদেরকে দেয়া হবে। নবী (স) বলেন ঃ

পাঁচ ওয়াসাক ওজনের কম খেজুরের যাকাত নেই। পাঁচ উকিয়ার কম চাঁদির যাকাত নেই এবং পাঁচ উটের কম হলে তার যাকাত নেই-(বুখারী, মুসলিম)। ওয়াসাক ও উকিয়ার জন্যে পরিভাষা দ্রঃ।

নেসাবের মধ্যে পরিবর্তনের প্রশ্ন

বর্তমান যুগে যেহেতু টাকার মূল্য অসাধারণ ভাবে কমে গেছে এবং সোনা, চাঁদি ও গৃহপালিত পশুর যে নেসাব নবীর যমানায় নির্ধারিত করা হয়েছিল মূল্যের দিক দিয়ে তার মধ্যেও অসাধারণ পার্থক্য এসে গেছে। এ জন্যে কেউ কেউ এ দাবী করছেন যে, অবস্থার প্রেক্ষিতে যাকাতের নেসাব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যাক। এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) বলেন ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় নবী (স) কর্তৃক নির্ধারিত নেসাব ও যাকাতের হারের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি এবং এখন তার কোনো প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। আমাদের ধারণা এই যে, নবী (স)-এর পরে তাঁর নির্ধারিত নেসাব পরিবর্তন করার এখতিয়ার কারো নেই। অবশ্যই সোনার নেসাবে পরিবর্তন সম্ভব। কারণ যে রেওয়ায়েতে তার নেসাব বিশ মিসকাল বলা হয়েছে তার সনদ অত্যন্ত দুর্বল (রাসায়েল ও মাসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪-১৪৫)।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে নেসাব এবং যাকাতের হারে পরিবর্তন না করার হিকমত ও তাৎপর্যের ওপর আলোচনা প্রসংগে আল্লামা মওদূদী (র) বলেন ঃ শরীয়াত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাও নির্দিষ্ট পরিমাণে রদবদল করার অধিকার আমাদের নেই। এ দ্বার যদি একবার খুলে দেয়া হয় তাহলে এক যাকাতেরই নেসাব ও পরিমাণের ওপর আঘাত পড়বে না। বরঞ্চ নামায, রোযা, হজ্জ, বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বহু বিষয় এমন আছে যার মধ্যে সংশোধন ও রহিত করণের কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং এর জের কোথাও গিয়ে শেষ হবে না। উপরন্তু এ দুয়ার একবার খুলে দিলে যে ভারসাম্য শরীয়াত প্রণেতা ব্যক্তি এ সমাজের মধ্যে সুবিচারের জন্যে কায়েম করেছেন তা খতম হয়ে যাবে। তারপর ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে টানাহেঁচড়া শুরু হয়ে যাবে। ব্যক্তিবর্গ চাইবে নেসাব ও হারের মধ্যে পরিবর্তন তাদের স্বার্থ অনুযায়ী হোক এবং জামায়াত বা সমাজ চাইবে তাদের স্বার্থ মুতাবেক হোক। বাছাইয়ের সময় এ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। নেসাব কমিয়ে হার বাড়িয়ে যদি কোনো আইন প্রণয়ন করা হয় তাহলে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে তারা তা সন্তুষ্টচিত্তে দেবে না যা দেয়া ইবাদাতের আসল স্পিরিট। বরঞ্চ ট্যাক্সের মতো জরিমানা মনে

করে দেবে এবং তারপর দিতে নানা বাহান্না ও অবহেলা করবে। এখন যেমন—আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মনে করে প্রত্যেক ব্যক্তি মাথা নত করে এবং ইবাদাতের প্রেরণাসহ সন্তুষ্টচিত্তে যাকাতের টাকা বের করে দেয়, তা আর অবশিষ্ট থাকবে না। যদি আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তাদের ইচ্ছামতো কোনো নেসাব এবং কোনো হার অপরের ওপর চাপিয়ে দেয়।−(রাসায়েল ও মাসায়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭)

সোনা চাঁদির নেসাব

চাঁদির নেসাব দুশ দিরহাম যার ওজন ছত্রিশ তোলা সারে পাঁচ মাশা চাঁদি হয়। যার কাছে এ পরিমাণ চাঁদি থাকবে এবং তার ওপর এক বছর অতীত হবে তার যাকাত ওয়াজিব। তার কম ওজনের চাঁদির যাকাত ওয়াজিব নয়।[১]

সোনার নেসাব বিশ তালাই মিসকাল যার ওজন পাঁচ তোলা আড়াই মাশা সোনা।২ যার কাছে এতো ওজনে সোনা হবে এবং তারপর এক বছর অতীত হবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তার কম ওজনের সোনার জন্যে যাকাত দিতে হবে না।

মুদ্রা ও নোটের যাকাত

সরকারী মুদ্রা, যে কোনো ধাতুর হোক না কেন এবং কাগজের নোট প্রভৃতির যাকাত ওয়াজিব। তাদের মূল্য তাদের ধাতব দ্রব্য অথবা কাগজ হওয়ার কারণে নয় বরং তাদের ক্রয় ক্ষমতার জন্যে যা আইনত তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। যার কারণে তা সোনা-চাঁদির স্থলাভিষিক্ত। অতএব যার কাছে ৩৬ তোলা ৫$\frac{১}{২}$ মাশা চাঁদির মূল্য মুদ্রা অথবা নোটের আকারে থাকবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

যে মুদ্রার বাজারে প্রচলন নেই, অথবা খারাপ হয়ে গিয়েছে অথবা সরকার উঠিয়ে নিয়েছে—তার মধ্যে যদি কিছু পরিমাণে সোনা চাঁদি থাকে, তাহলে চাঁদি বা সোনার পরিমাণ অনুযায়ী তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

---

১. এ নেসাব মাওলানা আবদুশ শুকুর সাহেবের গবেষণালব্ধ (ইলমুল ফেকাহ দ্রঃ)। মাওলানা আবদুল হাই ফিরিংগী মহল্লীর গবেষণাও তাই। অবশ্যি কিছু আলেমের মতে চাঁদির নেসাব সাড়ে বায়ান্ন তোলা। এটাই অধিক প্রচলিত।

২. এ নেসাবও মাওলানা আবদুস শুকুর সাহেবের গবেষণার ফল (ইলমুল ফেকাহ) যা মাওলানা আবদুল হাই ফিরিংগী মহল্লী সমর্থন করেন। অবশ্য সাধারণত এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, সোনার নেসাব সাড়ে সাত তোলা।−(বেহেশতী জেওর)

বিদেশী মুদ্রা যদি নিজ দেশে সহজেই আপন মুদ্রার সাথে বদল করা যায় তাহলে তার হুকুম নগদ মূল্যের মতো। যদি বদল করা না যায় তাহলে তার ওপর যাকাত এ অবস্থায় ওয়াজিব হবে যদি তার মধ্যে নেসাব পরিমাণ সোনা চাঁদি থাকে। সোনা চাঁদি না থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

দিরহামের ওজনের যাচাই

যাকাত প্রসংগে যে দিরহাম উল্লেখ করা হয়েছে তা বলতে এমন দিরহাম যার ওজন ২ মাশা ১ ১/২ রতি। নবী (স) এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর যমানায় দিরহাম বিভিন্ন ওজনের হতো। হযরত ওমর (রা) মনে করলেন দিরহাম বিভির্ন্ন ওজনের হওয়ার কারণে লোকের ভেতর পারস্পরিক কলহ সৃষ্টি হয় এবং যাকাতের ব্যাপারেও জটিলতা সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি প্রত্যেক ওজনের এক এক দিরহাম নিয়ে একত্র করে গলিয়ে নেন এবং তিন ভাগ করে এক ভাগের ওজনেই করেন। তাতে চৌদ্দ কীরাত হয় এবং এ ওজনের ওপরে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হয়। তারপর সমস্ত আরবে এ ওজনের প্রচলন হয়। সে মোতাবেক শরীয়াতের দায়িত্ব পালন হতে থাকে।-(বাহরুর রায়েক প্রভৃতি)

তাহারাত ও নাজাসাত (পবিত্রতা অপবিত্রতা) অধ্যায়ে যে দিরহামের কথা বলা হয়েছে তা এক মিসকাল অর্থাৎ দীনারের সমান। আল্লামা ইবনে আবেদ শামীর গবেষণা অনুযায়ী একশ' যবে এক দীনার, চার যবে এক রতি এবং আট রতিতে এক মাশা হয়। এ হিসেব অনুযায়ী এক দীনারের ওজন তিন মাশা এক রতি হয়। এ গবেষণা অনুযায়ী আসান ফেকাহর প্রথম খণ্ডে আমরা এক দিরহামের ওজন ৩ মাশা ১ রতি লিখেছি।

ব্যবসার মালের যাকাত

ব্যবসার মালের নেসাবও তাই যা সোনা চাঁদির নেসাব। অর্থাৎ সোনা অথবা চাঁদির নেসাবের ভিত্তিতে যাকাত দিতে হবে। যেমন ধরুন, আপনার কাছে মোট চারশ' টাকা মওজুদ আছে। এতে সোনার নেসাব তো হয় না কিন্তু চাঁদির নেসাব হয়, তাহলে সেই নেসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসার মালের যাকাতের পদ্ধতি এই যে, ব্যবসা শুরু করার দিন থেকে এক বছর হয়ে গেলে মওজুদ মালে (Stock in trade) মূল্য হিসেব করতে হবে। তারপর দেখতে হবে নগত তহবিল (cash in hand) কি আছে। এখন উভয়ের সমষ্টির ওপর যাকাত বের করতে হবে। যদি মওজুদ স্টক এবং নগদ তহবিল নেসাবের কম হয় এবং তারপর হঠাৎ ব্যবসার পণ্যের দাম

বাড়তে থাকায় নেসাব পরিমাণ কিংবা তার অধিক হয়ে যায়, তাহলে যে তারিখ থেকে দাম বেড়েছে সে তারিখ থেকে যাকাতের বছর শুরু হবে।

যদি কোনো ব্যবসায় কয়েজন অংশীদার থাকে, তাহলে ব্যবসার সামগ্রিক স্টক এবং নগদ তহবিলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। বরঞ্চ প্রত্যেক অংশীদারের অংশ এবং মুনাফার টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি এ অংশ এবং তার মুনাফা নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে নতুবা হবে না।

এমনিভাবে কিছু মাল যদি কয়েক ব্যক্তির অংশীদারিত্বে হয় তাহলে তার ওপর যাকাত তখনই হবে, যখন প্রত্যেক অংশীদারের অংশ নেসাব পরিমাণ হবে। যেমন ধরুন, দু ব্যক্তির মিলে চল্লিশ ছাগল আছে অথবা ষাট তোলা চাঁদি দু ব্যক্তির মালিকানায় আছে। তাহলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

ব্যবসার কাজে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি, দালানকোঠা, অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানের ওপর যাকাত ওয়াজেব হয় না। শুধু ব্যবসার মালপত্র এবং নগদ তহবিল মিলে যে মূল্য হবে তার যাকাত ওয়াজিব হবে।[১] যাকাত দেয়ার সময় ঐসব কাজের টাকা-পয়সাও হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে যা ব্যবসা করা কালীন আদান প্রদান হয়েছে। হযরত সামরা বিন জুন্দুব বলেন, নবী (স) আমাদেরকে ব্যবসার মালের যাকাত দিতে বলেছেন।-(আবু দাউদ)

অলংকারের যাকাত

সোনা চাঁদি যে আকারেই হোক তার ওপর যাকাত ওয়াজিব। তা সে মুদ্রা হোক, খণ্ড, তারব্রকেড হোক, অথবা কাপড়ের ওপর সোনার জরির কাজ হোক, অথবা কাপড় বুনোনে সোনা বা সোনা চাঁদির চিকন তার হোক, অথবা মেয়েদের ব্যবহারের অলংকার হোক, প্রত্যেক বস্তুর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

১. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এই যে, কারবারে সামগ্রিক স্টক এবং নগদ তহবিল যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে। প্রত্যেক অংশীদারের অংশ নেসাব পরিমাণ হোক বা না হোক। ইমাম মালেকের মতেও যাকাত সামষ্টিক মাল থেকেই আদায় করতে হবে। কিন্তু ঐসব অংশীদারকে গণনার বাইরে রাখতে হবে যারা সাহেবে নেসাব নয় অথবা যে এক বছরের কম সময়ে তার অংশের মালিক রয়েছে। এ অভিমতই বেশী মুনাসিব এবং বাস্তব।

ইয়ামেনের জনৈকা মহিলা নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হলো, তার সাথে তার মেয়ে ছিল যার হাতে সোনার দুটি মোটা কংকন ছিল। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এর যাকাত দাও ? সে বললো, জি–না, যাকাত তো দিই না। নবী (স) বললেন, তুমি কি এটা পসন্দ করো যে, কেয়ামতের দিন ঐ অপরাধে তোমাকে আগুনের কংকন পরিয়ে দেয়া হবে। একথা শুনে মহিলাটি দুটি কংকন খুলে নবীর হাতে দিয়ে বললো, এগুলো আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টির জন্যে পেশ করছি।–(নাসায়ী)

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, আমি কংকন পরতাম এবং একদিন নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এটা কান্‌য্ (যে সঞ্চিত সম্পদে যাকাত দেয়া হয় না) বলে গণ্য হবে ? তিনি বললেন, যে মাল যাকাত দেয়ার পরিমাণে পৌঁছে এবং তার যাকাত দেয়া হয় তা কান্‌য্ নয়।–(আবু দাউদ)

অলংকারের যাকাত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আল্লামা মওদূদী বলেন ঃ

অলংকারের যাকাত সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত আছে। একটি অভিমত এই যে, এর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কর্জ হিসেবে তা দেয়াটাই তার যাকাত। এ হচ্ছে আনাস বিন মালেক, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব এবং শাবীর উক্তি। দ্বিতীয় অভিমত এই যে, অলংকারের যাকাত জীবনে একবার দিলেই যথেষ্ট হবে। তৃতীয় অভিমত এই যে, যে অলংকার সর্বদা ব্যবহার করা হয় তার ওপর যাকাত নেই। যা অধিক সময়ে তুলে রাখা হয় তার ওপর যাকাত ওয়াজিব। চতুর্থ অভিমত এই যে, সব রকমের অলংকারের যাকাত ওয়াজিব। আমাদের মতে এ সর্বশেষ অভিমতটি সঠিক। প্রথমত, যেসব হাদীসে সোনা চাঁদির ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রয়েছে তার শব্দগুলো সাধারণ। যেমন চাঁদির ওপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত এবং পাঁচ উকিয়ার কম হলে তার ওপর যাকাত নেই। বিভিন্ন হাদীস ও 'আসার' থেকে জানা যায় যে, অলংকারের ওপর যাকাত ওয়াজিব। আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ীতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একজন নারী নবী (স)-এর দরবারে আসে এবং তার সাথে তার মেয়ে ছিল। তার দুটি হাতে সোনার কংকন ছিল। নবী (স) বললেন, তুমি এর যাকাত দাও ? সে বললো, না। তখন নবী (স) বলেন, তুমি কি পসন্দ কর যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তোমাকে তার বদলে আগুনের কংকন পরিয়ে দেবেন ?

উপরন্তু মুয়াত্তা, আবু দাউদ ও দারে কুতনীতে নবী (স)-এর এ উক্তি নকল করা হয়েছে ما اديت زكواته فليس بكنز যে অলংকারের যাকাত তুমি দিয়েছ তা কান্‌য্ নয়। ইবনে হায্‌ম বলেন, হযরত ওমর (রা)-ও তাঁর গভর্নর আবু

মূসা আশয়ারীকে যে ফরমান পাঠান, তাতে এ হেদায়াত ছিল মুসলমান মেয়েলোকদেরকে আদেশ কর তারা যেন তাদের অলংকারের যাকাত দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল— অলংকার সম্পর্কে হুকুম কি ? তিনি বলেন, যখন তা দু'শ দিরহাম পরিমাণ হবে তখন তার যাকাত দিতে হবে। এ ধরনের উক্তি সাহাবাদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) এবং আয়েশা (রা) এবং তাবেঈনদের মধ্যে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, সাঈদ বিন বুহাইর, আতা, মুজাহিদ, ইবনে সিরীন ও যুহরী এবং ফেকার ইমামদের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী, আবু হানিফা ও তার সংগীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

যাকাতের হার

১. সোনা, চাঁদি, ব্যবসার মাল, ধাতু মুদ্রা, নোট, অলংকার প্রভৃতির শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত ওয়াজেব হবে।

২. সোনা, চাঁদি অথবা অলংকারের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ সোনা অথবা চাঁদি যাকাত হিসেবে দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু জরুরী নয় যে, সোনা চাঁদিই যাকাত হিসেবে দিতে হবে। তার মূল্য হিসেব করে নগদ অর্থও দেয়া যেতে পারে। কাপড় এবং অন্যান্য বস্তুও দেয়া যেতে পারে। নগদ অর্থ এবং তেজারতি মালের মূল্য যদি সোনা অথবা চাঁদির কোনোটির নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।

৩. সোনা, চাঁদি নেসাব পূর্ণ হয়ে কিছু বেশী সোনা চাঁদি অথবা তেজারতি মাল কারো কাছে যদি থাকে তাহলে তার ওপরও এ অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি তা নেসাবের এক-পঞ্চমাংশ হয়। তার কম হলে যাকাত মাফ।-(ইল্‌মুল ফেকাহ)

৪. যদি কোনো অলংকারে, দলা অথবা কাপড়ে সোনা চাঁদি উভয়ই থাকে তাহলে দেখতে হবে কার পরিমাণ বেশী। যার পরিমাণ বেশী হবে তারই হিসেব ধরতে হবে। যদি সোনা বেশী হয় তাহলে সব সোনা মনে করে সোনার নেসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। যদি চাঁদির পরিমাণ বেশী হয় তাহলে সমুদয় চাঁদি মনে করে চাঁদির নেসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।

৫. সোনা, চাঁদির অলংকারাদিতে যদি অন্য কোনো ধাতু মিশ্রিত থাকে এবং তার পরিমাণ যদি সোনা চাঁদির কম হয় তাহলে তা ধর্তব্যের মধ্যে হবে

না। তা সোনা চাঁদি মনে করে যাকাত দিতে হবে। আর যদি তার মধ্যে সোনা চাঁদি কম থাকে তাহলে শুধু সোনা, চাঁদির হিসেব করতে হবে। তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে, নতুবা দিতে হবে না।

৬. একজনের নিকটে কিছু সোনা এবং কিছু চাঁদি আছে। তার মধ্যে যেটারই নেসাব পুরো হবে তার সাথে অন্যটার মূল্য হিসেব করে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।

৭. যদি কারো নিকটে সোনাও নেসাবের কম এবং চাঁদিও নেসাবের কম আছে। তাহলে চাঁদিকে সোনার সাথে মিলিয়ে অথবা সোনাকে চাঁদির সাথে মিলিয়ে যে নেসাব পুরো হবে তার শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে। এমনি কিছু নগদ টাকা আছে, কিছু চাঁদি আছে, কিছু তেজারতি মাল আছে। তাহলে সব মিলিয়ে যদি চাঁদি অথবা সোনার নেসাব পুরো হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে।

৮. অলংকারের যেসব মণিমুক্তা প্রভৃতি থাকবে তার যাকাত নেই। ওজনে সেগুলো বাদ দিয়ে বাকী সোনো চাঁদির শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

যেসবের ওপর যাকাত নেই

১. বাসের বাড়ী ঘরের ওপর যাকাত নেই। তা যতো মূল্যবান হোক না কেন।

২. যে কোনো প্রকারের মণিমুক্তা ইত্যাদির ওপর যাকাত নেই।

৩. কৃষি ও সেচ কাজের জন্যে যে পশু, যেমন—গরু, মহিষ, উট প্রতিপালন করা হয় তার ওপর যাকাত নেই। এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, এক ব্যক্তি তার কারবারে উৎপাদনের যেসব উপাদান ব্যবহার করে তা যাকাত বহির্ভূত। হাদীসে আছে ঃ ليس في الابل العوامل صدقة যেসব উট দিয়ে কৃষি কাজ করা হয় তার ওপর যাকাত নেই। কারণ তার যাকাত যমীন থেকে উৎপন্ন ফসল থেকে আদায় করা হয়। এরূপ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির উপর যাকাত নেই।

৪. কল-কারখানা, মেশিন ও যন্ত্রপাতির ওপর যাকাত নেই। উপরন্তু কারখানার দালান কোঠা, ব্যবসায় ব্যবহৃত ফার্নিচার, দোকান ঘর এ সবের ওপর যাকাত নেই।

৫. ডেয়রী ফার্মের পশুর ওপর যাকাত নেই। কারণ সেগুলো তো উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে পড়ে। অবশ্যি ডেয়রী থেকে উৎপাদিত বস্তুর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

৬. মূল্যবান কোনো দুষ্প্রাপ্য জিনিস কেউ যদি সখ করে ঘরে রাখে, তার ওপর যাকাত নেই। তবে যদি তার ব্যবসা করা হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে, যেমন তেজারতি মালের উপর হয়।

৭. কেউ যদি চৌবাচ্চায় বা পুকুরে সৌখিন মাছ পুষে, তাহলে তার ওপর যাকাত নেই। কিন্তু তার ব্যবসা করলে যাকাত দিতে হবে।

৮. গৃহপালিত পশু যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাখা হয়, যেমন দুধ পানের জন্যে গাভী, বোঝা বহনের জন্যে গরু–মহিষ, যানবাহনের জন্যে ঘোড়া, হাতী, উট তাহলে তার সংখ্যা যতোই হোক না কেন, যাকাত দিতে হবে না।

৯. চড়ে বেড়াবার জন্যে মোটর সাইকেল, কার, বাস থাকলে তার ওপর যাকাত নেই।

১০. ডিম বিক্রির জন্যে হাঁস-মুরগীর ফার্ম করলে হাঁস-মুরগীর ওপর যাকাত নেই। তবে বিক্রি করা ডিমের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে যেমন অন্যান্য ব্যবসার উপর হয়।

১১. সখ করে মুরগী অথবা কোনো পাখী পুষলে তার ওপর যাকাত নেই।

১২. যেসব জিনিসের ভাড়া খাটানো হয়, যেমন সাইকেল, রিকশা, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, ফার্নিচার, ক্রকারী প্রভৃতির ওপর যাকাত নেই। তবে এসব থেকে যে মুনাফা হবে তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছর অতীত হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে। ঐসব জিনিসের মূল্যের ওপর কোনো যাকাত নেই।

১৩. দোকান ও বাড়ী ঘর থেকে যে ভাড়া আদায় করা হয় তার ওপর কোনো যাকাত নেই, তার মূল্য যতোই হোক না কেন।

১৪. পরনের কাপড়, কোট, প্যান্ট, চাদর, কম্বল, টুপি, জুতা, ঘড়ি, ঘরের আসবাবপত্র, কলম প্রভৃতির ওপর যাকাত নেই, মূল্য তার যতোই হোক না কেন।

১৫. গাধা, খচ্চর, ঘোড়ার ওপর যাকাত নেই, যদি তা ব্যবসার জন্যে না হয়।

১৬. ওয়াকফের পশুর ওপরও যাকাত নেই। যেসব ঘোড়া জেহাদের জন্যে পালা হয় এবং যেসব অস্ত্রশস্ত্র জেহাদ ও দীনের খেদমতের জন্যে, তার ওপরও যাকাত নেই।

পশুর যাকাত

সাধারণ মাঠে-ময়দানে চরে বেড়ানো গৃহপালিত পশু বংশ বৃদ্ধি ও দুধের জন্যে প্রতিপালিত হলে তাকে পরিভাষায় 'সায়েমা' বলে। তার ওপর যাকাত ওয়াজিব। যেসব পশু গোশত খাওয়ার জন্যে পালা হয় এবং বন্য পশু যেমন হরিণ, নীল গাই, চিতা প্রভৃতির ওপর যাকাত নেই। তবে এ বন্য পশু যদি ব্যবসার জন্যে হয়, তাহলে তার ওপর তেমনি যাকাত ওয়াজিব হবে যেমন তেজারতের মালের ওপর হয়। অর্থাৎ ব্যবসায় মূলধন যদি বছরের সূচনায় ও শেষে দু'শ দিরহাম অথবা তার বেশী হয় তাহলে যাকাত, নতুবা হবে না।

যে পশু গৃহপালিত ও বন্য পশুর সংগমে পয়দা হয় তার ওপর যাকাত ওয়াজিব এ শর্তে যে, সংগমকারী পশুগুলোর মধ্যে মাদা গৃহপালিত হয় এবং নর বন্য হয়। যেমন ছাগল এবং নর হরিণের সংগমে যে পশু পয়দা হবে তার ওপর যাকাত ওয়াজেব হবে।

যেসব 'সায়েমা' পশু ওয়াকফ করা তার যাকাত নেই। এভাবে যে ঘোড়া ওয়াকফ করা অথবা জেহাদের জন্যে পালা হয় তার ওপর যাকাত নেই।

সায়েমা পশু যদি যাকাতের জন্যে পালা হয় তাহলে তাদের ওপর ঐরূপ যাকাত ওয়াজিব হবে যা তেজারতি মালের ওপর হয়।

যদি কেউ বংশ বৃদ্ধির জন্যে 'সায়েমা' পশু পালন করে তারপর বছরের মাঝখানে ব্যবসার ইচ্ছা করলো। তাহলে সে বছরের যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যে দিন থেকে ব্যবসার ইচ্ছা করেছে সেদিন থেকে তার তেজারতি বছর শুরু হবে এবং বছর পুরো হওয়ার পর তেজারতি যাকাত দিতে হবে।

ভেড়া-ছাগলের নেসাব ও যাকাতের হার

যাকাতের ব্যাপারে ভেড়া-ছাগল, দুম্বা সকলেরই একই হুকুম। সকলের একই নেসাব এবং যাকাতের হার একই। যদি কারো কাছে দুম্বাও আছে এবং ছাগলও আছে এবং উভয়ের নেসাব পূর্ণ হয়েছে, তাহলে উভয়ের পৃথক পৃথক যাকাত দিতে হবে। আর যদি উভয়ের একত্র করলে নেসাব পূর্ণ হয়, তাহলে যার সংখ্যা বেশী হবে যাকাতে সেই পশুটি দিতে হবে। উভয়ের সংখ্যা সমান হলে যেটা ইচ্ছা দেয়া যায়।

নেসাব এবং যাকাতের হার আদায়

৪০টি ভেড়া-ছাগলে একটি ভেড়া বা ছাগল।

৪১ থেকে ১২০ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত ওয়াজিব নয়।

১২১ হলে দুটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

১২২ থেকে ২০০ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত নেই।

২০১ হলে তিনটি ছাগল।

২০২ থেকে ৩৯৯ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত নেই।

৪০০ হলে ৪টি ছাগল বা ভেড়া যাকাত দিতে হবে।

৪০০ এর পরে ১০০ পুরো হলে একটা ছাগল বা ভেড়ার হিসেবে যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ শতকরা একটি করে। ভেড়া-ছাগলের যাকাত এক বছর বা তার বেশী বয়সের বাচ্চা যাকাত দিতে হবে।

গরু-মহিষের নেসাব ও যাকাতের হার

যাকাতের ব্যাপারে গরু ও মহিষের একই হুকুম। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র) মহিষকে গরু হিসেবে ধরে তার ওপর ঐ ধরনের যাকাত আরোপ করেন যা নবী (স) নির্ধারণ করেছিলেন। উভয়ের নেসাব ও যাকাতের হার এক। কারো কাছে উভয় ধরনের পশু থাকলে উভয়কে মিলিয়ে নেসাব পূর্ণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে। যার সংখ্যা বেশী হবে তার মধ্য থেকে যাকাত দিতে হবে। উভয়ের সংখ্যা সমান হলে যে কোনো একটা দেয়া যাবে।

নেসাব ও যাকাতের হার

যে ব্যক্তি ৩০টি গরু-মহিষের মালিক হবে তার ওপর যাকাত ফরয হবে। তার কম হলে যাকাত নেই।

৩০টি গরু-মহিষের মধ্যে গরু বা মহিষের একটি বাচ্চা দিতে হবে যার বয়স পূর্ণ এক বছর হয়েছে।

৩১ থেকে ৩৯ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত নেই। ৪০টি গরু-মহিষ হলে এমন একটি বাচ্চা যাকাত দিতে হবে যার বয়স পূর্ণ দু বছর।

৪১ থেকে ৫৯ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত নেই। ৬০টি গরু-মহিষ হলে এক বছরের দুটি বাচ্চা যাকাত দিতে হবে। ষাটের পরে প্রত্যেক ৩০ গরু-মহিষে এক বছরের বাচ্চা এবং প্রত্যেক ৪০ গরু-মহিষে দু বছরের বাচ্চা দিতে হবে।

যেমন ধরুন কারো কাছে ৭০টি গরু-মহিষ আছে। এখন ৭০টিতে দু নেসাব আছে একটা তিরিশের এবং অন্যটা চল্লিশের। যদি ৮০টি গরু-মহিষ হয় তাহলে চল্লিশ চল্লিশের দু নেসাব হবে। অতএব দু বছরের দু বাচ্চা

ওয়াজিব হবে। ৯০টি হলে ত্রিশ ত্রিশের তিন নেসাব হবে। যার জন্যে প্রত্যেক ৩০টির ওপর এক বছরের বাচ্চার হারে যাকাত দিতে হবে।

উটের নেসাব ও যাকাতের হার

যে ব্যক্তি পাঁচটি উটের মালিক হবে সে সাহেবে নেসাব হবে। তার ওপর যাকাত ওয়াজিব। তার কম উটের যাকাত নেই।

নেসাব ও যাকাতের হারের বিবরণ

পাঁচটি উটের ওপর একটি ছাগল ওয়াজিব এবং ৯টি উট পর্যন্ত ঐ একটি ছাগল।

দশটি উট হলে দুটি ছাগল এবং ১৪টি পর্যন্ত ঐ দু'টিই।

পনেরোটি উট হলে তিনটি ছাগল এবং ১৯টি পর্যন্ত ঐ একই।

বিশটি উটে ৪টি ছাগল এবং ২৪টি পর্যন্ত ঐ একই।

পঁচিশটি উটের ওপর এমন এক উটনী যার বয়স দ্বিতীয় বছর শুরু হয়েছে।

২৬ থেকে ৩৫ পর্যন্ত অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে না। ৩৬টি উট হলে এমন এক উটনী দিতে হবে যার বয়স তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে।

৩৭ থেকে ৪৫ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত নেই।

৪৬টি উট হলে এমন এক উটনী দিতে হবে যার বয়স চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে।

৪৭ থেকে ৬০ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত নেই।

৬১টি হলে এমন এক উটনী দিতে হবে যার বয়স পঞ্চম বছর শুরু হয়েছে।

৬২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত নেই।

৭৬ হলে দুটি উটনী যাদের বয়স তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে।

৭৭ থেকে ৯০ পর্যন্ত কোনো অতিরিক্ত যাকাত নেই।

৯১টি হলে দুটি এমন উটনী যার বয়স চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে।

১২০ পর্যন্ত উপরোক্ত দুটি উটনী।

তারপর পুনরায় সেই হিসেব শুরু হবে—অর্থাৎ ৫টির ওপর এক ছাগল, ১০টির ওপর দু ছাগল।

যাকাত দানের ব্যাপারে একটি জরুরী ব্যাখ্যা

সোনা, চাঁদি ও পশুর যে যাকাত ওয়াজিব হবে তা সোনা, চাঁদি এবং পশুর আকারেও দেয়া যাবে এবং নগদ টাকায়ও দেয়া যাবে। অলংকারের যাকাতে

সোনা চাঁদি দেয়া জরুরী নয়। বাজারের প্রচলিত নিরিখে তার মূল্য ধরে নগদও দেয়া যায়।

কোন্ কোন্ খাতে যাকাত ব্যয় করা যায়

কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা শুধু যাকাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম বয়ান করে তার জন্যে শধু তাকীদই করেননি, বরঞ্চ বিশদভাবে তার ব্যয় করার খাতগুলোও বলে দিয়েছেন।

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ (توبة ٦٠)

"এ সদকা তো ফকীর মিসকীনদের জন্যে এবং তাদের জন্য যারা সদকার কাজের জন্য নিয়োজিত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য। এবং শৃংখলা মুক্ত করার জন্যে। ঋণগ্রস্তদের সাহায্যের জন্যে। আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে অবশ্য পালনীয় ফরয আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এবং মহাজ্ঞানী।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

এ আয়াতে যাকাতের আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে ঃ

(১) ফকীর বা দরিদ্র, (২) মিসকিন অভাবগ্রস্ত অথচ হাত পাতে না, (৩) যাকাত আদায় ও বন্টনের কর্মচারী, (৪) মন জয় করার উদ্দেশ্যে, (৫) শৃংখলমুক্ত করার জন্যে, (৬) ঋণগ্রস্তদের জন্যে, (৭) ফী সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে, (৮) পথিক-মুসাফির।

যাকাত এ আট খাতেই ব্যয় করা যেতে পারে তার বাইরে নয়।

হযরত যিয়াদ বিন আল হারেস (রা) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী (স)-এর খেদমতে এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বললো, যাকাত থেকে আমাকে কিছু দিন। নবী (স) বললেন, আল্লাহ যাকাত ব্যয় করার খাতগুলো কোনো নবীর ওপর ছেড়ে দেননি আর না কোনো অনবীর ওপর। বরঞ্চ তিনি স্বয়ং তার ফায়সালা করে দিয়েছেন। তার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তুমি যদি এ খাতগুলোর মধ্যে পড় তাহলে অবশ্যই তোমাকে যাকাত দিয়ে দেব।

খাতগুলোর বিশদ বিবরণ

১. **ফকীর ঃ** ফকীর বলতে সে সব নারী-পুরুষকে বুঝায় যারা তাদের জীবন ধারণের জন্যে অপরের সাহায্য সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে। এর মধ্যে ঐসব দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত, অক্ষম অপারগ ব্যক্তি শামিল যারা সময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে আর্থিক সাহায্যের হকদার। জীবিকা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি, পংগু, এতিম শিশু, বিধবা, স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল, বেকার এবং যারা দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বীকার এমন লোকদেরকে সাময়িকভাবে যাকাতের খাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে এবং তাদের জন্যে স্থায়ী ভাতাও নির্ধারিত করা যেতে পারে।

২. **মিসকীন ঃ** মিসকীন বলতে ঐসব দরিদ্র সম্ভ্রান্ত লোক বুঝায় যারা খুবই দুস্থ ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সম্মানের ভয়ে ও লজ্জায় কারো কাছে হাত পাতে না। জীবিকার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করার পরও দু মুঠো ভাত জোগাড় করতে পারে না, তবুও নিজের দুঃখের কথা কাউকে বলে না। হাদীসে মিসকীনের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اَلَّذِیْ لَایَجِدُ غَنِیً یُغْنِیْهِ وَلَا یُفْطِنُ لَهٗ فَیَتَصَدَّقَ وَلَا یَقُوْمُ فَیَسْئَلُ النَّاس

"যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ পায় না, আর না তাকে (তার আত্মসম্মানের জন্যে) বুঝতে বা চিনতে পারা যায়, যার জন্যে লোক তাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে, আর না সে বেরিয়ে পড়ে লোকের কাছে কিছু চায়।-(বুখারী, মুসলিম)

৩. **যাকাত বিভাগের কর্মচারী (عاملین علیها) ঃ** এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা যাকাত, ওশর আদায় করে, তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, বণ্টন করে এবং তার হিসেব পত্র সংরক্ষণ করে। তারা সাহেবে নেসাব হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। তাদের বেতন যাকাত থেকে দেয়া যেতে পারে।

৪. **যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য (مولفة القلوب) ঃ** এ হচ্ছে ঐসব লোক যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য। ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থে তাদেরকে হাত করা, তাদের বিরোধিতা বন্ধ করার প্রয়োজন হয়। এসব লোক কাফেরও হতে পারে এবং ঐসব মুসলমানও হতে পারে যাদের ইসলাম তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের খেদমতের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট নয়। এসব লোক সাহেবে নেসাব হলেও তাদেরকে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

হানাফীদের অভিমত এই যে, ইসলামের সূচনায় এ ধরনের লোকের মন জয় করার জন্যে যাকাত থেকে খরচ করা হতো। কিন্তু হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর যমানায় এ ধরনের লোককে যাকাত দিতে অস্বীকার করেন[১] এবং এ ব্যবস্থা চিরদিনের জন্যে রহিত হয়ে যায়।

এ অভিমত ইমাম মালেকও পোষণ করেন। অবশ্যি কোনো কোনো ফকীহর মতে এ খাত এখনো বাকী রয়েছে এবং প্রয়োজন অনুসারে মন জয় করার জন্যে যাকাতের মাল ব্যয় করা যেতে পারে।[২]

৫. শৃংখলমুক্ত করা (গোলাম আযাদ করা) ঃ অর্থাৎ যে গোলাম তার মনিবের সাথে এরূপ চুক্তি করেছে যে, এতো টাকা দিলে তাকে মুক্ত করে দেবে, এমন গোলামকে বলে মাকাতিব। আযাদীর মূল্য পরিশোধ করার জন্যে মাকাতিবকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। সাধারণ গোলামকে যাকাতের টাকা দিয়ে আযাদ করা জায়েয নয়। কোনো সময়ে যদি গোলাম বিদ্যমান না থাকে, তাহলে এ খাত রহিত হয়ে যাবে।

---

১. প্রকৃত ঘটনা এই ছিল যে, নবী (স)-এর ইন্তেকালের পর উয়ায়না বিন হাসান এবং আকরা বিন হাবেস হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে এক খণ্ড যমী দাবী করেন। তিনি তাদেরকে দানের ফরমান লিখে দেন। তারা চাইছিল যে, বিষয়টিকে মজবুত করার জন্যে অন্যান্য সাহাবীগণও সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করুক। কিছু স্বাক্ষরও হলো। তারপর যখন হযরত ওমর (রা)-এর সাক্ষ্য নিতে গেল তখন তিনি ফরমান পড়ার পর তাদের চোখের সামনেই ছিঁড়ে ফেলে দেন। তাদেরকে বলেন, নবী (স) তোমাদের মন জয় করার জন্যে তোমাদেরকে এরূপ দিতেন। কিন্তু সেটা ছিল ইসলামের দুর্বলতা যুগ। এখন আল্লাহ ইসলামকে তোমাদের মুখাপেক্ষী করে রাখেননি। তারপর তারা হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকটে অভিযোগ করে বলে, খলীফা কি আপনি, না ওমর ? কিন্তু না হযরত আবু বকর (রা) এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন, আর না অন্যান্য সাহাবীগণ হযরত ওমর (রা) থেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। এর থেকে হানাফীগণ এ যুক্তি পেশ করেন যে, যখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেল এবং এমন শক্তির অধিকারী হলো যে, তারা নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হলো, তখন সে অবস্থা আর রইলো না যার কারণে মন জয় করার জন্যে একটা অংশ রাখা হয়েছিল। অতএব সাহাবীদের ইজমার ভিত্তিতে ঐ অংশ চিরদিনের জন্যে রহিত হয়ে গেল।

২. আল্লামা মওদূদী (র) এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ আমাদের নিকটে সঠিক এটাই যে, 'মুয়াল্লেফাতু কুলুব'-এর অংশ কেয়ামত পর্যন্ত রহিত হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। নিসন্দেহে হযরত ওমর (রা) যাকিছু বলেছিলেন তা ঠিক ছিল। যদি ইসলামী রাষ্ট্র মন জয় করার জন্যে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজনবোধ না করে, তাহলে কেউ তার ওপরে এটা ফরয করে দেননি যে, এ খাতে অবশ্যই কিছু না কিছু খরচ করতে হবে। কিন্তু কোনো সময়ে যদি তার প্রয়োজন হয়, তাহলে আল্লাহ তার জন্যে অবকাশ রেখেছেন, তা বাকী থাকা উচিত। হযরত ওমর (রা) এবং সাহাবায়ে কেরামের যে বিষয়ের ওপর ইজমা হয়েছিল তা এই যে, সে সময়ে যে অবস্থা ছিল তখন মন জয় করার জন্যে কাউকে কিছু দেয়া তারা জরুরী মনে করেননি। তার থেকে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো সংগত কারণ নেই যে, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ঐ খাতকে কেয়ামত পর্যন্ত রহিত করে দিয়েছে যা কুরআনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বাঞ্ছনীয়তার জন্যে রাখা হয়েছিল।-(তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড-পৃষ্ঠা ২০৭ ; ইমাম শাফেয়ীরও তাই মত)

৬. ঋণগ্রস্ত ঃ যারা ঋণের বোঝায় পিষ্ট এবং আপন প্রয়োজন পূরণের পর ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। বেকার হোক অথবা উপার্জনশীল এবং এতো সম্পদ নেই যে কর্জ পরিশোধের পর নেসাব পরিমাণ মাল তার কাছে থাকবে। ঋণগ্রস্তের মধ্যে তারাও শামিল যারা কোনো অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, কোনো ক্ষতিপূরণ অথবা জরিমানা দিতে হয়েছে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেছে অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় সব সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে।

৭. ফী সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে) ঃ এর অর্থ আল্লাহর পথে জেহাদ। কেতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের তুলনায় জেহাদ শব্দটি সাধারণত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জেহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মধ্যে যে সমুদয় চেষ্টা চরিত্র শামিল যা মুজাহিদগণ কুফরী ব্যবস্থাকে নির্মূল করে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে করে থাকেন। সে চেষ্টা চরিত্র কলমের দ্বারা হোক, হাত-মুখ ও তরবারীর দ্বারা হোক অথবা কঠোর শ্রম সাধনার দ্বারা হোক তার সীমারেখা এতো সীমিত নয় যে, তার অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ এবং তা এতোটা ব্যাপকও নয় যে, তার মধ্যে দৈনন্দিন সকল সমাজকল্যাণমূলক কাজও শামিল করা যায়। অতীতে ইসলামের মনীষীগণ জেহাদ ফী সাবিলিল্লাহর সর্বসম্মতভাবে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন যে, তা এমন সব চেষ্টা চরিত্র যা দ্বীনে হক কায়েম করার জন্যে, তার প্রচার ও প্রসারের জন্যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে করা হয়। এ চেষ্টা চরিত্র যারা করে তাদের যাতায়াত খরচ, যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্যে যাকাত থেকে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

৮. পথিক বা মুসাফির ঃ পথিক বা প্রবাসীর নিজ বাড়ীতে যত ধন-সম্পদ থাকুক না কেন, কিন্তু পথে বা প্রবাসে সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে তাকে যাকাতের টাকা দিতে হবে।

যাকাতের অর্থ ব্যয় সম্পর্কে কিছু কথা

১. এটা জরুরী নয় যে, যাকাতের অর্থ সব খাতেই ব্যয় করতে হবে যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। বরঞ্চ প্রয়োজন অনুসারে ও সুযোগ সুবিধা মত যে যে খাতে যতোটা মুনাসিব মনে করা হবে ব্যয় করা যেতে পারে। এমনকি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কোনো একটি খাতে সমুদয় অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

২. যাকাত ব্যয় করার যেসব খাত, ওশর এবং সদকায়ে ফিতরেরও সেই খাত। নফল সদকা অবশ্যি দাতার এখতিয়ারাধীন।

৩. বনী হাশিমের লোক যদি যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজে নিযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত থেকে পারিশ্রমিক দেয়া জায়েয হবে না। নবী (স) তাঁর নিজের ওপর এবং বনী হাশিমের লোকদের ওপরে যাকাতের মাল হারাম করে দিয়েছেন, তবে বনী হাশিমের লোক বিনা পারিশ্রমিকে এ খেদমত করতে চাইলে করতে পারেন—যেমন নবী (স) স্বয়ং যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ করেছেন।

৪. সাধারণ অবস্থায় কোনো ব্যক্তির যাকাত সে বস্তিরই অভাবগ্রস্ত ও দুঃস্থদের মধ্যে ব্যয় করা উচিত, এটা মুনাসিব নয় যে, সে বস্তির লোক বঞ্চিত থাকবে এবং যাকাত অন্য স্থানে পাঠানো হবে। তবে অন্য স্থানের প্রয়োজন যদি তীব্র হয় অথবা দীনী বাঞ্ছনীয়তার দাবী হয়, যেমন কোথাও ভূমিকম্প হয়েছে অথবা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে অথবা কোনো আকস্মিক বিপদ এসেছে, কিংবা প্রলয়ংকর ঝড়-তুফান হয়েছে, অথবা অন্য স্থানে কোনো দীনী মাদ্রাসা আছে যার আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন, অথবা কোনো আত্মীয়-স্বজন আছে, তাহলে অন্য স্থানে যাকাত পাঠানো জায়েয। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, নিজ বস্তির লোক একেবারে যেন বঞ্চিত না হয়।

যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়

সাত প্রকারের লোককে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। দিলে যাকাত আদায় হবে না।

১. বাপ-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও তাদের-বাপ-মা।
২. সন্তান-সন্ততি, নীচের দিক পর্যন্ত, যথা ছেলে-মেয়ে, পৌত্র, প্রপৌত্র, নাতী-নাতনী প্রভৃতি।
৩. স্বামী।
৪. স্ত্রী।

এসব লোককে যাকাত দেয়ার অর্থ আপনজনদেরকে উপকৃত করা। তবে তার অর্থ এটাও কখনো নয় যে, লোক তার মাল দ্বারা এসব লোকের কোনো সাহায্য করবে না। বরঞ্চ শরীয়াতের দৃষ্টিতে তাদের ভরণ-পোষণ ও দেখা শুনা করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। উপরোক্ত চার ধরনের [illegible] ছাড়া অন্যান্য সকল আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া শুধু জায়েযই [illegible] অতি উত্তম ও বেশী সওয়াবের বিষয়।

৫. সাহেবে নেসাব সচ্ছল ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দেয়াও নাজায়েয। কোনো গরীব দুঃস্থকে এতোটা দেয়াও জায়েয নয় যে, সে সাহেবে নেসাব হয়ে যায়। তবে যদি সে ঋণগ্রস্ত হয় অথবা অধিক সন্তানের মালিক হয় তাহলে প্রয়োজন অনুসারে বেশী পরিমাণ দেয়া যেতে পারে। নবী (স) বলেন, সদকা মালদারের জন্যে জায়েয নয় এ পাঁচ ধরনের লোক ছাড়া, যথা (১) আল্লাহর পথে জেহাদকারী, (২) ঋণগ্রস্ত, (৩) সদকা আদায় ও বন্টনকারী, (৪) এমন ব্যক্তি যে তার অর্থ দিয়ে সদকার মাল খরিদ করে, (৫) এমন ব্যক্তি যার প্রতিবেশী মিসকীন এবং মিসকীন তার ধনী প্রতিবেশীকে তার প্রাপ্ত সদকা হাদীয়া পেশ করে।-(মুয়াত্তা-ইমাম মালেক)

৬. অমুসলিমকে যাকাত দেয়াও জায়েয নয়।

৭. বনী হাশিমের বংশধরদের নিম্নের তিন গোত্রকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

(ক) হযরত আব্বাস (রা)-এর বংশধর।

(খ) হারেসের বংশধর।

(গ) আবু তালেবের বংশধর।

হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা)-এর সন্তানগণ উক্ত তৃতীয় গোত্রের।

অবশ্যি আজকাল এ যাঁচাই করা মুস্কিল যে, প্রকৃতপক্ষে বনী হাশিমের বংশধর কে। অতএব বায়তুলমাল থেকে তো প্রত্যেক অভাগ্রস্তের সাহায্য পাওয়া উচিত। তবে যদি কারো হাশেমী হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে তাহলে তার যাকাত নেয়া উচিত নয়।

ইমাম মালেক (র) বলেন, নবী (স) বলেন, সদকার মাল মুহাম্মদ (স)-এর আওলাদের জন্যে জায়েয নয়। এজন্যে যে, সদকা লোকের ময়লা তো বটে।-(মুয়াত্তা-ইমাম মালেক)

যাকাতের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. কাউকে আপনি টাকা কর্জ দিয়েছেন। কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। এখন যদি আপনি আপনার যাকাতের মধ্যে ঋণ কেটে নেন, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। কিন্তু যদি ঋণের পরিমাণ টাকা তাকে যাকাত দিয়ে দেন এবং তারপর তার কাছে তা আবার ঋণ হিসেবে আদায় করে নেন, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

২. ঘরে কাজ-কর্মের যেসব চাকর-চাকরানি, দাই প্রভৃতি থাকে তাদের কাজের পারিশ্রমিক ও বেতন হিসেবে তাদেরকে যাকাত থেকে দেয়া জায়েয হবে না।

৩. দুঃস্থ অভাবগ্রস্তদের কাপড় বানিয়ে দিতে, শীতের মওসুমে লেপ কম্বল বানিয়ে দিতে, বিয়ে শাদীতে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে যাকাত থেকে ব্যয় করা যেতে পারে।

৪. যে মেয়েলোক কোনো শিশুকে দুধ খাওয়ায়েছে সে যদি গরীব দুঃস্থ হয় তাহলে তাকে যাকাতের টাকা-পয়সা দেয়া যেতে পারে। সে শিশু বয়স্ক হওয়ার পর তার দুধ মাকে যাকাত দিতে পারে।

৫. একজনকে হকদার মনে করে যাকাত দেয়া হলো। তারপর জানা গেল যে সে সাহেবে নেসাব অথবা হাশেমী সাইয়েদ, অথবা অন্ধকারে যাকাত দেয়া হলো তারপর জানা গেল যে, সে আপন মা অথবা মেয়ে অথবা এমন কোনো আত্মীয় যাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়, তাহলে এ অবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্যি যে নেবে সে যদি হকদার না হয় তাহলে তার নেয়া উচিত নয় এবং নেয়ার পর তার ফেরত দেয়া উচিত।

৬. কাউকে হকদার মনে করে যাকাত দেয়ার পর জানা গেল যে, সে অমুসলিম, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় দিতে হবে।

৭. নোট, মুদ্রা, তেজারতি মাল—যা কিছুই সোনা চাঁদির নেসাবের পরিমাণ হবে তার যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন, কারো কাছে কিছু নোট আছে এবং বিভিন্ন মুদ্রা আছে সব মিলে ৪০০/- টাকা হচ্ছে অথবা এতো টাকার তেজারতি মাল আছে, তাহলে যদিও সোনার নেসাব পুরো হচ্ছে না, চাঁদির নেসাব পুরো হচ্ছে, তাহলেও সে ব্যক্তি সাহেবে নেসাব হয়ে যাবে এবং তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এজন্যে যে ৪০০/- টাকা ৩৬½ তোলা চাঁদির মূল্যের অধিক।[১]

৮. কেউ যদি পুরস্কার বা হাদীয়া হিসেবে এতো পরিমাণ অর্থ পায় যা নেসাবের পরিমাণ হয়, তাহলে এক বছর অতীত হলে তার যাকাত দিতে হবে।

---

১. মনে রাখা দরকার যে, সোনা এবং চাঁদির মূল্য বর্তমানে অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে (১৯৮৩) ৩৬½ তোলা চাঁদির মূল্য প্রায় তিন হাজার টাকা। তাছাড়া নেসাব সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে ৫২½ তোলা চাঁদি এবং ৭½ ভরি সোনা যাকাতের নেসাব। যাই হোক, সোনা ও চাঁদির বাজার দরের ওপরই যাকাতের নেসাব ঠিক হবে।—অনুবাদক

৯. ব্যাংকে রাখা আমানতের ওপর যাকাত ওয়াজিব।

১০. এক ব্যক্তি সারা বছর বিভিন্নভাবে সদকা খয়রাত করতে থাকলো কিন্তু যাকাতের নিয়ত করলো না। তাহলে বছর শেষ হওয়ার পর ঐসব খয়রাত করা মাল যাকাতের হিসেবে ধরা যাবে না। এজন্যে যাকাত বের করার সময় যাকাতের নিয়ত করা শর্ত।

১১. যাকাতের টাকা মানি অর্ডার করে পাঠানো যায় এবং মানি অর্ডার ফিস যাকাত থেকে দেয়া জায়েয।

ওশরের বিবরণ

ওশরের অর্থ

ওশরের আভিধানিক অর্থ এক-দশমাংশ। কিন্তু পরিভাষায় ওশর হচ্ছে উৎপন্ন ফসলের যাকাত যা কোনো জমির উৎপন্নের দশ ভাগের এক ভাগ এবং কোনো জমির বিশ ভাগের এক ভাগ।

ওশরের শরয়ী হুকুম

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের রোযগারের উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর এবং তার মধ্য থেকেও যা তোমাদের জন্যে আমি যমীন থেকে বের করেছি (উৎপন্ন করেছি)।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

অন্য স্থানে বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ز -(الانعام ١٤١)

"এবং আল্লাহর হক আদায় কর যেদিন তোমরা ফসল কাটবে।"-(সূরা আল আনআম ঃ ১৪১)

তাফসীরকারগণের এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে যে, এর অর্থ হলো উৎপন্ন ফসলের যাকাত অর্থাৎ ওশর।

কুরআন পাকের উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ ফরয এবং হাদীসেও এ সম্পর্কে তাকীদ রয়েছে। নবী (স) বলেন ঃ

"যে জমি বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার বা নদী-নালার পানিতে প্লাবিত হয় অথবা নদীর কিনারে হওয়ার কারণে স্বভাবতই উর্বর ও পানি সিক্ত থাকে, তার থেকে উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ ওশর বের করা ওয়াজিব। আর যে জমিতে কূপের পানি তুলে চাষ করা হয় তার বিশ ভাগের একভাগ ওয়াজিব।"

ওশরের হার

বর্ষা, নদী-নালার পানিতে যে জমির ফসল উৎপন্ন হয়, অথবা নদীর কিনারায় হওয়ার কারণে যে জমিতে স্বভাবতই উর্বরতা ও পানি থাকে সে জমির উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ যাকাত হিসেবে বের করা ওয়াজিব। আর

বিভিন্ন উপায়ে সেচ কার্যের দ্বারা যে জমির ফসল উৎপন্ন হয় তার বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে বের করা ওয়াজিব।

ওশর (ফসলের যাকাত) আল্লাহর হক এবং তা মোট উৎপন্ন ফসলের প্রকৃত এক-দশমাংশ অথবা এক-বিশাংশ। অতএব শষ্য অথবা ফল ব্যবহারযোগ্য হলে প্রথমে তার ওশর বের করতে হবে তারপর সে শস্য বা ফল ব্যবহার করা হবে।

ওশর বের করার আগে তা ব্যবহার করা জায়েয নয় নতুবা এক-দশমাংশ হোক অথবা তার অর্ধেক তা আল্লাহর পথে যাবে না।

কোন্ কোন্ জিনিসের ওশর ওয়াজিব

জমি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেক বস্তুর ওপর ওশর ওয়াজিব। যা গুদামজাত করা হয় এমন ফসলের ওপরও, যেমন খাদ্যশস্য, সরিষা, তিল, বাদাম, আখ, খেজুর, শুকনো ফল প্রভৃতি এবং ঐসব ফসলের ওপরেও যা গুদামজাত করা যায় না, যেমন শাকসবজি, শশা, খিরা, গাজর, মূলা, সালগম, তরমুজ, লেবু, পেয়ারা, আম, মালটা প্রভৃতি।[১]

মধুর ওপরেও ওশর ওয়াজিব। নবী (স) বলেন ঃ ادوا العشر فى العسل 'মধুর ওশর দাও।-(বায়হাকী)

হযরত আবু সাইয়াদাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলেছিলাম আমার কাছে মৌমাছি পালিত আছে। তখন নবী (স) বলেন, তাহলে তার ওশর দাও।[২]

---

১. কোনো কোনো ফকীহর মতে শাক-সবজি, তরি-তরকারী, ফলমূল যা গুদামজাত করা যায় না তার ওপর ওশর ওয়াজিব নয়। তবে যদি কৃষক বাজারে বিক্রি করে তাহলে তার উপর তেজারতি যাকাত ওয়াজিব হবে তার মূল্য নেসাব পরিমাণ হলে। অর্থাৎ যদি বছরের প্রথমে এবং শেষে তেজারতি মাল দু'শ দিরহাম অথবা অধিক হয়।

২. ইমাম মালেক (র) এবং হযরত সুফিয়ান সওরী (র)-এর নিকট মধুর ওশর নেই। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মশহুর বক্তব্যও তাই। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মধুর যাকাতের ব্যাপারে কোনো হাদীস সহীহ নয়। বায়হাকীতে আছে, এক ব্যক্তি নবীর দরবারে মধুর ওশর এনে আরজ করে, সাবলা বনের হেফাযতের ব্যবস্থা করুন। নবী (স) সে বনের হেফাযতের ব্যবস্থা করে দেন। তারপর হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে সুফিয়ান বিন ওয়াহাব এ ব্যাপারে তার কাছে প্রকৃত সত্য জানতে চাইলেন, তিনি তাকে লিখে জানালেন যে, সে নবীকে যা দিতো তা তোমাকে দিতে এলে নিয়ে নেবে এবং সাবলা বনের হেফাজতের ব্যবস্থা করে দেবে। নতুবা তা তো মৌমাছি দ্বারা তৈরী জিনিস আসমানের পানির মতো। যে ইচ্ছা করে সে তা ব্যবহার করতে পারে।

আল্লামা মওদূদীর অভিমত এই যে, মধুর ওপরে যাকাত নেই। তবে তার ব্যবসার ওপরে সেই ধরনের যাকাত হবে যা অন্যান্য তেজারতি মালের ওপর হয়ে থাকে।

ওশরের মাসয়ালা

১. ওশর মোট উৎপন্ন ফসলের আদায় করতে হবে। ওশর আদায়ের পর অবশিষ্ট ফসল থেকে কৃষির যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে। যেমন কারো জমিতে ত্রিশ মণ ফসল হলো। এক-দশমাংশ তিন মণ ওশর দেয়ার পর বাকী সাতাশ মণ থেকে কৃষির খরচপত্র বহন করতে হবে।

২. ফসল যখনই ব্যবহারযোগ্য হবে তখনই তার ওপর ওশর ওয়াজিব হবে। যেমন–ছোলা, মটর, আম প্রভৃতির পাকার পূর্বেই ব্যবহার হতে তাকে। অতএব তখন যে পরিমাণ হবে তার ওশর বের করতে হবে। ওশর বের করার পূর্বে তা ব্যবহার করা দুরস্ত নয়।

৩. কারো বাগানে ফল হয়েছে। তা পাকার পূর্বে বিক্রি করলে ওশর খরিদদারের ওপর ওয়াজিব হবে। পাকার পর বিক্রি করলে ওশর বিক্রেতার ঘাড়ে পড়বে।

৪. জমিতে যে চাষ করবে ওশর তার ওপরেই ওয়াজিব হবে তা সে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করুক অথবা বর্গা নিয়ে চাষ করুক।

৫. দু'জনে মিলে চাষাবাদ করলে ওশর উভয়ের ওপর ওয়াজিব হবে তা যদি বীজ একজনের হয় তবুও।

৬. ওশর ফরয হওয়ার জন্যে নেসাব কোনো শর্ত নয়।১ ফসল কম হোক বেশী হোক ওশর দিতে হবে। অবশ্যি দু আড়াই কিলো পরিমাণ ফসল ধর্তব্যের নয়।

৭. ওশরে বছর পূর্ণ হওয়ার প্রশ্নও নেই। বরঞ্চ যে জমিতে বছরে দু ফসল হয়, তার প্রত্যেক ফসলের ওশর দিতে হবে।

৮. নাবালেগ শিশু ও মাথা খারাপ লোকের ফসলেরও ওশর ওয়াজিব।

৯. ওয়াকফ্ করা জমি চাষ করলে চাষীর ওপর ওশর ওয়াজিব হবে।

---

১. ইমাম আযম ও ইমাম শাফেয়ীর মতে পাঁচ ওয়াসাক (ত্রিশ মণ)-এর কম হলে তার ওশর নেই। আহলে হাদীসের অভিমতও তাই। ওশর ফরয হওয়ার এ একটি শর্ত যে, উৎপন্ন ফসল অন্তত পাঁচ ওয়াসাক বা ত্রিশ মণ হবে। তার প্রমাণ নিম্ন হাদীস ঃ

لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة ـ(بخاری)

"পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।"–(বুখারী)

১০. বৃষ্টির পানিতে উর্বর জমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচ কার্য করলে তার ওশর নির্ধারণে–এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্বাভাবিক বর্ষণের কারণে সে জমি অধিক উর্বরতা লাভ করেছে, না সেচের কারণে।

১১. ওশর ফসলের আকারেও দেয়া যায় অথবা তার মূল্য।

১২. বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে যেসব জমি মুসলমানদের মালিকানায় আছে, তা ওশরী এবং তার ওশর দিতে হবে।

১৩. জমির খাজনা দিলে ওশর মাফ হয় না।

১৪. যাকাত যেসব খাতে ব্যয় করা হয়, ওশরও সেসব খাতে ব্যয় করতে হবে।

গুপ্তধন ও খনিজ দ্রব্যাদির মাসয়ালা

মাটির নীচে রক্ষিত সম্পদ ও খনিজ দ্রব্যাদির মাসয়ালা নিম্নরূপ ঃ

১. মাটির নীচে রক্ষিত প্রাপ্ত সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালের জন্য নির্দিষ্ট। হাদীসে আছে فى الركاز الخمس অর্থাৎ গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশও বায়তুল মালে দেয়া ওয়াজিব।

২. খনিজ দ্রব্য তা ধাতব পদার্থ হোক যেমন লোহা, রূপা, সোনা, রাং ইত্যাদি; অথবা অধাতব পদার্থ যেমন গন্ধক, এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালের অংশ। আর বাকী চার ভাগ খনির মালিক পাবে।

৩. যেসব খনিজ দ্রব্য আগুনে পোড়ালে নরম হয় না যেমন জাওহার ইত্যাদি অথবা তরল পদার্থ যেমন কেরোসিন ও পেট্রোল ইত্যাদি। এসব দ্রব্যে বায়তুলমালের কোনো অংশ নেই।[১]

সদকায়ে ফিতরের বয়ান

সদকায়ে ফিতরের অর্থ

ফিতরের আভিধানিক অর্থ রোযা খোলা। সদকায়ে ফিতরের অর্থ রোযা খোলার সদকা। পারিভাষিক অর্থে সদকায়ে ফিতর বলতে বুঝায় সেই ওয়াজিব সদকা যা রমযান খতম হওয়ার এবং রোযা খোলার পর দেয়া হয় যে বছর মুসলমানদের ওপর রমযানের রোযা ফরয করা হয় সে বছরই নবী (স) সদকায়ে ফিতর আদায় করার হুকুম দেন।

---

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-এর মতে খনিজ পদার্থ ধাতব, অধাতব বা তরল যা-ই হোক না কেন শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত ওয়াজিব যদি তা নেসাব পরিমাণ হয় এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন হয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়ে এ মতে আমল করা হতো।

সদকায়ে ফিতরের তাৎপর্য ও উপকারিতা

রমযান মাসে রোযাদারগণ তাঁদের সাধ্যানুযায়ী এ চেষ্টা করেন যাতে করে তাঁরা রমযানের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন এবং ঐসব সীমারেখা, নিয়ম পদ্ধতি ও শর্তাবলীর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন যা মেনে চলার জন্যে শরীয়াতে তাকীদ করা হয়েছে। তথাপি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মানুষের অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়। সদকায়ে ফিতরের একটি তাৎপর্য এই যে, মানুষ আল্লাহর পথে আগ্রহ সহকারে তার অর্জিত মাল খরচ করবে যাতে করে তার ক্রটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হয় এবং আল্লাহর দরবারে রোযা কবুল হয়। উপরন্তু ঈদ উপলক্ষ্যে সদকায়ে ফিতর দেয়ার একটা তাৎপর্য এটাও যে, সমাজের গরীব-দুস্থ লোক যেন নিশ্চিন্তে এবং ভালোভাবে অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং অন্যান্য মুসলমানদের সাথে ঈদগাহে উপস্থিত হতে পারে যাতে করে ঈদগাহের সম্মেলন বিরাট হয় এবং পথে মুসলমানদের বিপুল জনসমাগমের কারণে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তির প্রকাশ ঘটে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) সদকায়ে ফিতর এজন্য নির্ধারিত করেছেন যে, এ ফিতরা রোযাদারদেরকে বেহুদা কাজ-কর্ম এবং অশ্লীলতার ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে পাক করবে এবং সে সাথে অভাবগ্রস্তদের খানা-পিনার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। অতএব যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর পরিশোধ করবে তার সে সদকা কবুল হবে এবং যে নামাযের পরে পরিশোধ করবে তা সাধারণ দান খয়রাতের মতো একটি সদকা হবে।-(আবু দাউদ)

শাহ্ অলী উল্লাহ্ (র) বলেন, ঈদের দিন খুশীর দিন। এদিনে মুসলমানদের বিরাট জনসমাবেশের মাধ্যমে ইসলামের শান-শওকত প্রকাশ পায় এবং সদকায় ফিতরের দ্বারা এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। তাছাড়া সদকায়ে ফিতর রোযার পূর্ণতারও কারণ হয়।-(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্)

সদকায়ে ফিতরের হুকুম

সদকায়ে ফিতর এমন প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমান নারী-পুরুষ, নাবালক সাবালকের ওপর ওয়াজিব[১] যার কাছে তার প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতো

১. আহলে হাদীসের মতে সদকায়ে ফিতর যাকাতের মতো ফরয। অতএব প্রত্যেক ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, আযাদ-গোলাম, ছোট-বড়, সকলের ওপর ফরয। তাঁদের যুক্তি এই যে, নবী (স) মক্কার অলিতে গলিতে লোক পাঠিয়ে এ ঘোষণা করিয়ে দেন—সাবধান থাক। সদকায়ে ফিতর প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষ, আযাদ গোলাম, ছোট-বড় সকলের ওপর ওয়াজিব-(তিরমিযি)। উপরন্তু ইবনে ওমর (রা) বলেন, নবী (স) সদকায়ে ফিতর ফরয বলেছেন এবং তাহলো প্রত্যেক নারী-পুরুষ, আযাদ গোলাম, ছোট ও বড়োর জন্যে এক সা খেজুর, এক সা যব এবং হুকুম দিয়েছেন যে, ঈদগাহে যাবার পূর্বে তা দিতে হবে।

মূল্যের মাল হবে যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। সে মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব হোক বা না হোক। যেমন ধরুন, কারো কাছে তার বসবাসের গৃহ ছাড়া আরও বাড়ী-ঘর আছে যা খালি পড়ে আছে অথবা ভাড়ার জন্যে তৈরী করা হয়েছে। যদি সে ঘর-বাড়ীর মূল্য নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার মালিকের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে যদিও সে বাড়ীর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে যদি বাড়ীর ভাড়ার দ্বারা সে জীবিকা অর্জন করে তাহলে তা তার প্রকৃত প্রয়োজনের মধ্যে শামিল হবে এবং তার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না অথবা কারো ঘরে ব্যবহারের সামগ্রি ছাড়াও কিছু আসবাবপত্র আছে যেমন ঃ তামার বাসনপত্র, মূল্যবান ফার্নিচার প্রভৃতি যার মূল্য নেসাবের পরিমাণ অথবা তার অধিক, তাহলে তার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। যদিও সে সব মালের যাকাত দিতে হবে না।

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ওপরে বর্ণিত নেসাব ছাড়া অন্য কোনো শর্ত নেই। না আযাদী কোনো শর্ত, আর নাবালেগ হওয়া অথবা হুঁশ জ্ঞান থাকা। গোলামের ওপরও ওয়াজিব। কিন্তু তার মনিব তা দিয়ে দিবে। নাবালেগ ও পাগল ছেলেমেয়েদের ফিতরা তার বাপ-মা অথবা ওলী দিয়ে দেবে।

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে এটাও শর্ত নয় যে, মাল এক বছর স্থায়ী হতে হবে। বরঞ্চ সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বেও যদি কেউ ধন-দৌলতের মালিক হয়, তাহলে তার ওপরও সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় ঈদের দিনের প্রভাতকাল।[১] অতএব যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে মারা যায় অথবা ধন-দৌলত থেকে বঞ্চিত হয় তার ওপর ওয়াজেব হবে না। যে শিশু ফজরের পর জন্মগ্রহণ করবে তার ওপরও ওয়াজিব হবে না। তবে যে ঈদের রাতে জন্মগ্রহণ করবে তার ওপর ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যে ফজরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ধনের মালিক হয়—তাহলে তার ওপর সদকাদয়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।

সদকায়ে ফিতর পরিশোধ করার সময়

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় যদিও ফজরের সময় কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এটাই দাবী করে যে, ঈদের কিছু দিন পূর্বে তা

১. আহলে হাদীসের নিকটে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় রমযানের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর থেকে ঈদের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। একে বলা হয় রোযা খোলার সদকা। অতএব রমযানের শেষ রোযা খোলার পর থেকেই এ ওয়াজিব হয় যদিও তা আগেও দিয়ে দেয়া দুরস্ত আছে।

অভাবগ্রস্তদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হোক। যাতে করে গরীব দুস্থ অন্ন-বস্ত্রের সামগ্রি নিশ্চিন্তে লাভ করে সকলের সাথে ঈদগাহে যেতে পারে। বুখারী শরীফে আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) দু' একদিন পূর্বেই সদকায়ে ফিতর বিতরণ করতেন। দু' চার দিন পূর্বে দেয়া না গেলে ঈদের নামাযের পূর্বে অবশ্যই দিয়ে দেয়া উচিত। নবী (স) বলেন ঃ

فمن اداها قبل الصلوة فهى زكوة مقبولة ومن اداها بعد الصلوة فهى صدقة من الصدقات-

"যে ব্যক্তি সদকায়ে ফিতর নামাযের পূর্বে দিয়ে দেবে তাহলে সেটা হবে আল্লাহর নিকটে গৃহীত সদকা। আর যে নামাযের পরে দেবে, তার সদকা হবে দান খয়রাতের মতো একটি সদকা।"

কাদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব

১. সচ্ছল ব্যক্তি তার নিজের ছাড়াও নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর দিয়ে দেবে। নাবালেগ সন্তান যদি ধববান হয় তাহলে তাদের ধন থেকে নতুবা নিজের পক্ষ থেকে দেবে।

২. যেসব সন্তান হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে তাদের মাল থাক আর না থাক, তাদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর দিয়ে দেয়া ওয়াজিব, তারা সাবালক হোক বা না হোক।

৩. যারা তাদের খাদেম বা চাকর বাকরের পৃষ্ঠপোষকতা ও ভরণ-পোষণ করে তারা তাদের পক্ষ থেকে সদকা দিয়ে দেবে।

৪. সাবালক সন্তানদের পক্ষ থেকে পিতার দেয়া ওয়াজিব যদি তারা দুঃস্থ ও দরিদ্র হয়। মালদার হলে ওয়াজিব হবে না।

৫. বিবির পক্ষ থেকে ওয়াজিব তো নয়। তবে স্বামী দিয়ে দিলে বিবির পক্ষ থেকে হয়ে যাবে।

৬. বাপ মারা গেলে দাদার উপরে সকল দায়িত্ব এসে পড়ে যা পিতার ছিল।

৭. স্ত্রীলোক যদি সচ্ছল হয় তাহলে শুধু তার সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। তার নিজের ছাড়া স্বামী, সন্তান বা মা-বাপের পক্ষ থেকে দেয়া তার ওয়াজিব নয়।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ আশি তোলা সেরের হিসেবে এক সের তিন ছটাক গমের আটা।[১] যব বা যবের আটা, অথবা খুরমা, মুনাক্কা দিতে হলে গমের দ্বিগুণ দিতে হবে।[২]

সদকায়ে ফিতরের বিভিন্ন মাসায়েল

১. যে ব্যক্তি কোনো কারণে রমযানের রোযা রাখতে পারেনি, তারও সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব। সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে রোযা শর্ত নয়।

২. সদকায়ে ফিতর খাদ্য শস্যের আকারেও দেয়া যায়, তার মূল্যও দেয়া যায়। দেয়ার সময় ফকীর মিসকীনদের সুবিধা বিবেচনা করে খাদ্য শস্য বা মূল্য দেয়া উচিত।

৩. গমের পরিবর্তে অন্য কিছু যেমন জোয়ার, বাজরা, ছোলা, মটর প্রভৃতি দেয়ার ইচ্ছা থাকলে গম অথবা যবের মূল্যে পরিমাণ হওয়া উচিত।

৪. একজনের সদকায়ে ফিতর একজন ফকীরকেও দেয়া যায় এবং কয়েকজনকেও দেয়া যায়। তেমনি কয়েকজনের ফিতরা একজনকেও দেয়া যায় এবং কয়েকজনকেও দেয়া যায়।

৫. কারো কাছে কিছু গম এবং কিছু যব আছে। তাহলে হিসেব করে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ পূর্ণ করে দেবে।

৬. প্রয়োজন হলে ফিতরা অন্যস্থানেও পাঠানো যায়। তবে ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া অন্যত্র না পাঠানো উচিত।

৭. সদকায়ে ফিতরের ব্যয়ের খাতও তাই, যা যাকাতের।

---

১. মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মতে–একজনের সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ এক সের সাড়ে বার ছটাক। সাবধানতার জন্যে দু' সের দেয়া ভালো।

২. নবী (স)-এর যুগে সম্ভবত যব এবং খুরমা মুনাক্কার মূল্য সমান ছিল।

كِتَابُ الصَّوْمُ

রোযার অধ্যায়

রোযার বিবরণ

রমযানের রোযা ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কুরআনে শুধু রোযা রাখার হুকুমই দেয়া হয়নি, বরঞ্চ রোযার নিয়ম-পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে। রমযানের মহত্ব ও বরকত সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। যে মাসের রোযা শরীয়াত ফরয করেছে তার ফযিলত ও বরকত প্রথমে আমরা বর্ণনা করবো।

রমযানুল মুবারকের ফযীলত

কুরআনে রমযানের মহত্ব ও ফযীলত

কুরআন পাকে রযমানের মহত্ব ও ফযীলতের তিনটি কারণ বলা হয়েছে ঃ

১. কুরআন নাযিল হওয়া। অর্থাৎ এ মাসে কুরআন নাযিল হয়।

২. লায়লাতুল কদর। অর্থাৎ এ মাসে এমন এক রাত আছে যা মংগল ও বরকতের দিক দিয়ে এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

৩. রোযা ফরয হওয়া। অর্থাৎ এ মাসে মুসলমানদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে।

এসব ফযীলতের জন্যে নবী (স) এ মাসকে شهر الله বা আল্লাহর মাস বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ মাসকে সকল মাস থেকে উৎকৃষ্টতম বলেছেন। নিম্নে তার কিছু সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দেয়া হলো ঃ

রমযানের ফযীলতের কারণ

১. কুরআন নাযিল হওয়া ঃ কুরআন বলে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج ـ(البقرة ١٨٥)

"রযমান এমন এক মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে—যা সমগ্র মানবজাতির জন্যে হেদায়াত স্বরূপ, যা সত্য পথ প্রদর্শনকারী, সুস্পষ্ট শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং হক ও বাতিলকে সুস্পষ্ট করে উপস্থাপনকারী।" –(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

রমযানের মহত্ব ও ফযীলত বুঝাবার জন্যে একথাই কি যথেষ্ট নয় যে, তার মধ্যে আল্লাহর হেদায়াতের সর্বশেষ কেতাব নাযিল করা হয়েছে ? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানবতা যদি হেদায়াতের উৎস থেকে বঞ্চিত হতো তাহলে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্বের এ বিরাট কারখানাটি সূর্যের আলো ও চাঁদ তারার শুভ্র রোশনী সত্ত্বেও লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো, বিশ্বপ্রকৃতি তার সুনিপুণ কারুকার্য ও সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও অর্থহীন অপূর্ণ ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়তো। ফলে কুফর, নাস্তিকতা শিরক ও পাপাচারে পথভ্রষ্ট মানুষ বনের হিংস্র পশুর চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়ে পড়তো। কুরআন এ পৃথিবীতে হেদায়াত ও আলোকের একমাত্র উৎস। এর থেকে যে বঞ্চিত সে হেদায়াত ও কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত।

২. লায়লাতুল কদর ঃ কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, তা রমযান মাসে শামিল করা হয়েছে এবং তা লায়লাতুল কদরেই নাযিল করা হয়েছে। তার অনিবার্য অর্থ এই যে, 'লায়লাতুল কদর' রমযানেরই কোনো একটি রাত যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ "রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে লায়লাতুল কদর তালাশ কর।"—(বুখারী)

৩. রোযা ফরয হওয়া ঃ রোযার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এ মাসকে নির্ধারিত করেছেন এবং গোটা মাসের রোযা মুসলমানদের জন্যে ফরয করে দিয়েছেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

"অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে তার জন্যে অপরিহার্য যে, সে পুরো মাসে রোযা রাখবে।"

রমযানের মহত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে হাদীস

নবী (স) রমযানের মহত্ব ও ফযীলত বয়ান করতে গিয়ে বলেন, যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জ্বিনগুলোকে শৃংখল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং দোযখের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তার কোনো একটি দরজাও খোলা রাখা হয় না। জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়। তার কোনো একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। তারপর আল্লাহর একজন আহ্বানকারী বলতে থাকে, যারা মংগল ও কল্যাণ চাও তারা সামনে অগ্রসর হও। যারা বদকাম পাপাচার করতে চাও, তারা থাম। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক না-ফরমান বান্দাহকে দোযখ থেকে রেহাই দেয়া হয়। আর এ কাজ রমযানের প্রত্যেক রাতেই করা হয়।—(তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

০ এ এমন একটি মাস যে মাসে মু'মিনদের রুযি বৃদ্ধি করা হয়।-(মিশকাত)

০ রমযান সকল মাসের সরদার।-(ইলমুল ফেকাহ)

০ এ মাসের প্রথম অংশ রহমত, দ্বিতীয় অংশ মাগফেরাত, তৃতীয় এবং শেষ অংশ জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই ও মুক্তি।-(মিশকাত)

০ এ মাসে যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে আপন ইচ্ছায় কোনো নফল নেকী করবে সে অন্যান্য মাসের ফরয ইবাদাতের সমান সওয়াব পাবে। আর যে একটি ফরয আদায় করবে সে অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরযের সমান সওয়াবের হকদার হবে।-(মিশকাত)

ইতিহাসে রমযানের মহত্ব ও গুরুত্ব

ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, হক ও বাতিলের প্রথম সিদ্ধান্তকর যুদ্ধ (বদর) এ মাসে হয়েছিল এবং হককে বাতিল থেকে আলাদা করে দেয়ার যে দিনকে কুরআনে 'ইয়াওমুল ফোরকান' বলা হয়েছে তা ছিল এ মাসেরই একটি দিন। এ দিনেই হকের প্রথম বিজয় সূচিত হয় এবং বাতিল পরাজিত হয়। ইতিহাস একথাও বলে যে, এ মাসেই মক্কা বিজয় হয়। এসব তথ্য সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করুন—তাহলে উপলব্ধি করবেন–

০ হকের হেদায়াত এ মাসেই নাযিল হয়।

০ ইসলামের প্রাথমিক বিজয় এ মাসেই হয়।

০ ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয় এ মাসেই হয়।

এসব সত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে রমযান প্রতি বছর আসে। শরীয়াত এ মাসে রোযা ফরয করেছে, রাতের নামায ও তেলাওয়াতে কুরআনের ব্যবস্থা করেছে যাতে করে মু'মিনের মধ্যে জেহাদের প্রাণশক্তি নিষ্প্রাণ না হয়ে পড়ে এবং বছরে অন্তত একবার রমযান মাসে কুরআন শুনে বা পড়ে আপন পদমর্যাদা ও দায়িত্বপূর্ণ অনুভূতি সহকারে মনের মধ্যে তরজমা করতে পারে। কুরআনের নাযিল হওয়া, তার অধ্যয়ন এবং রোযার মুজাহিদ সুলভ তরবিয়ত এ জন্যে যে, ইসলামের সন্তানগণ দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই জীবিত রয়েছে এবং কখনো যেন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে গাফেল না হয়।

রোযার অর্থ

(ক আরবী ভাষায় সাওম বা সিয়াম বলে। তার অর্থ কোনো কিছু থেকে ত থাকা এবং তা পরিত্যাগ করা। শরীয়াতের পরিভাষায় সাওমের আ–ঃ

অর্থ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা ও যৌন ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকা।

রোযা ফরয হওয়ার হুকুম

হিজরতের দেড় বছর পর রমযানের রোযা মুসলমানদের ওপর ফরয করা হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ-(البقرة : ١٨٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো।" রোযা ফরযে আইন। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফের এবং বিনা ওযরে যে রাখবে না সে ফাসেক ও কঠিন গোনাহগার।

রোযার গুরুত্ব

কুরআন এ সাক্ষ্য দেয় যে, সকল আসমানী শরীয়াতের অধীন রোযা ফরয ছিল এবং প্রত্যেক উম্মতের ইবাদাতের মধ্যে তা ছিল একটা অপরিহার্য অংশ।

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ-(البقرة : ١٨٣)

"যেমন রোযা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপরে।"

এ আয়াত শুধু একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার জন্যে নয়, বরঞ্চ এ গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি তুলে ধরার জন্যে যে, মানুষের প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধির সাথে রোযার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাযকিয়ায়ে নফসে তার একটা স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। বরঞ্চ এমন মনে হয় যে, তরবিয়ত ও তাযকিয়ার প্রক্রিয়া ছাড়া তা পূর্ণই হতে পারে না। অন্য কোনো ইবাদাত তার বিকল্প হতেই পারে না। এজন্যেই রোযা সকল নবীগণের শরীয়াতে ফরয ছিল।

রোযার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে নবী (স) বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো শরয়ী ওযর অথবা রোগ ছাড়া রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দেবে সে যদি সারা জীবন ধরে রোযা রাখে তবুও তার ক্ষতি পূরণ হবে না।"

–(আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ)

অর্থাৎ রমযানের রোযার মহত্ব, কল্যাণ, বরকত ও গুরুত্ব এই যে, যদি কোনো উদাসীন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো রোযা নষ্ট করে বা না রাখে, তার ফলে তার যে ক্ষতি হলো তা জীবনব্যাপী রোযা রাখলেও তার ক্ষতি পূরণ হবে না, তবে তার আইনগত কাযা হতে পারে।

রোযার উদ্দেশ্য

রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া পয়দা করা ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "যাতে করে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হতে পারে।" তাকওয়া আসলে এমন এক সম্পদ যা আল্লাহর মহব্বত ও ভয় থেকে পয়দা হয়। আল্লাহর সত্তার ওপর ঈমান, তার গুণাবলী দয়া অনুগ্রহের গভীর অনুভূতি থেকে মহব্বতের প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং তার অন্য গুণ-রাগ, ক্ষোভ ও শাস্তিদানের ক্ষমতার ধারণা বিশ্বাস থেকে ভয়ের অনুভূতি জাগ্রত হয়। মহব্বত ও ভয়ের এ মানসিক অবস্থার নাম তাকওয়া যা সকল নেক কাজের উৎস এবং সকল পাপ কাজ থেকে বাঁচার সত্যিকার উপায়।

রোযা আল্লাহর সত্তার ওপরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তার অনুগ্রহ ও অসন্তোষের গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করে। সারাদিন ক্রমাগত কয়েক ঘন্টা ধরে প্রবৃত্তির একেবারে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় দাবী পূরণ থেকে বিরত থাকার কারণে মানুষের ওপর এ প্রভাব পড়ে যে, সে চরম অক্ষম, অসহায় ও মুখাপেক্ষী হয়। সে জীবনের প্রতি মুহূর্তের জন্যে আল্লাহর রহম ও করমের ভিখারী হয়। তারপর সে যখন তার জীবনকে আল্লাহর নিয়ামতে সমৃদ্ধ দেখতে পায়, তখন সে আল্লাহর মহব্বতের আবেগ উচ্ছাসে উদ্বুদ্ধ হয় এবং আন্তরিক আগ্রহ সহকারে আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীতে তৎপর হয়। তখন সে নিভৃতে তার প্রবল যৌন বাসনাকে সংযত করে রাখে যেখানে আল্লাহ ছাড়া দেখার কেউ থাকে না তখন তার মনে আল্লাহর ভয় তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ফলে তার মনের ওপর আল্লাহর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের এমন ছাপ পড়ে যে গোনাহের চিন্তা করতেও তার শরীর কেঁপে ওঠে।

প্রকৃত রোযা

রোযার এ মহান উদ্দেশ্য তখনই হাসিল করা যেতে পারে, যখন রোযা পূর্ণ অনুভূতির সাথে রাখা হয় এবং ঐ নিষিদ্ধ কাজ থেকে রোযাকে রক্ষা করা হয় যার প্রভাবে রোযা প্রাণ হীন হয়ে পড়ে। প্রকৃত রোযা তো তাই যার সাহায্যে মানুষ তার মন মস্তিষ্ক ও সকল যোগ্যতাকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পদদলিত করবে। নবী (স) বলেন ঃ

"তুমি যখন রোযা রাখবে তখন তোমার কর্তব্য হবে তোমার কান, চোখ, মুখ, হাত, পা এবং সকল অংগ-প্রত্যংগকে আল্লাহর অপসন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা।"-(কাশফুল মাহজুব)

নবী (স) আরও বলেন ঃ

০ যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত হলো না, তার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন ছিল না।-(বুখারী)

০ এমন বহু রোযাদার আছে যে, রোযায় ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ করা ছাড়া তাদের নেকীর পাল্লায় আর কিছু পড়ে না।-(মিশকাত)

রোযার ফযীলত

নবী (স) বলেন, প্রত্যেক নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। কিন্তু আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে, রোযার ব্যাপারটাই অন্য রকম। তাতো আমার জন্যে নির্দিষ্ট। আমি স্বয়ং তার প্রতিদান দেব। বান্দাহ আমার জন্যে তার যৌনবাসনা ও খানা-পিনা বন্ধ রাখে। রোযাদারের জন্যে দুটি আনন্দ, একটা হচ্ছে ইফতারের সময় যখন সে এ আবেগ উল্লাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহর নিয়ামত উপভোগ করতে থাকে যে, আল্লাহ্ তাকে একটা ফরয আদায় করার তাওফীক দান করেছেন।

দ্বিতীয় আনন্দ আপন পরওয়ারদেগারের সাথে মিলিত হওয়ার যখন সে আল্লাহর দরবারে সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করবে এবং দীদার লাভ করে চক্ষু শীতল করবে।

রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকেও উৎকৃষ্টতর। রোযা গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ঢাল স্বরূপ। তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখলে সে যেনো অশ্লীল কথাবার্তা ও হৈ হাংগামা থেকে দূরে থাকে। যদি কেউ গালিগালাজ করতে থাকে অথবা ঝগড়া করতে আসে, তাহলে তার মনে করা উচিত যে, সে রোযা আছে।-(বুখারী, মুসলিম)

নবী (স) আরও বলেন, যে ঈমানের অনুভূতি এবং আখেরাতে সওয়াবের আশায় রোযা রাখে তার পূর্বের সব গোনাহ্ (সগীরা) মাফ করে দেয়া হয়।-(বুখারী, মুসলিম)

রুইয়েতে হেলাল বা চাঁদ দেখার নির্দেশাবলী

১. শাবানের উনত্রিশ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখার চেষ্টা করা মুসলমানদের ওয়াজিবে কেফায়া।[১] পঞ্জিকা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে রোযা রাখা এবং

---

১. সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব যে, রমযানের চাঁদ দেখার ব্যবস্থা তারা করবে। গোটা সমাজ যদি এর গুরুত্ব অনুভব না করে এবং বিষয়টিকে অবহেলা করে তাহলে সকলেই গোনাহগার হবে।

চাঁদ দেখা থেকে বেপরোয়া হওয়া কিছুতেই জায়েয নয়। এমনকি যারা গণনা শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং নেক ও পরহেযগার, তাদেরও নিজের হিসেবের ওপর আমল করা জায়েয নয়। নবী (স) বলেন, চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা খতম কর। যদি ২৯ শাবান চাঁদ দেখা না যায় তাহলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।[১]

২. কোনো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাঁদ দেখা মেনে নেয়া এবং তদনুযায়ী রোযা রাখা জায়েয নয়। যেমন একটা প্রবাদ আছে–যেদিনটি রজব মাসের ৪ঠা, সে দিনটি রমযানের পয়লা এবং বারবার এটা পরীক্ষা করা হয়েছে।

৩. রজবের উনত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। কারণ রমযানের পয়লা তারিখ জানার জন্যে শাবানের তারিখগুলো জানা জরুরী। যেমন মনে করুন ২৯শে রজব চাঁদ উদয় হলো। কিন্তু লোকে তা দেখার কোনো ব্যবস্থা করেনি। তারপর ১লা শাবানকে ৩০শে রজব মনে করে হিসেব করতে থাকলো। এভাবে ৩০শে শাবান এসে গেল। কিন্তু আকাশে মেঘ অথবা ধূলাবালীর কারণে চাঁদ দেখা গেল না। যেহেতু তা শাবানের ২৯ তারিখ মনে করা হচ্ছিল। এ জন্যে ১লা রমযানকে লোক ৩০শে শাবান মনে করে বসলো এর ফলে অবহেলার কারণে রমযানের একটা রোযা নষ্ট হয়ে গেল।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) শাবান মাসের দিনগুলো ও তারিখগুলো যেমন চিন্তা-ভাবনা ও হিসেব করে মনে রাখতেন, অন্য কোনো মাসের তারিখ এতো যত্ন সহকারে মনে রাখতেন না। তারপর তিনি রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতেন।–(আবু দাউদ)

৪. যে ব্যক্তি স্বচক্ষে রমযানের চাঁদ দেখবে, তার কর্তব্য হচ্ছে বস্তির সকল লোক অথবা মুসলমানদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়া তা সে পুরুষ হোক বা নারী হোক।

৫. পশ্চিম আকাশ—চাঁদ ওঠার স্থান যদি পরিষ্কার হয়, তাহলে এমন অবস্থায় শুধুমাত্র দুজন দীনদার লোকের সাক্ষ্যে রমযানের চাঁদ ওঠা প্রমাণিত হবে না আর না ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হবে। এ অবস্থায় অন্তত এতোজন লোকের সাক্ষ্য দরকার যাতে করে তাদের কথায় চাঁদ ওঠা সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

---

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

৬. চাঁদ ওঠার স্থান পরিষ্কার না হলে রমযানের নতুন চাঁদের প্রমাণের জন্যে শুধু একজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট তা সে পুরুষ হোক বা নারী। তবে নিম্ন শর্তে ঃ

ক. সাক্ষ্যদাতা বালেগ, জ্ঞান সম্পন্ন এবং দীনদার মুসলমান হতে হবে।

খ. তাকে বলতে হবে যে, সে নিজ চক্ষে চাঁদ দেখেছে।

৭. আকাশ পরিষ্কার হলে ঈদের নতুন চাঁদের জন্যে একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়—সে যেমন ধরনের বিশ্বস্ত লোক হোক না কেন। ঈদের চাঁদের জন্যে প্রয়োজন দুজন দ্বীনদার মুত্তাকী পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা অথবা একজন দ্বীনদার পুরুষ এবং দুজন দ্বীনদার নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা। যদি চারজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেয় যে তারা চাঁদ দেখেছে তথাপি তার দ্বারা ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হবে না।

৮. যেখানে কোনো মুসলমান কাযী অথবা শাসক নেই, সেখানকার মুসলমানদের উচিত নিজেরাই চাঁদ দেখার ব্যবস্থা করবে, তার প্রচার করবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে।

৯. সারা শহরে একথা ছড়িয়ে পড়লো যে, চাঁদ দেখা গেছে, কিন্তু বহু অনুসন্ধানের পরও এমন কোনো ব্যক্তি পাওয়া গেল না যে একথা স্বীকার করবে, সে নিজে চাঁদ দেখেছে। এ অবস্থায় চাঁদ ওঠা প্রমাণিত হবে না।

১০. যদি এমন ব্যক্তি রমযানের চাঁদ দেখেছে বলে বলা হচ্ছে যার সাক্ষ্য শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয নয়, এবং সে ছাড়া আর কেউ চাঁদ দেখেনি, তাহলে তার কথায় শহর বা বস্তির লোক রোযা রাখবে না। কিন্তু সে অবশ্যই রোযা রাখবে তার রোযা রাখা ওয়াজিব। তারপর তার ত্রিশ রোযা হয়ে গেল এবং ঈদের চাঁদ দেখা গেল না, তখন ৩১ রোযা করবে এবং বস্তির লোকের সাথে ঈদ করবে।

১১. কোনো কারণে কোনো জায়গায় চাঁদ দেখা গেল না এবং অন্য স্থান থেকে চাঁদ দেখার খবর এলো। যদি সে খবর শরীয়াতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তার দ্বারা রমযানের চাঁদও প্রমাণিত হবে এবং ঈদের চাঁদও। মুস-লমান দায়িত্বশীলদের প্রয়োজন হবে যে, তারা এসব খবর যাঁচাই করে দেখবে এবং শরীয়াত মুতাবেক যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে শহরে তার পাবলিসিটি করার এন্তেযাম করবে।

১২. দুজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্য দানে চাঁদ দেখা যদি প্রমাণিত হয় এবং সে অনুযায়ী লোক রোযা রাখে, কিন্তু ৩০ রোযা পুরো হওয়ার

পর ঈদের চাঁদ দেখা গেল না, তাহলে ৩১শে দিনে ঈদ করবে। সেদিন রোযা জায়েয হবে না।

নতুন চাঁদ দেখার পর দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন, নবী (স) নতুন চাঁদ দেখলে বলতেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ۔

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, হে আল্লাহ ! এ চাঁদকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ঈমান ও ইসলামের চাঁদ হিসেবে উদিত কর। যে কাজ তোমার পসন্দনীয় এবং প্রিয় সে কাজের তাওফীক আমাদেরকে দাও। হে চাঁদ ! তোমার এবং আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ।"-(তিরমিযি ও দারেমী)

রোযার প্রকারভেদ ও তার হুকুম

রোযা ছয় প্রকার—যার বিস্তারিত বিবরণ ও হুকুম জানা জরুরী। (১) ফরয, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নাত, (৪) নফল, (৫) মাকরূহ ও (৬) হারাম।

১. ফরয রোযা-বছরে শুধু রমযানের রোযা (৩০ বা ২৯ চাঁদ অনুযায়ী) মুসলমানদের ওপর ফরয। কুরআন ও হাদীস থেকে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। মুসলিম উম্মত তার গোটা ইতিহাসে বরাবর এর ওপর আমল করে এসেছে। যে রমযানের রোযা ফরয হওয়া অস্বীকার করবে সে কাফের হবে এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবে। আর বিনা ওযরে রোযা ত্যাগ করলে ফাসেক ও কঠিন গোনাহগার হবে। রমযানের রোযা কোনো কারণে বা অবহেলা করে করা না হলে তার কাযা করাও ফরয। এ ফরয কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নয়, যখনই সুযোগ হবে করতে হবে—বরঞ্চ যথাশীঘ্র করা উচিত।

২. ওয়াজেব রোযা-মানতের রোযা, কাফ্ফারার রোযা ওয়াজিব। কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখার মানত করলে সেই দিনে রোযা রাখা জরুরী। দিন নির্দিষ্ট না করলে যে দিন ইচ্ছা করা যায়। বিনা কারণে বিলম্ব করা ঠিক নয়।

৩. সুন্নাত রোযা-যে রোযা নবী (স) স্বয়ং করেছেন এবং করতে বলেছেন তা সুন্নাত। তা রাখার বিরাট সওয়াব রয়েছে। কিন্তু তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নয় এবং না রাখলে গোনাহ হবে না। সুন্নাত রোযা নিম্নরূপ ঃ

০ আশুরার রোযা। অর্থাৎ মহররমের নয় তারিখ এবং দশ তারিখের দুটি রোযা।

০ আরফার দিনের রোযা। অর্থাৎ যুলহজ্জের নয় তারিখের রোযা।

০ আইয়ামে বীযের রোযা। অর্থাৎ চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা।

৪. নফল রোযা–ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত বাদে সব রোযা নফল বা মুস্তাহাব। নফল রোযা এমন যে, তা নিয়মিত করলে বিরাট সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন ঃ

১. শাওয়াল মাসের ছটি রোযা।

২. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা।

৩. শাবানের ১৫ই তারিখের রোযা।

৪. যুলহজ্জ মাসের প্রথম আট রোযা।

৫. মাকরূহ রোযা–

০ শুধু শনি অথবা রবিবার রোযা রাখা।

০ শুধু আশুরার দিন রোযা রাখা।

০ স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে রোযা রাখা।

০ মাঝে কোনো দিন বাদ না দিয়ে ক্রমাগত রোযা রাখা যাকে সাওমে ভেসাল বলে।

৬. হারাম রোযা–বছরে পাঁচ দিন রোযা হারাম।

১. ঈদুল ফিতরের দিনে রোযা।

২. ঈদুল আযহার দিনে রোযা।

৩. আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা অর্থাৎ ১১ই, ১২ই, ১৩ই যুলহজ্জ তারিখে রোযা রাখা হারাম।

রোযার শর্তাবলী

রোযার শর্ত দু প্রকার ঃ

০ রোযা সহীহ হওয়ার শর্ত।

০ রোযা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত।

রোযা সহীহ হওয়ার জন্যে যেসব জিনিসের প্রয়োজন তাকে শারায়েতে সিহহাত বলে এবং ওয়াজিব হওয়ার জন্যে যা প্রয়োজন তাকে শারায়েতে অজুব বলে।

রোযা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

১. ইসলাম। কাফেরের ওপর রোযা ওয়াজিব নয়।

২. বালেগ হওয়া। নাবালেগের ওপর রোযা ওয়াজিব নয়।

অবশ্যি অভ্যাস সৃষ্টি করার জন্যে নাবালেগ ছেলেমেয়েদের রোযা রাখতে বলা উচিত। যেমন নামায পড়াবার অভ্যাস করার তাকীদ হাদীসে করা হয়েছে, তেমনি রোযা রাখাবার জন্যেও প্রেরণা দেয়া হয়েছে। যারা ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে তাদেরকেই শুধু রোযা রাখতে বলা উচিত। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

৩. রমযানের রোযা ফরয হওয়া সম্বন্ধে জানা থাকা।

৪. মাযুর বা অক্ষম না হওয়া। অর্থাৎ এমন কোনো ওযর না থাকা যাতে রোযা না থাকার অনুমতি রয়েছে, যেমন সফর, বার্ধক্য, রোগ, জিহাদ ইত্যাদি।

রোযা সহীহ হওয়ার শর্তাবলী

১. ইসলাম। কাফেরের রোযা সহীহ নয়।

২. মহিলাদের হায়েয নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

৩. নিয়ত করা। অর্থাৎ মনে মনে রোযা রাখার এরাদা করা। রোযা রাখার এরাদা ছাড়া কেউ সারাদিন যদি ঐসব জিনিস থেকে বিরত থাকে যার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তাহলে তার রোযা হবে না।

রোযার ফরয

রোযার মধ্যে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকা ফরয ঃ

১. কিছু খাওয়া থেকে বিরত থাকা।

২. কিছু পান করা থেকে বিরত থাকা।

৩. যৌনবাসনা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা।

যৌনবাসনা পূরণের মধ্যে ঐসব যৌন সম্ভোগ শামিল যার দ্বারা বীর্যপাত হয়, তা স্ত্রী সংগমের দ্বারা হোক অথবা যে কোনো মানুষ, পশু প্রভৃতির সাথে

যৌন ক্রিয়ার দ্বারা হোক অথবা হস্তমৈথুনের দ্বারা হোক। মোটকথা এসব থেকে বিরত থাকতে হবে। অবশ্যি আপন স্ত্রীকে দেখা, আদর করা, জড়িয়ে ধরা অথবা চুমো ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ফরয নয়। কারণ তাতে বীর্যপাত হয় না।

রোযার সুন্নাত ও মুস্তাহাব

১. সিহরীর ব্যবস্থা করা সুন্নত, কয়েকটি খেজুর হোক বা এক চুমুক পানি হোক।

২. সিহরী শেষ সময়ে খাওয়া মুস্তাহাব—সুবহে সাদেক হতে যখন সামান্য বাকী।

৩. রোযার নিয়ত রাতেই করে নেয়া মুস্তাহাব।

৪. ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অযথা বিলম্ব না করা।

৫. খুরমা খেজুর অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব।

৬. গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা বলা, হৈ হাংগামা, রাগ এবং বাড়াবাড়ি না করা সুন্নত। এ কাজ অবশ্যি অন্য সময়ে করাও ঠিক নয়। কিন্তু রোযার সময়ে তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা বেশী করা উচিত।

কি কি কারণে রোযা নষ্ট হয়

রোযা অবস্থায় তিনটি বিষয় থেকে দূরে থাকা ফরয, যথা ঃ

(১) কিছু না খাওয়া (২) কিছু পান না করা এবং (৩) যৌনবাসনা পূর্ণ না করা। এসব থেকে বিরত থাকা ফরয।

অতএব উপরোক্ত তিনটি ফরযের খেলাপ কাজ করলেই রোযা নষ্ট হয়। যেসব জিনিস রোযা নষ্ট করে তা আবার দু প্রকার। এক–যার দ্বারা শুধু কাযা ওয়াজিব হয়। দুই–যার দ্বারা কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কিছু নীতিগত কথা

১. কোনো কিছু ইচ্ছা করে পেটে প্রবেশ করালে এবং তা উপকারী হওয়ার ধারণাও যদি থাকে, তা খাদ্য হোক, ঔষধ হোক অথবা এমন কাজ হোক যার আস্বাদ সংগম ক্রিয়ার মতো, তাহলে এসব অবস্থায় কাযা এবং কাফ্ফারা দু'ই ওয়াজিব হয়।

২. কোনো কিছু যদি আপনা আপনি পেটের মধ্যে চলে যায়, তার উপকারী হওয়ার ধারণাও না থাকে, অথবা এমন কোনো কাজ করা হলো যার আস্বাদ সংগম ক্রিয়ার মতো নয়, তাহলে শুধু মাত্র কাযা ওয়াজিব হবে।

৩. শুধু রমযানের রোযা নষ্ট হলেই তার কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, রমযান ছাড়া অন্য রোযা নষ্ট হলে তার কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, তা ভুলক্রমে নষ্ট হোক অথবা ইচ্ছা করে নষ্ট করা হোক।

৪. রমযানের কাযা রোযা নষ্ট হলে তার কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, শুধু রমযান মাসে রোযা নষ্ট হলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

৫. যাদের মধ্যে রোযা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া যায় না, তাদের রোযা নষ্ট হলেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যেমন, মুসাফিরের রোযা, হায়েয-নেফাস ওয়ালী মেয়েদের রোযা। যদিও মুসাফির এবং হায়েয-নেফাস ওয়ালী মেয়েলোক রোযার নিয়ত সফর শুরু করার আগে এবং হায়েয-নিফাস হওয়ার আগে করে থাকে।

৬. যে কোনো কাজ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যায়, যেমন ভুল করে কেউ কিছু খেয়ে নিলো, অথবা যৌনক্রিয়া করলো, অথবা কুল্লি করতে হঠাৎ পানি গলার ভেতর চলে গেল, অথবা কেউ যবরদস্তি করে যৌনক্রিয়া করালো, তাহলে এসব অবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

৭. যৌনক্রিয়ায় ক্রিয়াকারী এবং যার ওপর করা হলো এ উভয়ের জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া শর্ত নয়। উভয়ের মধ্যে যে জ্ঞানসম্পন্ন এবং স্বেচ্ছায় এ কাজ করবে তার কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। নারী জ্ঞানসম্পন্ন হলে কাফ্ফারা তাকে দিতে হবে পুরুষকে নয়। আবার পুরুষ জ্ঞানসম্পন্ন হলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে, মাথা খারাপ পাগল মেয়ে মানুষের ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

৮. কোনো মেয়েলোক নাবালক ছেলের দ্বারা যৌনক্রিয়া করে নিক অথবা কোনো পাগলের দ্বারা, তার ওপর কাযা ও কাফ্ফারা দুটিই ওয়াজিব হবে।

৯. রমযানে রোযার নিয়ত ব্যতিরেকে কেউ খানা-পিনা করলে তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা তখনই ওয়াজিব যদি রোযার নিয়ত করার পর তা নষ্ট করে।

১০. কোনো সন্দেহের কারণে কেউ রোযা নষ্ট করলে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

যেসব ব্যাপারে শুধু রোযা কাযা করতে হবে

১. কারো বিলম্বে ঘুম ভাঙলো এবং সিহরীর সময় আছে মনে করে খানা-পিনা করলো। তারপর দেখলো যে ভোর হয়ে গেছে। তাহলে সে রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে।

২. কেউ বেলা ডোবার আগেই সূর্য ডুবেছে মনে করে ইফতার করলো। তাহলে কাযা করতে হবে।

৩. অনিচ্ছায় কোনো কিছু পেটের মধ্যে গেল, যেমন কুল্লি করতে গিয়ে গলার ভেতর পানি চলে গেল, নাকে বা কানে ওষুধ দিল তা পেটের মধ্যে গেল, পেট বা মাথার ঘায়ে ওষুধ দেয়া হলো, তা পেটে বা মাথার মধ্যে ঢুকলো এসব অবস্থায় কাযা ওয়াজিব হবে।

৪. কেউ রোযাদারকে জোর করে খাইয়ে দিল, তাহলে শুধু কাযা করতে হবে।

৫. কেউ কোনো নারীর সাথে জোর করে সহবাস করলো অথবা মেয়ে মানুষ অঘোরে ঘুমচ্ছিল অথবা বেহুঁশ হয়ে ছিল কেউ তার সাথে সহবাস করলো, তাহলে সে মেয়েলোকটির শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

৬. কোনো নির্বোধ লোক কোনো মৃত নারী অথবা অল্প বয়স্ক বালিকা অথবা কোনো পশুর সাথে যৌন ক্রিয়া করলো, অথবা কাউকে ঝাঁপটে ধরলো, অথবা চুমো দিল অথবা হস্তমৈথুন করলো এবং এসব অবস্থায় বীর্যপাত হলো তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

৭. কেউ রোযার নিয়তই করলো না কিন্তু খানাপিনা থেকে বিরত থাকলো অথবা নিয়ত করলো কিন্তু দুপুরের পর, তাহলে এমন অবস্থায় রোযা হবে না, কাযা ওয়াজিব হবে।

৮. রোযা অবস্থায় কারো মুখে চোখের পানি অথবা ঘাম ঢুকলো এবং লবণাক্ত অনুভব করলো এবং তা গিলে ফেললো, তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা করতে হবে।

৯. মুখে পান রেখে কেউ ঘুমিয়ে পড়লো তারপর সুবেহ সাদেকের পর ঘুম ভাংলো, তাহলে শুধু কাযা করতে হবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না।

১০. রোযার মধ্যে মুখ ভরে বমি করলো, তাহলে রোযা নষ্ট হবে, কাযা করতে হবে।

১১. কেউ রোযা অবস্থায় কোনো পাথর বা লোহার টুকরো এবং এমন কোনো জিনিস খেয়ে ফেললো যা না আহার হিসেবে খায়, না ওষুধ হিসেবে, তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা করতে হবে।

১২. কোনো স্ত্রীলোক রোযার মধ্যে তার গুপ্তাংগে কোনো ওষুধ বা তেল দিল, তাহলে শুধু কাযা করতে হবে।

১৩. কেউ রোযা রেখে ভুলে কিছু খেয়ে ফেললো, তারপর রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে ইচ্ছা করেই খানা-পিনা করলো, তাহলে রোযা নষ্ট হবে, কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা নয়।

১৪. কেউ রোযা রেখে কানে তৈল দিল অথবা জুলাপ নিল, তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং শুধু কাযা করতে হবে।

১৫. কোনো মেয়ে মানুষ চিকিৎসা প্রভৃতির জন্যে তার আঙুল লজ্জাস্থানে প্রবেশ করালো অথবা কোনো দাইয়ের দ্বারা প্রবেশ করালো তারপর সমস্ত আঙুল বা তার কিছুটা বের করে পুনরায় ঢুকালো, তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। আর যদি পুনরায় প্রবেশ না করায় কিন্তু আঙুল কোনো কিছুতে ভিজে গেল তাহলে প্রথমবার ঢুকালেই রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যদি কোনো মেয়ে মানুষ তার লজ্জাস্থানে তুলা প্রভৃতি রাখে এবং সবটুকু ভেতরে ঢুকে পড়ে, তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে।

১৬. সহবাস ব্যতিরেকে যৌন সম্ভোগের এমন কোনো কাজ করলো যাতে সাধারণত বীর্যপাত হয়, যদি বীর্যপাত হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। যেমন কেউ হস্তমৈথুন করলো, অথবা কেউ স্ত্রীর নাভিতে, উরুতে অথবা বগলে তার পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে বীর্যপাত করলো, অথবা কোনো পশুর সাথে এ কাজ করলো, অথবা কোনো স্ত্রীলোক অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সাথে যৌন আনন্দের চেষ্টা করলো এবং বীর্যপাত হলো, তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

১৭. মিসওয়াক করার সময় অথবা এমনিতেই দাঁতের রক্ত বেরুলো এবং রোযা থাকা অবস্থায় তা থুথুসহ গিলে ফেললো, তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু রক্ত যদি থুথুর পরিমাণ থেকে কম হয় এবং গলায় তা অনুভব করা গেল না, তাহলে রোযা নষ্ট হবে না।

যে যে অবস্থায় কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়

১. কেউ রোযার মধ্যে উত্তেজনা বসে যৌনক্রিয়া করে বসলো, সে নারী হোক বা পুরুষ অথবা কোনো পুরুষ সমমৈথুন করলো, তাহলে কাযা কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজেব হবে।

২. কোনো নারী পুরুষের শয্যা সংগিনী হলো এবং পুরুষাঙ্গের মাথা তার লজ্জাস্থানে প্রবেশ করলো, এমন অবস্থায় বীর্যপাত হোক বা না হোক, কাযাও ওয়াজিব হবে এবং কাফ্‌ফারাও।

৩. কোনো নির্বোধ তার স্ত্রীর পাশে শয়ন করে তার পশ্চাদ্বারে তার পুরুষাঙ্গ ঢুকালো, তাহলে উভয়ের রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

৪. কেউ রোযা রেখে এমন কিছু খেলো বা পান করলো যা খাওয়া এবং পান করা হয়, অথবা এমন জিনিস খেলো যা আহার হিসেবে ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু ওষুধ হিসেবে খেলো, তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযা কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

৫. স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে অথবা বেহুঁশ হয়ে আছে, স্বামী তার সাথে সহবাস করলো, তাহলে স্বামী বা পুরুষের কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

৬. কেউ এমন কিছু কাজ করলো যাতে রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু মনে করলো যে রোযা নষ্ট হয়েছে এবং তারপর খানাপিনা করলো, তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং কাযাও করতে হবে, কাফ্‌ফারাও করতে হবে।

যেমন ধরুন, কেউ সুরমা লাগালো, অথবা মাথায় তেল দিল, অথবা মেয়ে মানুষকে বুকে জড়িয়ে ধরলো অথবা চুমো দিল, তারপর মনে করলো যে রোযা নষ্ট হয়েছে এবং সে তারপর ইচ্ছা করেই খানা-পিনা করলো, তাহলে এ অবস্থায় কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

যেসব জিনিসে রোযা মাকরূহ হয়

অর্থাৎ ঐসব জিনিসের বর্ণনা যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না বটে কিন্তু মাকরূহ হয়। এসব মাকরূহ তানযিহী, তাহরীমি নয়।

১. কোনো জিনিসের আস্বাদ গ্রহণ করা। তবে যদি কোনো মেয়েলোক বাধ্য হয়ে খাবার জিনিস চেখে দেখে অথবা বাজার থেকে খরিদ করার সময় এ

জন্যে চেখে দেখে যে, তাঁর স্বামী বড়ো বদমেজাজী এবং কঠোর অথবা কোনো চাকরানী তার মনিবের ভয়ে চেখে দেখে, তাহলে রোযা মাকরূহ হবে না।

২. মুখে কোনো কিছু চিবানো অথবা এমনি দিয়ে রাখা, যেমন কোনো মেয়ে মানুষ ছোটো বাচ্চাকে খাওয়াবার জন্যে মুখে নিয়ে কোনো কিছু চাবায় অথবা নরম করার জন্যে বা ঠাণ্ডা করার জন্যে মুখে রাখে তাহলে রোযা মাকরূহ হবে না। অবশ্যি বাধ্য হয়ে এসব করা জায়েয। যেমন কারো বাচ্চার খিদে পেয়েছে এবং সে শুধু সে জিনিসই খায় যা মুখে দিয়ে চিবিয়ে দিতে হয় এবং বেরোযা লোকও নেই, তাহলে এ অবস্থায় চিবিয়ে দিলে রোযা মাকরূহ হবে না।

৩. কোনো মেয়েলোকের ওষ্ঠ (ঠোঁট) মুখের মধ্যে নেয়া অথবা উলংগ অবস্থায় জড়িয়ে ধরা মাকরূহ—বীর্যপাত হওয়ার ও সহবাস করার আশংকা থাক বা না থাক।

৪. রোযা রেখে এমন কোনো কাজ করা মাকরূহ যার দ্বারা শরীর এতোটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে, রোযা ভেঙে ফেলার আশংকা হয়।

৫. কুল্লি করার সময় বা নাকে পানি দেয়ার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা।

৬. বিনা কারণে মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা।

৭. অস্থিরতা প্রকাশ করা, ঘাবড়িয়ে যাওয়া এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করা।

৮. গোসলের প্রয়োজন হলো এবং সুযোগও ছিল কিন্তু বিনা কারণে সুবেহ সাদেকের পর পর্যন্ত গোসল করলো না। তাহলে রোযা মাকরূহ হবে।

৯. মাজন, পেষ্ট অথবা কয়লা প্রভৃতি চিবিয়ে দাঁত মাজলে রোযা মাকরূহ হবে।

১০. রোযা রেখে গীবত করলে, মিথ্যা বললে, গালিগালাজ ও মারপিট অথবা কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করলে রোযা মাকরূহ হবে।

১১. ইচ্ছা করে মুখের মধ্যে ধুয়া অথবা ধূলাবালি গ্রহণ করা মাকরূহ। আর যদি লোবান জ্বালিয়ে তার ঘ্রাণ নেয়া হয় অথবা হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট খাওয়া হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

যেসব জিনিসে রোযা মাকরূহ হয় না

১. রোযার খেয়াল নেই এমন অবস্থায় কেউ ভুলে খানাপিনা করলে এমনকি ভুলে স্ত্রীসহবাস করলে–এমনকি ভুলে একাধিকবারও করলে এবং ভুলে পেট ভরেও আহার করলে রোযা নষ্ট হবে না এবং মাকরূহ হবে না।

২. রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় যদি স্বপ্নদোষ হয় এবং গোসল ফরয হয় তথাপি রোযা মাকরূহ হবে না।

৩. দিনের বেলায় সুরমা লাগানো, তেল মাথায় দেয়া, শরীরে তেল মালিশ করা, খুশবু গ্রহণ করা জায়েয, সুরমা লাগাবার পর কাশির মধ্যে যদি সুরমার চিহ্ন দেখা যায়, তথাপি রোযা নষ্ট হবে না।

৪. স্ত্রীর সাথে শুয়ে থাকা, দেহ জড়িয়ে ধরা, চুমো দেয়া সবই জায়েয। তবে যদি বীর্যপাতের আশংকা হয় অথবা কামোত্তেজনা বশে সহবাসের আংশকা হয় তাহলে এসব মাকরূহ হবে।

৫. থুথু ফেলা ও গিলা মাকরূহ নয়।

৬. গলার মধ্যে মাছি ঢুকে পড়লো অথবা আপনা আপনি ধূলাবালি বা ধূঁয়া ঢুকলো তাতে রোযা মাকরূহ হবে না। তবে ইচ্ছা করে এসব পেটের মধ্যে গ্রহণ করলে রোযা নষ্ট হবে।

৭. কোনো মেয়েলোকের গুপ্তাংগ দেখার পর অথবা যৌনবাসনা মনে জাগ্রত হওয়ার পর বীর্যপাত হলে রোযা মাকরূহ হবে না।

৮. কোনো পশুর স্ত্রীলিংগ স্পর্শ করার পর যদি বীর্যপাত হয় তবুও রোযা নষ্ট হবে না।

৯. পুরুষের গুপ্তাংগের ছিদ্রে তেল, পানি অথবা ঔষধ দেয়া অথবা পিচকারি দিয়ে এসব পৌছানো অথবা দিয়াশলাই যা সুরমাদানীর কাঠি প্রবেশ করানো জায়েয এবং এতে রোযা মাকরূহ হবে না।

১০. যদি কেউ তার পশ্চাদ্দ্বারে অংগুলি অথবা শুকনো কাঠ ঢুকায় এবং শুকনো কাঠ ভেতরে চলে না যায় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না।

১১. কেউ মনে করলো যে এখনো রাত আছে এবং স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হলো, অথবা রোযার খেয়াল নেই সহবাস শুরু করলো, তারপর হঠাৎ মনে হলো যে, সুবহে সাদেক হয়েছে অথবা রোযার কথা মনে হলো এবং সংগে সংগে স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত হলো। স্ত্রী থেকে পৃথক হওয়ার পরও যদি

বীর্যযাত হয় তবুও রোযা নষ্ট হবে না। এ বীর্যপাত স্বপ্নদোষের বীর্যপাতের মতো মনে করা হবে।

১২. কানের ভেতর পানি চলে গেলে অথবা ইচ্ছা করে দিলে রোযা মাকরূহ হবে না।

১৩. দাঁতের মধ্যে খাদ্য, গোশতের টুকরো, কোনো আঁশ অথবা সুপারীর টুকরো রয়ে গেল এবং মুখ থেকে বের করা হলো না বরঞ্চ সেখান থেকে গিলে ফেললো, এখন পরিমাণ যদি ছোলা থেকে কম হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না।

১৪. অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখভরে বমি হলো—কম হোক বেশী হোক তাতে রোযা মাকরূহ হবে না। কিছু পেটের মধ্যে আপনা আপনি ঢুকে পড়লেও রোযা মাকরূহ হবে না।

১৫. রোযা রেখে যে কোনো সময়ে মিসওয়াক করলে, তা শুকনো হোক, ভিজা হোক অথবা টাকটা হোক এমনকি নিমের তাজা মিসওয়াকের তিক্ত স্বাদ অনুভব করলেও রোযা মাকরূহ হবে না।

১৬. অধিকমাত্রা গরমে কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়া, হাত মুখ ধোয়া, গোসল করা, ভিজে কাপড় গায়ে দেয়া মাকরূহ নয়।

১৭. পান খাওয়ার পর ভালো করে কুল্লি ও গড়গড়া করা হয়েছে কিন্তু থুথুর মধ্যে লাল আভা দেখা যাচ্ছে তাতে রোযা মাকরূহ হবে না।

১৮. ইচ্ছা করে বমি করলে–তা যদি সামান্য হয় এবং মুখ ভরে না হয় তাহলে রোযা নষ্টও হবে না, মাকরূহ হবে না।

১৯. মিসওয়াক করার সময় অথবা আপনা আপনি মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় এবং তা যদি গিলে ফেলা হয় এবং রক্তের পরিমাণ থুথু থেকে কম হয় গলায় রক্তের স্বাদ পাওয়া না যায় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না।

রোযার নিয়তের মাসয়ালা

১. নিয়ত করার অর্থ মনে মনে এরাদা করা, মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা জরুরী নয়, শুধু মনের মধ্যে ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। বরঞ্চ সিহরী খাওয়াটাই নিয়তের স্থলাভিষিক্ত। এজন্যে যে রোযার জন্যেই সিহরী খাওয়া হয়।

অবশ্যি যারা ঐ সময়ে খেতে সাধারণত অভ্যস্ত অথবা যেসব নাদান নিয়মিত সিহরী খায় কিন্তু রোযা রাখে না, তাদের জন্যে নিয়ত করা জরুরী।

২. রমযানের প্রত্যেক রোযার জন্যে আলাদা নিয়ত করা জরুরী। গোটা রমযানের জন্যে একবার নিয়ত করা যথেষ্ট নয়।

৩. রমযানের চলতি রোযার জন্যে ফরয বলে নিয়ত করা জরুরী নয়—শুধু রোযার নিয়ত করাই যথেষ্ট। কিন্তু কোনো রোগী রমযানের রোযা রাখলে সে ফরযের নিয়ত করবে। কারণ তার ওপর রমযানের রোযা ফরয নয়। যদি শুধু রোযার নিয়ত করে অথবা নফল রোযার নিয়ত করে তাহলে তার রোযা রমযানের রোযা হবে না।

৪. মুসাফিরের জন্যে জরুরী যে রমযানে সে যেন অন্য কোনো ওয়াজিব রোযার নিয়ত না করে, যেন রমযানের ফরয রোযার নিয়ত করে অথবা নফল রোযার নিয়ত করে তা দুরস্ত হবে।

৫. রমযানের কাযা রোযার জন্যে নির্দিষ্ট করে ফরযের নিয়ত করা জরুরী।

৬. কেউ রাতে রোযার নিয়ত করতে ভুলে গেল দিনের বেলায় মনে হলো, তাহলে তিন ধরনের রোযায় দুপুরের পূর্বে নিয়ত করলে দুরস্ত হবে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বে দুপুর পর্যন্ত যে কোনো সময়ে নিয়ত করলে দুরস্ত হবে ঃ

ক. রমযানের চলন্ত রোযার জন্যে।

খ. মানতের ওসব রোযার জন্যে যার দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

গ. নফল রোযার জন্যে।

৭. নিম্নের চার প্রকারের রোযার জন্যে সূর্যাস্ত থেকে সুবেহ সাদেক পর্যন্ত নিয়ত করা জরুরী—সুবেহ্ সাদেকের পর নিয়ত করা যথেষ্ট নয়।

ক. রমযানের কাযা রোযায়।

খ. মানতের ঐসব রোযায় যার দিন তারিখ নির্দিষ্ট নয়।

গ. কাফ্ফারার রোযায়।

ঘ. ঐসব নফল রোযার কাযায় যা শুরু করার পর কোনো কারণে নষ্ট হয়েছে।

৮. রাতে রোযা রাখার নিয়ত ছিল না। সকালেও রোযা রাখার খেয়াল ছিল না, তারপর দুপুরের আগে হঠাৎ মনে পড়লো যে, রমযানের রোযা ছাড়া ঠিক নয় এবং তড়িঘড়ি করে নিয়ত করে ফেললো, তাহলে রোযা দুরস্ত হবে।

কিন্তু সকালে যদি কিছু খেয়ে থাকে তাহলে তো নিয়ত করার কোনো অবকাশই রইলো না।

৯. রমযান মাসে কেউ ফরয রোযার পরিবর্তে নফল রোযার নিয়ত করলো এবং মনে করলো যে পরে ফরয রোযার কাযা করে নেবে। তথাপি সে রোযা রমযানের রোযাই হবে। নফল রোযা হবে না। এমনি নফল রোযার পরিবর্তে ওয়াজিব রোযার যদি নিয়ত করে, তথাপি রমযানের রোযা হবে। নীতিগত কথা এই যে, রমযানে শুধু রমযানের ফরয রোযাই হবে, অন্য রোযা হবে না।

১০. রোযা সুবেহ সাদেক থেকে শুরু হয়। অতএব সুবেহ সাদেকের পূর্বে এ সকল কাজ জায়েয যার থেকে বিরত থাকা রোযার মধ্যে ফরয। কেউ মনে করে যে, রোযার নিয়ত করার পর কিছু খাওয়া দাওয়া করা জায়েয নয়। একথা ঠিক নয়। সুবেহ সাদেকের পূর্বে খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি জায়েয— যদিও সূর্যাস্তের পরই পরের দিনের রোযার নিয়ত করা হয়ে থাকে।

১১. নফল রোযার নিয়ত করলে তা ওয়াজিব হয়ে যায়। সকালে নিয়ত করার পর যদি তা ভেঙে ফেলা হয় তাহলে সে রোযার কাযা ওয়াজিব হবে।

১২. কেউ রাতে এরাদা করলো যে, পরদিন রোযা রাখবে। কিন্তু সকাল হওয়ার পূর্বেই ইচ্ছা পরিবর্তন করলো এবং রোযা রাখলো না। এ অবস্থায় কাযা ওয়াজিব হবে না।

১৩. রাতে নিয়ত করলে বলবে بصوم غد نويت من شهر رمضان ‘আমি আগামীকাল মাহে রমযানের রোযা রাখার নিয়ত করলাম।’ দিনে নিয়ত করলে বলবে نويت بصوم اليوم من شهر رمضان ‘মাহে রমযানের আজকের দিনের রোযার নিয়ত করছি।’ কিন্তু আরবীতে নিয়ত করা জরুরী নয়, যে কোনো ভাষায় বলা যায়।

সিহরী ও ইফতার

রোযা রাখার উদ্দেশ্যে সুবেহ সাদেকের পূর্বে যে খাওয়া দাওয়া করা হয় তাকে সিহরী বলে। নবী (স) স্বয়ং সিহরীর ব্যবস্থাপনা করতেন এবং অন্যকেও সিহরী খাওয়ার তাকীদ করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (স) সিহরীর সময় আমাকে বলতেন, আমার রোযা রাখার ইচ্ছা, আমাকে কিছু খেতে দাও। তখন আমি তাঁকে কিছু খেজুর এবং এক বাটি পানি খেতে দিতাম।

নবী (স) সিহ্রীর তাকীদ করতে গিয়ে বলেন, সিহ্রী খেয়ো এজন্যে যে, এতে বিরাট বরকত রয়েছে।

বরকত বলতে এই যে, দিনের কাজকর্মে এবং ইবাদাত বন্দেগীতে দুর্বলতা মনে হবে না এবং রোযা সহজ হবে। একবার নবী (স) বলেন ঃ

দিনে রোযা রাখার জন্যে সিহ্রী খাওয়া দ্বারা সাহায্য নাও এবং রাতের ইবাদাতের জন্যে কায়লুলা দ্বারা সাহায্য নিও।

সিহ্রী খাওয়া সুন্নত। মুসলমান এবং ইহুদী-নাসারাদের রোযার মধ্যে পার্থক্য এই যে, তারা সিহ্রী খায় না, মুসলমান খায়, ক্ষিধে না হলে কিছু মিষ্টি, অথবা দুধ অথবা পানি খেয়ে নেয়া উচিত এজন্যে সিহ্রী খাওয়ার মধ্যে বিরাট সাওয়াব আছে। নবী (স) বলেন–

সিহ্রী খাওয়া প্রত্যক্ষ বরকত। সিহ্রী খেতে ভুলো না, তা এক চুমুক পানি হোক না কেন। কারণ সিহ্রী যারা খায় তাদের ওপর আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্যে এস্তেগফার করেন।

সিহ্রী বিলম্বে করা

সুবেহ্ সাদেক হতে সামান্য বাকী আছে এতোটা বিলম্ব করে সিহ্রী খাওয়া মুস্তাহাব। অনেকে সাবধানতার জন্যে অনেক আগে সিহ্রী খায়। এটা ভালো নয়। বিলম্বে খাওয়াতে সওয়াব আছে।

ইফতার তাড়াতাড়ি করা

ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর সাবধানতার জন্যে বিলম্ব করা মুনাসিব নয়, বরঞ্চ তৎক্ষণাৎ ইফতার করা উচিত। এভাবে অপ্রয়োজনীয় সাবধানতার ফলে দীনী মানসিকতা লোপ পায়। এটা দীনদারি নয় যে, লোক অযথা নিজেদেরকে কষ্টে ফেলবে। বরঞ্চ দীনদারি হচ্ছে এই যে, বিনা বাক্য ব্যয়ে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে।

নবী (স) বলেন, তিনটি বিষয় পয়গম্বরসুলভ আচরণের শামিল ঃ

১ সিহ্রী বিলম্বে খাওয়া।

২. ইফতার তাড়াতাড়ি করা।

৩. নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখা।

হযরত ইবনে আবি আওফা (রা) বলেন, আমরা একবার সফরে নবী (স)-এর সাথী ছিলাম। তিনি রোযা ছিলেন। যখন সূর্য দৃষ্টির আড়াল হলো

তখন তিনি একজনকে বললেন, ওঠ আমার জন্যে ছাতু গুলে দাও। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আর একটু দেরী করুন সন্ধ্যা হয়ে গেলে ভালো হয়। এরশাদ হলো—সওয়ারী থেকে নাম এবং আমাদের জন্যে ছাতু গুলে দাও। সে আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখনো দিন আছে বলে মনে হচ্ছে। আবার এরশাদ হলো—সওয়ারী থেকে নেমে পড় এবং আমাদের জন্যে ছাতু তৈরী করে দাও। তখন সে নামলো এবং সকলের জন্যে ছাতু তৈরী করলো। নবী (স) ছাতু খেয়ে বললেন, তোমরা যখন দেখবে যে রাতের কালো ছায়া ওদিক থেকে ছেয়ে আসছে তখন রোযাদারের রোযা খোলা উচিত।-(বুখারী)

নবী (স) বলেন, আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে, আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ঐ বান্দাহকে আমার পসন্দ হয়, যে ইফতার তাড়াতাড়ি করে।-(তিরমিযি) (অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর কিছুতেই বিলম্ব করো না)।

নবী (স) আরও বলেন, লোক ভালো অবস্থায় থাকবে যতোক্ষণ তারা ইফতার তাড়াতাড়ি করতে থাকবে।-(বুখারী, মুসলিম)

কোন্ জিনিস দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব

খেজুর এবং খুরমা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব তা না হলে পানি দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব। নবী (স) স্বয়ং এসব দিয়ে ইফতার করতেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (স) মাগরিবের নামাযের পূর্বে কয়েকটি ভিজানো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না হলে খুরমা দিয়ে। তাও না হলে কয়েক চুমুক পানি পান করতেন।-(তিরমিযি, আবু দাউদ)

এসব জিনিস দিয়ে ইফতার করার জন্যে নবী (স) সাহাবায়ে কেরামকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ রোযা রাখলে খেজুর দিয়ে ইফতার করবে। তা না হলে পানি দিয়ে। আসলে পানি অত্যন্ত পবিত্র।-(আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ)

খেজুর ছিল আরবের উপাদেয় খাদ্য এবং ধনী গরীব সকলেই তা সহজেই লাভ করতো। আর পানি তো সর্বত্র প্রচুর পাওয়া যায়। এসব দিয়ে ইফতার করার জন্যে প্রেরণা দেয়ার তাৎপর্য এই যে, উম্মত যেন কোনো কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সময় মতো সহজেই রোযা খুলতে পারে। পানির একটা বৈশিষ্ট্য নবী (স) বলেন যে, তা এতোটা পাক যে তার দ্বারা সবকিছু পাক করা যায়। বাহ্যিক পাক তো অনুভবই করা যায়। তার সাথে রুহানী পবিত্রতাও হয়। রোযাদার যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সচেতন ঈমানের সাথে

সারাদিন তৃষ্ণার্ত থেকে এবং সূর্যাস্তে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে তখন স্বতস্ফূর্তভাবে তার মধ্যে শোকর গুযারির প্রেরণা সৃষ্টি হয় যার দ্বারা তার বাতেন বা আধ্যাত্মিক দিক আলোকিত করার সৌভাগ্য হয়।

কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এবং অন্য কোনো জিনিস দিয়ে ইফতার করা তাকওয়ার খেলাপ মনে করা একেবারে ভুল। এমনি এ ধারণা করাও ভুল যে—লবণ দিয়ে ইফতার করা বড়ো সওয়াবের কাজ।

ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ -

"আয় আল্লাহ! তোমার জন্য রোযা রেখেছিলাম এবং তোমার দেয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করলাম।"

ইফতারের পরের দোয়া

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ -

"পিপাসা চলে গেল, রগ-রেশা ঠিক হয়ে গেল এবং আল্লাহ চাইলে প্রতিদানও অবশ্যি মিলবে।"-(আবু দাউদ)

ইফতার করাবার সওয়াব

অন্যকে ইফতার করানোও পসন্দনীয় আমল এবং ইফতার যে করায় তাকেও ততোটা সওয়াব দেয়া হয় যতোটা দেয়া হয় রোযাদারকে। তা রোযাদারকে দু লোকমা খানা খাইয়ে দেয়া হোক অথবা একটা খেজুর দিয়েই ইফতার করানো হোক।

নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের মতোই সওয়াব পাবে।-(বায়হাকী)

সিহরী ছাড়া রোযা

রাতে সিহরীর জন্যে যদি ঘুম না ভাঙে, তবুও রোযা রাখা উচিত। সিহরী খাওয়া না হলে রোযা না রাখা কাপুরুষের কাজ। সিহরী না খাওয়ার জন্যে রোযা ছেড়ে দেয়া বড় গোনাহের কাজ।

যদি কখনো দেরীতে ঘুম ভাঙে এবং মনে হয় যে, রাত বাকী আছে এবং কিছু খানা-পিনা করা হলো। তারপর দেখা গেল যে, সুবেহ সাদেকের পর খানাপিনা করা হয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় যদিও রোযা হবে না, তথাপি রোযাদারের মতোই থাকতে হবে কিছু পানাহার করা যাবে না।

এতো বিলম্বে যদি ঘুম ভাঙে যে, সুবেহ সাদেক হওয়ার সন্দেহ হয় তাহলে এমন সময় খানাপিনা মাকরূহ এবং সন্দেহ হওয়ার পর খানাপিনা গোনাহর কাজ। পরে সত্যি সত্যিই জানা গেল যে, সুবেহ সাদেক হয়েই গেছে তাহলে কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু সন্দেহই যদি থেকে যায় তাহলে কাযা ওয়াজিব হবে না। তবে সতর্কতার জন্যে কাযা করবে।

যেসব ওজরের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে

যেসব ওজরের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে তাহলো দশটি। তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) সফর (২) রোগ (৩) গর্ভধারণ (৪) স্তন্যদান (৫) ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রাবল্য (৬) বার্ধক্য ও দুর্বলতা (৭) জীবন নাশের ভয় (৮) জেহাদ (৯) বেহুঁশ হওয়া (১০) মস্তিষ্ক বিকৃতি।

১। সফর

শরীয়াত তার যাবতীয় হুকুমের মধ্যে বান্দাহর সহজসাধ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। কোনো ব্যাপারেও তাকে অযথা কষ্ট ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন করা হয়নি। বস্তুত কুরআন পাকে রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করতে গিয়ে মুসাফির ও রোগীর অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط-(البقرة : ١٨٥)

"অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে তার জন্যে অপরিহার্য যে, সে যেন রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি রোগী অথবা সফরে আছে, সে অন্যান্য দিনে রোযা রেখে তার হিসেব পুরো করবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

১. সফর যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, এবং তার মধ্যে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থাক অথবা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হোক, সকল অবস্থায় —মুসাফিরের রোযা না রাখার অনুমতি আছে। অবশ্যই যে সফরে কোনো অসুবিধা নেই, তাতে রোযা রাখাই মুস্তাহাব যাতে করে রমযানের ফযীলত ও বরকত লাভ করা যায়। কিন্তু পেরেশানি ও অসুবিধা হলে রোযা না রাখা ভালো।

২. যদি রোযার নিয়ত করার পর অথবা রোযা শুরু হয়ে যাওয়ার পর কেউ সফরে রওয়ানা হয়। তাহলে সেদিনের রোযা রাখা জরুরী। কিন্তু রোযা ভেঙে দিলে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

৩. যদি কোনো মুসাফির দুপুরের আগে কোথাও মুকীম হয়ে যায় এবং ঐ সময় পর্যন্ত রোযা নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ সে করেনি, তাহলে তার জন্যেও সেদিন রোযা রাখা জরুরী, কিন্তু রোযা নষ্ট করলে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

৪. যদি কোনো মুসাফির কোনো স্থানে মুকীম হওয়ার ইরাদা করে, ১৫ দিনের কমই ইরাদা করুক না কেন, তথাপি তার উচিত যে, সে রোযা রাখে, এ দিনগুলোতে রোযা না রাখা মাকরূহ। আর যদি ১৫ দিন থাকার ইরাদা করে তাহলে তো রোযা না রাখা জায়েয নয়।

২। রোগ

১. যদি রোযা রাখার কারণে কোনো রোগ সৃষ্টির আশংকা হয় অথবা এ ধারণা হয় যে, ওষুধ না পাওয়ার কারণে অথবা আহার না পাওয়ার কারণে রোগ বেড়ে যাবে, অথবা যদি এ ধারণা হয় যে, স্বাস্থ্য বিলম্বে লাভ হবে তাহলে এসব অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে, এমন ধারণা করার সংগত কারণ থাকতে হবে। যেমন ধরুন, কোনো নেক ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক পরামর্শ দেয় অথবা নিজের বার বার অভিজ্ঞতা হয়েছে অথবা প্রবল সম্ভাবনা থাকে। নিছক অমূলক ধারণার ভিত্তিতে রোযা না রাখা জায়েয নয়।

২. যদি কারো নিজের নিছক এ ধারণা হয় যে সম্ভবত রোযা রাখলে রোগ সৃষ্টি হবে অথবা বেড়ে যাবে যার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, অথবা কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার বা হেকীমের পরামর্শ নেয়া হয়নি এবং রোযা রাখা হলো না, তাহলে গোনাহগার হবে এবং তার কাফ্ফারাও দিতে হবে।

৩. কোনো বেদীন চিকিৎসক, যে শরীয়াতের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুভব করে না, তার পরামর্শ অনুযায়ী চলাও ঠিক নয়।

৩। গর্ভ

১. যদি কোনো স্ত্রীলোকের প্রবল ধারণা হয় যে, রোযা রাখলে তার পেটের সন্তানের ক্ষতি হবে অথবা স্বয়ং তার ক্ষতি হবে, তাহলে তার জন্যে রোযা না রাখার অনুমতি আছে।

২. যদি রোযার নিয়ত করার পর কোনো মেয়ে মানুষ জানতে পারে যে, তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে এবং তার সুস্পষ্ট ধারণা হয় যে, রোযা রাখলে তার ক্ষতি

হবে তাহলে তার জন্যে এ অনুমতি আছে যে, সে রোযা ভেঙে ফেলবে। তারপর কাযা করবে। তার কাফ্ফারা দিতে হবে না।

৪। স্তন্যদান

১. রোযা রেখে স্তন্যদানে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, প্রসুতির ভয়ানক ক্ষতি হবে, যেমন দুধ শুকিয়ে যাবে এবং বাচ্চা ক্ষুধায় ছটফট করবে অথবা তার জীবনেরই আশংকা হয়, তাহলে তার রোযা না রাখার অনুমতি আছে।

২. যদি পারিশ্রমিক দিয়ে দুধ খাওয়ানো যেতে পারে এবং বাচ্চাও যদি অন্য কারো দুধ খায়, তাহলে রোযা না রাখা দুরস্ত নয়, আর যদি বাচ্চা অন্য কারো দুধ খেতেই চায় না, তাহলে রোযা না রাখা জায়েয আছে।

৩. পারিশ্রমিক নিয়ে যে দুধ খাওয়ায়, তারও যদি এ প্রবল ধারণা হয় যে, রোযা রাখার কারণে তার বাচ্চা অথবা স্বয়ং তার ক্ষতি হবে, তাহলে সে রোযা ছেড়ে দিতে পারে।

৪. কোনো মেয়ে মানুষ ঠিক রমযানের দিনেই দুধ খাওয়ানোর কাজ শুরু করলো। ঐদিন যদি সে রোযার নিয়তও করে থাকে তবুও তার রোযা না রাখা জায়েয। রোযা ভাঙার জন্যে কাযা করতে হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

৫। ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা

কোনো ব্যক্তি রোগী তো নয়, কিন্তু রোগের কারণে এতোটা দুর্বল হয়েছে যে, রোযা রাখলে পুনরায় অসুস্থ হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে, তাহলে তার জন্যে রোযা না রাখার অনুমতি আছে।

৬। দুর্বলতা ও বার্ধক্য

কোনো ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার জন্যে অনুমতি আছে যে, সে রোযা রাখবে না। আর এমন ব্যক্তির সম্পর্কে এ আশা তো করা যায় না যে, সুস্থ হয়ে কাযা করবে। এজন্যে তার ওয়াজিব যে, সে রোযার ফিদিয়া দেবে-তখনই দিক বা পরে। ফিদিয়ার পরিমাণ সাদকায়ে ফিতরের সমান।

৭। জীবনের আশংকা

যদি কঠোর পরিশ্রমের কারণে জীবনের আশংকা হয় অথবা কেউ যদি এ বলে বাধ্য করে যে, রোযা রাখলে তাকে মেরে ফেলবে, অথবা নিষ্ঠুরভাবে

মারপিট করবে অথবা কোনো অংগ কেটে দেবে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্যেও রোযা না রাখার অনুমতি আছে।

৮। জিহাদ

দীনের দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদের নিয়ত আছে এবং এ ধারণা হয় যে, রোযা রাখলে দুর্বল হয়ে পড়বে তাহলে রোযা না রাখার অনুমতি আছে।

০ কার্যত জেহাদ চলছে তখনও রোযা না রাখার অনুমতি আছে।

০ কার্যত জেহাদ চলছে না, কিন্তু শীঘ্রই সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে, এমন অবস্থায়ও অনুমতি আছে।

০ রোযা রাখার পর যদি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহলেও রোযা ভেঙে ফেলার অনুমতি আছে। তার জন্যে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

৯। হুঁশ না থাকা

কেউ যদি বেহুঁশ হয়ে যায় এবং কয়েকদিন ধরে বেহুঁশ থাকে, এ অবস্থায় যেসব রোযা রাখা হবে তার কাযা ওয়াজিব হবে। তবে যে রাতে সে বেহুঁশ হয়েছে তার পরদিন যদি তার দ্বারা এমন কোনো কাজ না হয় যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয় এবং এটাও যদি জানা যায় যে, সে রোযার নিয়ত করেছে বা করেনি, তাহলে সেদিন তার রোযা ধরা হবে এবং তার কাযা করতে হবে না। অবশ্যি পরের দিনগুলোর কাযা করতে হবে।

১০। মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া

যদি কেউ পাগল হয়ে পড়ে এবং রোযা রাখতে না পারে তাহলে তার দুটি উপায় রয়েছে ঃ

এক–কোনো সময়েই পাগলামি ভালো হচ্ছে না। এমন অবস্থায় রোযা বিলকুল মাফ–কাযা-ফিদিয়া কিছুই দরকার নেই।

দুই–কোনো সময়ে পাগলামি ভালো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এ অবস্থায় কাযা করতে হবে।

যেসব অবস্থায় রোযা ভাঙা জায়েয

১. হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে, এমন কোনো রোগ যার ফলে জীবন বিপদাপন্ন অথবা মোটর দুর্ঘটনায় আহত, উঁচু জায়গা থেকে পড়ে অবস্থা আশংকাজনক এমন অবস্থায় রোযা ভাঙা জায়েয।

২. কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং জীবনের আশংকা নেই কিন্তু আশংকা যে রোযা যদি ভাঙা না হয় তাহলে রোগ খুব বেড়ে যাবে, এমন অবস্থায় রোযা ভাঙার অনুমতি আছে।

৩. কারও এমন প্রচণ্ড ক্ষুধা তৃষ্ণা লেগেছে যে, কিছু পানাহার না করলে জীবন যাওয়ার আশংকা রয়েছে, তাহলে এমন অবস্থায় রোযা ভাঙা দুরস্ত আছে।

৪. কোনো গর্ভবতী মেয়েলোকের এমন দুর্ঘটনা হলো যে, তার নিজের অথবা পেটের বাচ্চার জীবনের আশংকা হলো, এমন অবস্থায় রোযা ভাঙার এখতিয়ার আছে।

৫. কাউকে সাপে দংশন করেছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ওষুধ পত্রের প্রয়োজন। এমন অবস্থায় রোযা ভাঙা উচিত।

৬. দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সাহস করে রোযা রাখা হলো। তারপর মনে হলো যে, যদি রোযা ভাঙা না হয় তাহলে জীবনের আশংকা রয়েছে, অথবা সাংঘাতিকভাবে রোগ বেড়ে যেতে পারে। এমন অবস্থায় রোযা ভাঙার অনুমতি আছে।

কাযা রোযার মাসায়েল

১. রমযানের যেসব রোযা কোনো কারণে করা হয়নি, তার কাযা আদায় করতে অযথা বিলম্ব করা উচিত নয়। যতো শীঘ্র করা যায় ততোই ভালো।

২. রমযানের রোযা হোক বা অন্য কোনো রোযা, তা ক্রমাগত করা জরুরী নয়। এটাও জরুরী নয় যে, ওজর শেষ হওয়ার সাথে সাথেই করতে হবে। সুযোগ মতো কাযা আদায় করলেই চলবে।

৩. রোযার কাযা ক্রমানুসারে করা ফরয নয়। যেমন কাযা রোযা না করেও রমযানের চলতি রোযা করা যায়।

৪. কাযা রোযা রাখার জন্যে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা জরুরী নয়। যতো রোযা কাযা হয়েছে তার বদলার ততোগুলো রোযা রাখতে হবে।

৫. যদি রমযানের দু বছরের রোযা কাযা পড়ে থাকে, তাহলে কোন্ বছরের কাযা আদায় করা হচ্ছে তা নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী। এজন্যে এ নিয়ত করতে হবে যে, অমুক বছরের কাযা রোযা রাখা হচ্ছে।

৬. কাযা রোযা রাখার জন্যে রাতেই নিয়ত করা জরুরী। সুবেহ সাদেকের পর কাযা রোযার নিয়ত করলে তা দুরস্ত হবে না। সে রোযা নফল হয়ে যাবে। কাযা রোযা পুনরায় রাখতে হবে।

৭. রমযানের কিছু রোযা কাযা হয়ে গেল। এ কাযা রোযা রাখার সুযোগ পাওয়া গেল না এবং আর এক রমযান এসে গেল। তাহলে প্রথমে রযমানের রোযা রাখতে হবে, কাযা রোযা পরে রাখবে।

৮. কেউ সন্দেহের দিনে রমযানের রোযা রাখলো। পরে জানা গেল যে, সেদিন শাবানের ৩০ তারিখ। তাহলে এ রোযা নফল হয়ে যাবে যদিও তা মাকরূহ হবে। আর যদি সে রোযা ভেঙে ফেলা হয় তো তার কাযা ওয়াজিব হবে না।

কাফ্ফারার মাসায়েল

রমযানের রোযা নষ্ট হয়ে গেলে তার কাফ্ফারা এই যে, ক্রমাগত ষাট দিন রোযা রাখতে হবে। মাঝে কোনো রোযা ছুটে গেলে আবার নতুন করে ক্রমাগত ষাট রোযা করতে হবে। মাঝে যে রোযা ছুটে গেছে তা হিসেবের মধ্যে গণ্য হবে না।

কোনো কারণে কেউ রোযা রাখতে না পারলে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে দু বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে।

১. মেয়েদের জন্যে কাফ্ফারার এ সুবিধা আছে যে, হায়েযের জন্যে মাঝে রোযা বাদ পড়লে ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। তবে হায়েয বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে রোযা শুরু করতে হবে।

২. কাফ্ফারা রোযা রাখার সময় যদি নেফাসের অবস্থা হয় তাহলে ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে। আবার নতুন করে ষাট রোযা পূরণ করতে হবে।

৩. কাফ্ফারা রোযা রাখার সময় যদি রমযান মাস এসে যায়, তাহলে রমযানের রোযা রাখতে হবে। তারপর পুনরায় এক সাথে ষাট রোযা রাখতে হবে।

৪. যদি একই রমযানে একাধিক রোযা নষ্ট হয় তাহলে সব নষ্ট রোযার জন্যে একই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

৫. কারো ওপর একটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। এ আদায় করার পূর্বে আর এক কাফ্ফারা ওয়াজিব হলো। তাহলে দুয়ের জন্যে একই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে তা এ দু'টি কাফ্ফারা দু'টি রমযানের হোক না কেন। শর্ত এই যে, যৌনক্রিয়ার কারণে যদি রোযা নষ্ট না হয়ে থাকে। যৌনক্রিয়ার কারণে যতো রোযা নষ্ট হবে তার প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

৬. ষাটজন দুঃস্থ লোকের ব্যাপারে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তারা পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে, ছোট বালককে খানা খাওয়ালে তার বদলায় পুনরায় বয়স্ক দুঃস্থকে খাওয়াতে হবে।

৭. খানা খাওয়ানোর পরিবর্তে খাদ্য শস্য দেয়াও জায়েয। অথবা তার মূল্যও দিয়ে দেয়া যায়।

৮. দুঃস্থদের খাওয়ানোর ব্যাপারে সাধারণ মানের খাদ্য হতে হবে—না খুব ভালো, না খারাপ।

৯. দুঃস্থদের খাওয়াবার ব্যাপারে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করলে কোনো ক্ষতি নেই—কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।

১০. একই ব্যক্তিকে ষাটদিন খাওয়ালে সহীহ হবে না—খাদ্য শস্য বা তার মূল্য দেয়ার ব্যাপারেও তাই।

ফিদিয়া

কেউ যদি বার্ধক্যের কারণে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা এমন কঠিন পীড়ায় ভুগছে যে, বাহ্যত সুস্থ হওয়ার আশা নেই এবং তার রোযা রাখার শক্তি নেই। এমন অবস্থায় শায়িত এ ধরনের লোকের জন্যে রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছে। প্রত্যেক রোযার বদলে এক একজন দুঃস্থকে ফিদিয়া দেবে। ফিদিয়ার মধ্যে খানাও খাওয়ানো যেতে পারে, পরিমাণ মতো খাদ্য শস্যও দেয়া যেতে পারে অথবা তার মূল্যও দেয়া যেতে পারে।

ফিদিয়ার পরিমাণ

একজন ফকীরকে সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ খাদ্য শস্য দেয়া অথবা তার মূল্য দেয়া। প্রত্যেক রোযার বদলায় দু বেলা কোনো অভাবগ্রস্তকে খানা খাওয়ানোও দুরস্ত আছে। মধ্যম ধরনের খানা খাওয়াতে হবে।

ফিদিয়ার মাসায়েল

১. ফিদিয়া আদায় করা সত্ত্বেও যদি রোগী স্বাস্থ্যবান হয়ে যায় তাহলে রোযাগুলোর কাযা ওয়াজিব হবে। যে ফিদিয়া দেয়া হয়েছে তার আলাদা সওয়াব আল্লাহ্ দেবেন।

২. কারো যিম্মায় কিছু কাযা রোযা আছে। মৃত্যুর সময় সে অসিয়ত করে গেল যে, তার মাল থেকে যেন ফিদিয়া দিয়ে দেয়া হয়। কাযা রোযার মোট

ফিদিয়া যদি তার এ পরিত্যক্ত মালের এক-তৃতীয়াংশের পরিমাণ হয়[১] তাহলে ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। ফিদিয়ার মূল্য যদি অধিক হয় আর ১/৩ মালের পরিমাণ কম হয়, তাহলে ১/৩ মালের বেশী ফিদিয়া তখন জায়েয হবে যখন ওয়ারিশগণ খুশীয় হয়ে রাযী হবে। নাবালেগ বাচ্চাদের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই।

৩. মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে না থাকে এবং ওয়ারিশগণ আপন ইচ্ছায় যদি ফিদিয়া আদায় করে তাহলেও দুরস্ত হবে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ফিদিয়া কবুল করবেন।

৪. প্রতি ওয়াক্তের নামাযের ফিদিয়াও তাই, যা রোযার ফিদিয়া। মনে রাখতে হবে দিনে পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং তার সাথে বেতের নামায অর্থাৎ দৈনিক ছয় নামায।

৫. মৃত্যুর সময় কেউ নামাযের জন্যে ফিদিয়া দেয়ার অসিয়ত করলে তার হুকুম রোযার ফিদিয়ার মতোই হবে।

৬. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশ যদি নামায পড়ে বা রোযা রাখে, তাহলে তা দুরস্ত হবে না।

৭. সামান্য অসুখের জন্যে রমযানের রোযা কাযা করা অথবা এ ধারণা করা যে পরে কাযা আদায় করবে অথবা ফিদিয়া দিয়ে মনে করবে যে, রোযার হক আদায় হয়েছে–এমন মনে করা ঠিক নয়।

নবী (স) বলেন, যদি কেউ বিনা ওজরে অথবা রোগের কারণ ছাড়া একটা রোযাও ছেড়ে দেবে—সারা জীবন রোযা রাখলেও তার ক্ষতি পূরণ হবে না।–(তিরমিযি, আবু দাউদ)

রোযার বিভিন্ন হুকুম ও নিয়মনীতি

১. যে ব্যক্তি কোনো কারণে রোযা রাখতে পারলো না তার জন্যে এটা জরুরী যে, সে যেন প্রকাশ্যে খানাপিনা না করে এবং বাহ্যত রোযাদারের মতো হয়ে থাকে।

২. যার মধ্যে রোযা ফরয হওয়া ও সহীহ হওয়ার সকল শর্ত পাওয়া যায়, তার রোযা যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার জন্যে ওয়াজিব যে,

---

১. পরিত্যক্ত মাল বলতে সে মাল বুঝায় যা দাফন কাফনের ব্যয় ভার বহন এবং ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার পর যা বাঁচে। তার এক-তৃতীয়াংশ।

সে দিনে বাকী অংশ রোযাদারের মতো হয়ে থাকবে এবং খানাপিনা ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকবে।

৩. কোনো মুসাফির যদি দুপুরের পর বাড়ী পৌঁছে অথবা কোথাও মুকীম হওয়ার এরাদা করে তাহলে দিনের বাকী অংশ রোযাদারের মতো হয়ে থাকা এবং খানাপিনা থেকে বিরত থাকা তার জন্যে মুস্তাহাব হবে। এমনিভাবে কোনো স্ত্রীলোক যদি দুপুরের পর হায়েয বা নেফাস থেকে পাক হয় তাহলে তার জন্যেও মুস্তাহাব যে, সে দিনের বাকী অংশ খানাপিনা থেকে বিরত থাকবে।

৪. যদি কেউ ইচ্ছা করে রোযা নষ্ট করে অথবা কেউ রাত আছে মনে করে সুবেহ সাদেকের পর খানা খায়, তাহলে তার জন্যে ওয়াজিব হবে সারাদিন রোযাদারের মতো কাটানো এবং খানাপিনা থেকে বিরত থাকা।

৫. দুপুরের পর যদি কোনো শিশু বালেগ হয় অথবা কেউ যদি মুসলমান হয়, তাহলে তাদের জন্যে মুস্তাহাব এই যে, তারা বাকী দিনটুকু রোযাদারের মতো কাটাবে।

৬. রোযা রাখার পর যদি কোনো মেয়ে মানুষের হায়েয শুরু হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবে। কিন্তু তারপর তার উচিত রোযাদারের মতো খানাপিনা থেকে বিরত থাকা।

নফল রোযার ফযীলত ও মাসায়েল

শাওয়ালের ছ'রোযা

এ রোযার অনেক ফযীলত হাদীসে বয়ান করা হয়েছে। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো এবং পরপর শাওয়ালের ছ রোযা করলো, সে যেন হামেশা রোযা রাখলো।-(মুসলিম, আবু দাউদ)

নবী (স) আরও বলেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো এবং তারপর শাওয়ালের ছটি রোযা রাখলো সে গোনাহ থেকে এমন পাক হলো যেন তার মা তাকে আজই প্রসব করলো।-(মুসলিম, আবু দাউদ)

এটা জরুরী নয় যে, এ রোযাগুলো ঈদের পর একত্রে করতে হবে। একত্রেও করা যায় এবং মাঝে বাদ দিয়েও করা যায়।

তবে শাওয়ালের ছ তারিখে এ রোযা শুরু করা ভালো। তবে তা জরুরী নয়। পুরো মাসের মধ্যে যখনই সুবিধা হয় করা যেতে পারে।

আশুরার দিনের রোযা

মহররমের দশই তারিখকে ইয়াওমে আশুরা বা আশুরার দিন বলে। ঐ দিনে মক্কার কুরাইশরাও রোযা রাখতো এবং কা'বা ঘরে নতুন গেলাব চড়াতো। এ রোযাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি আরোপ করা হতো। নবী (স) নিজেও এ রোযা রাখতেন। তারপর যখন তিনি হিজরত করে মদীনায় এলেন তখন দেখলেন যে, ইহুদীরাও সে রোযা রাখছে। তখন তিনিও ঐদিন রোযা রাখলেন এবং সকল সাহাবীকে রোযা রাখার তাকীদ করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন তখন ইহুদীদেরকে আশুরার দিনে রোযা রাখতে দেখলেন। তিনি তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে এ দিনের কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখ ? তারা বললো, এ বড়ো মহত্বপূর্ণ দিন। এ দিনে আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে এবং তার জাতিকে নাজাত দান করেন ও ফেরাউন এবং তার লোক লস্করকে নিমজ্জিত করেন। এজন্যে মূসা (আ) আল্লাহর অনুগ্রহের শোকরগুজারির জন্যে ঐ দিন রোযা রাখেন। আমরাও এ জন্যে এ দিনে রোযা রাখি।

নবী (স) বলেন, মূসা (আ)-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক তোমাদের চেয়ে বেশী। আর আমরা এ জিনিসের বেশী হকদার যে এ দিন আমরা রোযা রাখি।

তারপর নবী (স) স্বয়ং সে দিন রোযা রাখলেন এবং উম্মতকেও রোযা রাখার হুকুম দিলেন।-(বুখারী, মুসলিম)

দশ তারিখের সাথে নয় তারিখ অথবা এগার তারিখ রোযা রাখা ভালো যাতে করে সেদিনের ফযীলতও লাভ করা যেতে পারে এবং ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্যও না হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) স্বয়ং এ রোযা রাখা শুরু করেন এবং সাহাবীদেরকেও রোযা রাখার তাকীদ করেন। তখন সাহাবীগণ আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ঐদিনকে তো ইহুদী-নাসারাগণ বড়ো দিন হিসেবে পালন করে। আমরা ঐদিনে রোযা রাখলে তো তাদের সাথে সাদৃশ্য হয়। তখন তিনি বলেন, সামনে বছর ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই তারিখে রোযা রাখবো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিন্তু সামনে বছর আসার পূর্বেই নবী (স) ইন্তেকাল করেন।-(মুসলিম)

আরাফাতের দিনের রোযা

হজ্জের মাসের নয় তারিখকে ইয়াওমে আরফা বা আরাফাতের দিন বলা হয়। হাদীসে এ দিনের রোযার অনেক ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। নবী (স)

বলেন, আমি আল্লাহর সত্তা থেকে এ আশা রাখি যে, আরাফাতের দিনের রোযা আগামী বছর ও গত বছর এ উভয় বছরের কাফ্ফারা বলে গণ্য হবে। – (তিরমিযি)

আরাফার দিনের রোযার সওয়াব এক হাজার দিনের রোযার সমান। – (তারগীব)

নবী (স) এ দিনে রোযার বড়ো যত্ন নিতেন। আরাফার দিনের আগের আট দিনের রোযারও বড়ো সওয়াব আছে। নবী (স) বলেন, "যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মত আল্লাহর নিকট কোনো দিনই এত প্রিয় নয়। এ দশ দিনের রোযা সারা বছর রোযা রাখার সমান এবং এসব রাতের নফল নামায শবে কদর–এর নফলের সমান।"

আইয়ামে বীযের রোযা

প্রত্যেক চাঁদ মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখকে আইয়ামে বীয বলে। এ হচ্ছে শুক্লপক্ষের বিশেষ কয়েকটি দিন। এগুলোকে বলা হয় আইয়ামে বীয–(উজ্জ্বল জ্যোস্না প্লাবিত তারিখগুলো)। নবী (স) এ দিনগুলোর রোযার বড়ো তাকীদ করতেন।

হযরত কাতাদাহ বিন মালহান (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে তাকীদ করতেন যে, আমরা যেন চাঁদের তের, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোযা রাখি। তিনি বলতেন, এ তিন রোযা সওয়াবের দিক দিয়ে হামেশা রোযা রাখার বরাবর।–(আবু দাউদ, নাসায়ী)

সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা

নবী (স) স্বয়ং সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন এবং সাহাবীগণকে রাখার তাকীদ করতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।–(তিরমিযি, নাসায়ী)

উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নবী (স) বলেন ঃ

"সোম ও বৃহস্পতিবার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। আমি চাই যে, যেদিন আমার আমল পেশ করা হয় সেদিন রোযা রাখি।"–(তিরমিযি)

একবার সাহাবীগণ নবী (স)-কে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বললেন ঃ

"ঐদিন আমার জন্ম হয়েছিল এবং ঐদিনই আমার ওপর কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়।"-(মুসলিম)

নফল রোযার বিভিন্ন মাসায়েল

১. নফল রোযা রাখার পর ওয়াজিব হয়ে যায়। কোনো কারণে নষ্ট হলে বা নষ্ট করলে কাযা ওয়াজিব হয়ে যায়।

২. বিনা ওজরে নফল রোযাও ভাঙা জায়েয নয়। অবশ্যি নফল রোযা ফরয রোযার তুলনায় সামান্য ওজরে ভাঙা যায়।

৩. কেউ রোযাদারকে খানার দাওয়াত করলো এবং মনে করা হলো যে, মেহমান না খেলে মেযবান অসন্তুষ্ট হবে অথবা সে মেহমানকে ছেড়ে খেতে রাজী হবে না অথবা না খেলে মেযবান মনে আঘাত পাবে এমন অবস্থায় রোযা ভাঙা জায়েয। কিন্তু রোযাদারের উচিত তার কাযা আদায় করা।

৪. মেয়েদের জন্যে রমযানের রোযা ছাড়া অন্য যে কোনো রোযা স্বামীর অনুমতি ছাড়া করা মাকরূহ তাহরীমী। যদি কেউ রাখে এবং তার স্বামী রোযা ভাঙতে বলে তাহলে ভেঙে দেয়া জরুরী। তারপর সে রোযার কাযাও স্বামীর অনুমতি নিয়ে করবে।

৫. যদি কেউ ঐসব দিনে রোযা রাখার মানত করে যেসব দিনে রোযা রাখা হারাম। যেমন, দু ঈদের দিন। তাহলে অন্য কোনো দিনে রাখবে।

৬. কেউ নফল রোযা রাখলো এবং তার বাড়ীতে মেহমান এলো। এখন সে যদি মেহমানের সাথে খানা না খায় তাহলে মেহমান অসন্তুষ্ট হবে। এমন অবস্থায় নফল রোযা ভাঙা জায়েয।

৭. কেউ ঈদের দিনে রোযার নিয়ত করলো এবং রোযা রাখলোও। তারও উচিত রোযা ভেঙে ফেলা এবং তার কাযা করা।

৮. রমযানের এক দু'দিন আগে রোযা রাখা ঠিক নয়। নবী (স) বলেন ঃ কেউ যেন রমযানের এক দু'দিন আগে রোযা না রাখে। কিন্তু যদি কেউ ঐদিন রোযা রাখতে অভ্যস্থ হয়, তাহলে রাখতে পারে।-(বুখারী)

তারাবীর নামাযের বয়ান

তারাবীহ তারবীহা শব্দের বহুবচন। তার অর্থ বিশ্রামের জন্যে একটুখানি বসা। পরিভাষায় তার অর্থ হলো রমযানুল মুবারকে রাতে যে সুন্নাত নামায

পড়া হয় তার চার রাকায়াত পর পর বিশ্রামের জন্যে বসা। যেহেতু ঐ বিশ রাকায়াত নামাযে পাঁচটি তারাবীহ্ করা হয়, সে জন্যে এ সুন্নাত নামাযকে তারাবীহ্ বলা হয়ে থাকে।

তারাবীর নামাযের হুকুম

তারাবীর নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। নবী (স) তার বিশেষ ব্যবস্থাপনা করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা)-ও। যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তারাবীহ্ পরিত্যাগ করবে সে গোনাহগার হবে। এ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। তারপর এটাও মনে রাখতে হবে, তারাবীর নামায রোযার অধীন নয়। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভুল যে, তারাবীহ্ পড়া জরুরী যদি সেদিন রোযা রাখা হয়। এ দুটি পৃথক পৃথক ইবাদাত। যারা কোনো ওজর বা অক্ষমতার কারণে রোযা রাখতে পারে না। যেমন কেউ রোগী অথবা সফরে রয়েছে, অথবা রোযা রাখেনি, অথবা মেয়ে মানুষ হায়েয-নেফাসের কারণে রোযা রাখেনি কিন্তু তারাবীর সময় পাক হয়ে গেছে—তাদের তারাবীহ্ পড়া উচিত। না পড়লে সুন্নাত পরিত্যাগ করার গোনাহ্ অপরিহার্য হবে।

তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত

নবী (স) শাবান মাসের শেষ দিনে রমযান মাসের আগমনীকে খোশ আমদেদ জানিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এ মাসে একটি রাত এমন আছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এ মাসে রাতের বেলায় আল্লাহ তায়ালা তারাবীহ্ নামায পড়া নফল করে দিয়েছেন।[১] যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো কাজ স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টি সহকারে করবে, তার প্রতিদান ও সওয়াব এতো হবে—যতোটা অন্যান্য মাসের ফরয ইবাদাতের হয়।[২]

নবী (স) আর একটি হাদীসে একে মাগফেরাতের উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি রমযানের রাতগুলোতে ঈমানী প্রেরণা এবং আখেরাতের প্রতিদানের নিয়তে তারাবীহ্ নামায পড়লো, তার কৃত সকল গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।"-(বুখারী, মুসলিম)

তারাবীহ্ নামাযের সময়

যে রাতে রমযানের চাঁদ দেখা যাবে সে রাত থেকে তারাবীহ্ শুরু হয়। ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা গেলে তারাবীহ্ বন্ধ হয়ে যায়। তারাবীহ্ নামাযের

---

১. অর্থাৎ ফরয নয়, সুন্নাত। এজন্যে যে ফরযের মুকাবেলায় সুন্নাত-মুস্তাহাব সবকেই নফল বলা হয়।

২. মিশকাত-বর্ণনাকারী সালমান ফারসী (র)। এ এক দীর্ঘ বর্ণনা। এখানে কিছুটা অংশ নকল করা হয়েছে।

সময় এশার নামাযের পর থেকে শুরু হয় এবং ফজরের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। যদি কেউ এশার নামাযের পূর্বে তারাবীহ পড়ে তাহলে তারাবীহ হবে না। যদি কেউ এশার নামাযের পর তারাবীহ পড়ে এবং কোনো কারণে এশার নামায পুনরায় পড়তে হয়, তাহলে তারাবীহ পুনরায় পড়তে হবে।-(দুররে মুখতার)

অবশ্যি এক-তৃতীয়াংশ রাতের পর মধ্য রাতের আগেই তারাবীর নামায পড়া মুস্তাহাব। মধ্য রাতের পর পড়া জায়েয হলেও আগেভাগে পড়ার যে নীতি তার খেলাপ হবে।[১]

তারাবীহ নামাযের জামায়াত

নবী (স) রমযানে তিন রাত ২৩, ২৫ এবং ২৭শে রাত তারাবীহ নামায জামায়াতে পড়িয়েছেন। তারপর যখন তিনি সাহাবীদের মধ্যে বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুরাগ লক্ষ্য করলেন তখন মসজিদে এলেন না। সাহাবায়ে কেরাম (রা) মনে করলেন তিনি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তাঁরা তাঁর দরজায় আওয়াজ দিতে লাগলেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের উৎসাহ উদ্দীপনায় আরও বরকত দিন। আমি এ আশংকায় বাইরে যাইনি যে, কি জানি এ নামায তোমাদের ওপর ফরয হয়ে না যায় এবং হামেশা তোমরা তা পালন করতে না পার। এজন্যে তোমরা এ নামায ঘরেই পড়তে থাক, কারণ নফল নামায ঘরে পড়াতে বেশী সওয়াব ও বরকতের কারণ হয়।-(বুখারী)

এ হাদীস থেকে এতোটুকু প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং নবী পাক (স) তিন রাত জামায়াতে তারাবীহ পড়িয়েছেন। অবশেষে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা) রীতিমতো তার জামায়াত কায়েম করেন এবং সাহাবায়ে কেরাম নতশিরে তা

---

১. তারাবীর উৎকৃষ্ট সময় কোন্‌টি—এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) বড়ো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি পেশ করেন। তিনি বলেন ঃ এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, তারাবীর উৎকৃষ্ট সময় কোন্‌টা। এশার সময়, না তাহাজ্জুদের সময়? উভয়ের সপক্ষে যুক্তি রয়েছে। কিন্তু বেশী আগ্রহ দেখা যায়-শেষ সময়ের দিকে। কিন্তু প্রথম সময়কে প্রাধান্য দেয়ার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি এই যে, মুসলমানগণ সমষ্টিগতভাবে প্রথম সময়েই তারাবীহ পড়তে পারে। শেষ সময় অবলম্বন করা হলে উম্মতের বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠ এ সওয়াব থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে এবং তা বিরাট ক্ষতির বিষয় হবে। যদি কিছু নেক লোক শেষ সময়ের ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে প্রথম ওয়াক্তের জামাতে শরীক না হয়, তাহলে এ আশংকা হতে পারে যে, জনসাধারণ হয়তো এসব নেক লোকের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবে-অথবা তাদের জামায়াতে শরীক না হওয়ার কারণে জনসাধারণ নিজেরাই তারাবীহ পড়া ছেড়ে দেবে। অথবা ঐসব নেক লোকদেরকে তাদের তাহাজ্জুদ পড়ার ঢাক-ঢোল পেটাতে হবে।-(রাসায়েল ও মাসায়েল, তৃতীয় খণ্ড, ২৩১ পৃঃ)

মেনে নেন। পরবর্তীকালে কোনো খলীফাই এ সুন্নাতের বিরোধিতা করেননি। এ জন্যে আলেম সমাজ এ জামায়াতকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কেফায়া বলেছেন।[১]

তারাবীহ নামাযের রাকায়াতসমূহ

সাহাবীগণের ইজমা থেকে প্রমাণিত যে, তারাবীহ নামায বিশ রাকায়াত। বিশ রাকায়াত এভাবে পড়তে হবে যে, দু' দু' রাকায়াতের পর সালাম ফিরাতে হবে এবং প্রত্যেক চার রাকায়াত পর বিশ্রামের জন্যে এতোটা সময় বসতে

---

১. তারাবীর নামাযের জামায়াত সম্পর্কে এক ব্যক্তি আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-কে প্রশ্ন করেন। তিনি বিশদভাবে তার জবাব দেন এবং বিষয়টির ওপর ভালোভাবে আলোচনা করেন। নিম্নে প্রশ্ন ও তার জবাব দেয়া হলো :

প্রশ্ন : ওলামায়ে কেরাম সাধারণত বলে থাকেন যে, তারাবীহ আউয়াল ওয়াক্তে (এশার সাথে) পড়া ভালো এবং তারাবীহ জামায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কেফায়া। অর্থাৎ যদি কোনো মহল্লায় জামায়াতসহ তারাবীহ পড়া না হয়, তাহলে মহল্লাবাসী গোনাহগার হবে। আর যদি দুজন মিলেও মসজিদে তারাবীহ পড়ে তাহলে সকলের পক্ষ থেকে জামায়াত ত্যাগের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। একথা কি ঠিক? যদি তাই হয়। তাহলে হযরত আবু বকর (রা)-এর যামানায় কেন তা হয়নি? তাহলে সে সময়ের মুসলমানদের ওপর কি হুকুম হবে? জামায়াত সহ তারাবীহ না পড়ার কারণে তাঁরা কি গোনাহগার ছিলেন?

জবাব : নবী (স)-এর যামানা থেকে শুরু করে হযরত ওমর (রা)-এর প্রাথমিক কাল পর্যন্ত রীতিমতো এক জামায়াতে সকল লোকের তারাবীহ পড়ার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। বরঞ্চ লোক হয়তোবা আপন আপন ঘরে পড়তো কিংবা মসজিদে আলাদা আলাদাভাবে ছোট ছোট জামায়াত করে পড়তো। হযরত ওমর (রা) যাকিছু করেন তাহলো এই যে, এ বিচ্ছিন্নতা দূর করে সকলকে একটি জামায়াতের আকারে নামায পড়ার হুকুম দেন। তার জন্যে হযরত ওমর (রা)-এর নিকটে এ অকাট্য যুক্তি ছিল যে, নবী (স) এ ধারাবাহিকতা একথা বলে বন্ধ করে দেন যে, তা কোনো দিন ফরয না হয়ে যায়। তারপর নবী (স)-এর অতীত হওয়ার পর এ আশংকা আর রইলো না যে, কোনো কাজের দ্বারা এ জিনিস ফরয বলে গণ্য হবে। এজন্যে হযরত ওমর (রা) সুন্নাত হিসেবে তা জারী করেন। এ ছিল হযরত ওমর (রা)-এর দীন সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞার এক অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, তিনি শরীয়াত প্রণেতার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যার ফলে তিনি উম্মতের মধ্যে একটা সঠিক তরীকা প্রচলিত করে দেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মধ্যে কারো এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন না করা, বরঞ্চ তা নতশিরে মেনে নেয়া একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি শরীয়াত প্রণেতার উদ্দেশ্য সঠিকভাবেই পূরণ করেছেন যে, তাকে যেন ফরযের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া না হয়।

অন্ততঃপক্ষে একবার তো তাঁর তারাবীতে শরীক না হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। একবার তিনি আবদুর রহমান বিন আবদের সাথে বাইরে বের হয়ে মসজিদে লোকদেরকে তারাবীহ পড়তে দেখে তার প্রশংসা করেন। যার ভিত্তিতে আলেম সমাজ একথা বলেন যে, যে বস্তিতে মোটেই তারাবীর নামায জামায়াতসহ পড়া হয় না সে মহল্লার সকল লোক গুনাহগার হবে, তাহলে এই যে, তারাবীহ ইসলামের এমন একটি সুন্নাত যা খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে গোটা উম্মতের মধ্যে প্রচলিত আছে, ইসলামের এমন এক পদ্ধতি পরিত্যাগ করা এবং বস্তির সব লোক মিলে পরিত্যাগ করা দীন থেকে বেপরোয়া হওয়ার আলামত। তা যদি মেনে নেয়া যায় তাহলে ক্রমশ তার থেকে ইসলামের সকল রীতি পদ্ধতি মিটে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

হবে যতোটা সময়ে চার রাকায়াত পড়া যায়। বিশ্রামের জন্যে এতোটুকু সময় বসা মুস্তাহাব। তবে যদি অনুভব করা হয় যে, মুক্তাদীগণ এতোক্ষণ বসতে পেরেশানি বোধ করেন তাহলে ততোক্ষণ না বসা ভালো। এ ব্যাপারে মুক্তাদীদের ভাবাবেগের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

আহলে হাদীসের মতে আট রাকায়াত তারাবীহ পড়া সুন্নাত। তাঁদের মতে বিশ রাকায়াত পড়া সুন্নাত থেকে প্রমাণিত নয়। তাঁদের মতে অধিকাংশ রেওয়ায়েতে আট রাকায়াতের এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর যে রেওয়ায়েতে বিশ রাকায়াতের কথা বলা হয়েছে তা অন্যান্য হাদীসগুলোর তুলনায় দুর্বল। আল্লামা মওদূদী (র)-এ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেন তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

হযরত ওমর (রা)-এর যামানায় যখন জামায়াতের সাথে তারাবীহ পড়ার সিলসিলা শুরু হলো—তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমেই বিশ রাকায়াত পড়া হতো। হযরত ওসমান গনী (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর যামানায়ও এ নিয়ম মেনে চলা হয়। তিনজন খলীফার এ বিষয় একমত হওয়া এবং এ ব্যাপারে মতবিরোধ না করা একথারই প্রমাণ যে, নবী (স)-এর যুগ থেকেই লোক বিশ রাকায়াত পড়তেই অভ্যস্ত ছিল। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) বিশ রাকায়াতের পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করেন। এর সপক্ষে ইমাম মালেক (র)-এরও একটি উক্তি পাওয়া যায়। দাউদ যাহেরী (র) একে প্রমাণিত সুন্নাত বলে মেনে নিয়েছেন।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র) এবং আবান বিন ওসমান বিশের পরিবর্তে ছত্রিশ রাকায়াত পড়ার নিয়ম শুরু করেন। তার কারণ এ ছিল না যে, তাঁদের তাহকীক বা তত্তানুসন্ধান খোলাফায়ে রাশেদীনের তাহকীকের বিপরীত ছিল। বরঞ্চ তাদের লক্ষ্য ছিল যাতে করে সওয়াবের দিক দিয়ে মক্কার বাইরের লোক মক্কাবাসীদের সমান হতে পারে। মক্কাবাসীদের নিয়ম ছিল এই যে, তাঁরা তারাবীর প্রত্যেক চার রাকায়াত পর কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতেন। এ দু' বুযর্গ প্রত্যেক তাওয়াফের বদলে চার রাকায়াত পড়া শুরু করেন। এ নিয়ম যেহেতু মদীনাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যেহেতু ইমাম মালেক (র) মদীনাবাসীদের আমলকে সনদ মনে করতেন। সে জন্যে তিনি পরবর্তীকালে বিশ রাকায়াতের স্থলে ছত্রিশ রাকায়াতের ফতোয়া দেন।

চার রাকায়াত পর পর বিশ্রামের সময় কি আমল করা যায়

তারাবীহ বা বিশ্রামের সময় ইচ্ছা করলে কেউ চুপচাপ বসেও থাকতে পারে অথবা তাসবিহ পড়তে পারে এবং ইচ্ছা করলে নফল পড়তে পারে। মক্কা

মুয়ায্‌যমার লোক বসে থাকার পরিবর্তে তাওয়াফ করতেন। মদীনাবাসী চার রাকায়াত নফল পড়ে নিতেন। কতিপয় ফকীহ্ বলেন যে, তারাবীর সময় নিম্নের দোয়া পড়বে ঃ

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَايَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ-

"বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতা থেকে পাক ও পবিত্র। পাক ও মহান সেই সত্তা যিনি, সকল সম্মান, শ্রদ্ধা, মহত্ব, ভয়ভীতি, শক্তিমত্তা, বড়ত্ব ও পরাক্রমশীলতার অধিকারী। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি চিরজীবিত, যাঁর নিদ্রা ও মৃত্যু নেই। তিনি পাক পবিত্র ও ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধে। তিনি আমাদের রব এবং ফেরেশতাকুল ও জিবরাঈলের রব-প্রভু পরোয়ারদেগার। হে রব ! আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে নাযাত দাও।"

বেতের নামাযের জামায়াত

শুধু রমযান মাসে বেতের নামায জামায়াতে পড়া প্রমাণিত আছে। রমযান ছাড়া অন্য মাসে বেতের জামায়াতে পড়া জায়েয নয়।

وَلا يصلى الوتر بجماعة فى غير شهر رمضان عليها اجماع المسلمين - هداية

"রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসে বেতেরের জামায়াত নেই। এতে মুসলিম উম্মতের ইজমা রয়েছে।"-(হেদায়া)

যারা একাকী নামায পড়লো তারাও জামায়াতে বেতের পড়তে পারে। কিন্তু যারা তারাবীহ্ জামায়াতে পড়লো তাদের জন্যে বেতের জামায়াতে পড়া জরুরী। কারণ তারাবীর সুন্নাত নামায জামায়াতে পড়ার পর বেতেরের ওয়াজিব নামায একা পড়া দুরস্ত নয়। এটাও ঠিক নয় যে, তারাবীহ্ জামায়াতের সাথে পড়ে শুয়ে পড়বে এবং পরে তাহাজ্জুদের সাথে বেতের পড়বে।

তারাবীতে কুরআন খতম

রমযান মুবারকের পুরো মাসে একবার কুরআন পাক ক্রমানুসারে খতম করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।–(ইলমুল ফেকাহ্)

নবী (স) প্রতি বছর রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল আমীন (আ)-কে পুরো কুরআন শুনিয়ে দিতেন। যে বছর তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, সে বছর জিবরাঈলকে তিনি দু'বার কুরআন শুনিয়ে দেন। উম্মতকে তিনি এভাবে উদ্বুদ্ধ করেন ঃ

"রোযা ও কুরআনে মুমিনের জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার রব ! আমি এ ব্যক্তিকে দিনের বেলায় খানা-পিনা এবং অন্যান্য আনন্দ সম্ভোগ থেকে বিরত রাখলাম এবং সে বিরত থাকলো। অতএব হে আমার রব! এ লোকের পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুম এবং বিশ্রাম থেকে বিরত রেখেছি এবং সে তার মিষ্টি ঘুম ছেড়ে দিয়ে তোমার দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়তে থাকে। অতএব হে রব ! এ ব্যক্তির পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল কর। আল্লাহ্ এ উভয়ের সুপারিশ কবুল করবেন।"–(মিশকাত)

সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এ সুন্নাত যত্ন সহকারে পালন করেন। হযরত ওমর (রা) তারাবীহ্ নামায জামায়াত সহ পড়ার এবং এতে পুরো কুরআন শুনাবার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। দীন থেকে সাধারণ সম্পর্কহীনতা, লোকের অলসতা ও অমনোযোগিতার কারণে এ সুন্নাত ছেড়ে দেয়া কিছুতেই ঠিক নয়। অন্তত একবার তো তারাবীর মধ্যে পুরো কুরআন শুনার এবং শুনাবার ব্যবস্থাপনা অবশ্যই করা উচিত। আর যেখানে মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাবে, ইবাদাত ও কুরআন তেলাওয়াতে অনুরাগ দেখা যাবে এবং নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, কুরআন পাক পূর্ণ মনোযোগ ও আদবের সাথে থেমে থেমে এমনভাবে পড়া যাবে যে, তেলাওয়াতের হক আদায় হবে, সেখানে একাধিকবার খতম করাও পসন্দনীয় কাজ বলা হয়েছে। অবশ্যি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা ঠিক নয়। কারণ এ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতের হক আদায় করা যাবে না।

নবী (স)-এর তেলাওয়াতের ধরন হাদীসে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে —তিনি এক একটি অক্ষর সুস্পষ্ট করে এবং এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন। তিনি উম্মতকে তারতীলের সাথে এবং থেমে থেমে তেলাওয়াত করার ফযীলত বয়ান করতে গিয়ে বলেন–

কুরআন পাঠকারীদেরকে কেয়ামতের দিন বলা হবে—তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে থেমে থেমে খোশ এলাহানের সাথে সেজেগুজে কুরআন পড়তে, ঠিক তেমনিভাবে পড় এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময় এক স্তর ওপরে ওঠতে থাক। তোমার তেলাওয়াতের সর্বশেষ আয়াতের নিকটেই তোমার বাসস্থান পাবে।-(তিরমিযি)

জরুরী হেদায়াত

যদি কোথাও নামায ও কুরআনের প্রতি অনুরাগ অসাধারণ কম হয় এবং মুক্তাদীদের অলসতা ও অবহেলার কারণে এ আশংকা হয় যে, যদি তারাবীতে পুরো কুরআন খতম করার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তা শুধু লোকের ওপর বোঝাই হবে না, বরঞ্চ মসজিদে আসা এবং জামায়াতে নামায পড়া তারা এড়িয়ে চলতে থাকবে, এমন অবস্থায় খতমে কুরআনের ব্যবস্থা না করাই ভালো। তখন সংক্ষিপ্ত সূরা দিয়ে তারাবীহ পড়তে হবে যাতে করে তারাবীর সুন্নাত থেকে মানুষ বঞ্চিত না হয়। কিছু লোক জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তারাবীতে কুরআন শুনা এবং শুনানোকে আসল উদ্দেশ্য মনে করে। তারা তারাবীর নামাযে শান্ত পরিবেশ, ভারসাম্য এবং একাগ্রতার দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখে না। এসব লোক যখন তারাবীতে গোটা কুরআন অত্যন্ত দ্রুতবেগে শুনে, তখন তারা পুনরায় না তারাবীহ পড়ার প্রতি যত্ন নেয় আর না জামায়াতে তারাবীহ পড়ার জন্যে মসজিদে আসা প্রয়োজন মনে করে। এ ধরনের চিন্তা অত্যন্ত মারাত্মক। যদি পুরো কুরআন শুনার সুযোগ না হয়, অথবা কুরআন খতম হয়ে যায়, তারপরও তারাবীর নামায এক স্থায়ী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এর ব্যবস্থাপনায় কখনো অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

তারাবীহ্ নামাযের বিভিন্ন মাসায়েল

১. তারাবীর নিয়ত এভাবে করবে—দু' রাকায়াত সুন্নাত তারাবীর নিয়ত করছি। তারপর দু' রাকায়াতের নিয়ত। এমনিভাবে দশ সালাম সহ বিশ রাকায়াত পুরো করতে হবে।

২. তারাবীর পর বেতের পড়া উৎকৃষ্ট। কিন্তু কোনো কারণে যদি তারাবীহ পড়ার পূর্বে অথবা সমস্ত তারাবীহ পড়ার পূর্বে বেতের নামায পড়া হয়, তো জায়েয হবে।

৩. যদি কোনো মুক্তাদী বিলম্বে এলো এবং তার কিছু তারাবীহ বাকী থাকতে ইমাম বেতেরের জন্যে দাঁড়ালো, তাহলে তার উচিত ইমামের সাথে বেতের পড়া। তারপর বাকী তারাবীহ পরে পুরো করবে।

৪. চার রাকাআত পড়ার পর এতো সময় পর্যন্ত আরাম নেয়া মুস্তাহাব যতো সময়ে চার রাকায়াত পড়া হয়েছে। কিন্তু বেশীক্ষণ বসা যদি মুক্তাদীদের জন্যে কষ্টকর হয় তাহলে অল্প সময় বসা ভালো।

৫. যদি কেউ এশার ফরয না পড়ে তারাবীতে শরীক হয় তাহলে তার তারাবীহ দুরস্ত হবে না।

৬. যদি কেউ এশার ফরয জামায়াতে পড়লো এবং তারাবীহ জামায়াতে পড়লো না, তার জন্যেও বেতের নামায জামায়াতে পড়া দুরস্ত হবে।

৭. যদি কেউ এশার ফরয জামায়াতে পড়লো না, সে-ও বেতের নামায জামায়াতে পড়তে পারে।

৮. বিনা ওজরে বসে তারাবীহ পড়া মাকরূহ। অবশ্য ওজর থাকলে বসে পড়া দুরস্ত।

৯. কেউ এশার ফরয জামায়াতে পড়তে পারলো না, তার জন্যে তারাবীর নামায জামায়াতে পড়া জায়েয।

১০. ফরয ও বেতের এক ইমাম এবং তারাবীহ দ্বিতীয় কোনো ইমাম পড়াতে পারে। হযরত ওমর (রা) ফরয এবং বেতের স্বয়ং পড়াতেন এবং তারাবীহ পড়াতেন হযরত ওবাই বিন কায়াব (রা)।

১১. যদি তারাবীর কয়েক রাকায়াত কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা পুনরায় পড়া জরুরী। তখন কুরআন পাকের ঐ অংশও পুনরায় পড়া উচিত যা নষ্ট হওয়া রাকায়াতগুলোতে পড়া হয়েছে যাতে কুরআন খতম সহীহ নামাযে হয়।

১২. তারাবীতে দ্বিতীয় রাকায়াতে বসার পরিবর্তে ইমাম দাঁড়িয়ে গেল, যদি তৃতীয় রাকায়াতের সেজদার পূর্বে তার মনে পড়ে যায় অথবা কোনো মুক্তাদী মনে করিয়ে দেয় তাহলে ইমামের উচিত বসে যাওয়া এবং তাশাহুদ পড়ে এক সালাম ফিরিয়ে সেজদা সহু দেবে, তারপর নামায পুরো করে সালাম ফিরাবে। তাতে করে এ দু' রাকায়াত সহীহ হবে। আর যদি তৃতীয় রাকায়াতের সেজদা করার পর মনে পড়ে তাহলে এক

রাকায়াত তার সাথে মিলিয়ে চার রাকায়াত পুরো করবে। এ চার রাকায়াত দু' রাকায়াতের স্থলাভিষিক্ত হবে।

১৩. যদি ইমাম দ্বিতীয় রাকায়াতে কাদার জন্যে বসে পড়ে এবং তারপর তৃতীয় রাকায়াতের জন্যে দাঁড়িয়ে যায় এবং এ অবস্থায় চার রাকায়াত পুরো করে তাহলে চার রাকায়াতই সহীহ্ হবে।

১৪. যারা এশার নামায জামায়াতে পড়েনি তাদের জন্যে তারাবীহ্ জামায়াতে পড়া দুরস্ত নয়। এজন্যে যে ফরয নামায একা পড়ে নফল নামায জামায়াতে পড়লে নফলকে ফরযের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। তা দুরস্ত নয়।

১৫. কেউ যদি মসজিদে এমন সময়ে পৌঁছে যখন এশার ফরয হয়ে গেছে তাহলে সে প্রথমে ফরয পড়বে তারপর তারাবীতে শরীক হবে। তারাবীর যেসব রাকায়াত বাদ যাবে সেগুলো হয় বিরতির সময় পড়ে নেবে অথবা জামায়াতে বেতের পড়ার পর পড়বে।

১৬. কিছু লোক এশার ফরয নামায জামায়াতে পড়ার পর তারাবীহ্ জামায়াত করে পড়ছে। তাদের সাথে ঐসব লোকও শরীক হতে পারে যারা ফরয জামায়াতে পড়েনি। এজন্যে যে, এরা ঐসব লোকের অনুসরণ করছে যারা ফরয নামায জামায়াতে পড়ে তারাবীহ্ জামায়াতের সাথে পড়ছে।

১৭. যারা এশার নামায জামায়াতে পড়েনি—একা পড়েছে তারাও ঐসব লোকের সাথে বেতেরের জামায়াতে শরীক হতে পারে যারা ফরয নামায জামায়াতে পড়ে বেতের জামায়াতে পড়ছে।

১৮. আজকাল শবীনার যেরূপ রেওয়াজ হয়ে পড়েছে তা কিছুতেই জায়েয নয়। শবীনা পাঠকারী একান্ত বেপরোয়া হয়ে দ্রুতবেগে পড়ে যায়। তার না শুদ্ধ অশুদ্ধ পড়ার কোনো চিন্তা থাকে আর না তেলাওয়াতের আদবের দিকে সে খেয়াল করে। এ ধরনের কেরায়াত থেকে প্রভাব ও হেদায়াত গ্রহণ করার কোনো অনুভূতিই হয় না। কোনো প্রকারে খতম করাই হয় পাঠকারীর উদ্দেশ্য। তারপর মুক্তাদীদের অবস্থা এই হয় যে, কয়েকজন ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু অধিকাংশই কয়েক রাকায়াত মাত্র ইমা-মের সাথে পড়ে। অনেকে পেছনে বসে বসে গল্প করে। ইমামের দ্রুত পড়ার প্রশংসা করে এবং নানান ধরনের গল্প গুজব করে। এটা সে রাতের

নামায ও তেলাওয়াত নয় যা নবী (স) শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা সুন্নাত মনে করে সাবাহায়ে কেরাম রীতিমতো পালন করতেন। এ প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সাথে যুলুম ও বাড়াবাড়ি করা এবং তারাবীর বিদ্রূপ করা। কুরআন বলে ঃ

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ـ(ص ٢٩)

"এ কেতাব কল্যাণ ও বরকতের উৎস যা আমরা তোমার ওপর নাযিল করেছি যাতে লোক তার আয়াতগুলোর ওপর চিন্তা-গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানীগণ তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।"-(সূরা সাদ ঃ ২৯)

নবী (স) বলেন—যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করলো। সে কিছুতেই কুরআন বুঝলো না।-(তিরমিযি)

কুরআন বলে—যখন কুরআন পড়া হয় তখন পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তা শুনো।

১৯. তারাবীতে কুরআন পড়ার নিয়ম এই যে, কোনো এক সূরায় বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তে হবে। কারণ এ কুরআনের একটি আয়াত। পুরো কুরআন পাঠকারীকে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে এবং শ্রবণকারীকে শুনতে হবে। এজন্যে হাফেযকে উচ্চস্বরে পড়তে হবে। সাধারণত 'কুল হু আল্লাহ'-এর প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া হয়.। এটা জরুরী নয়। যে কোনো সূরার শুরুতে পড়া যায়। যে কোনো সূরার শুরুতে পড়া উচিত যাতে করে লোকের এ ভুল ধারণা দূর হয় যে, 'কুল হু আল্লাহ'-এর শুরুতে পড়তে হয়। যাদের মতে এ প্রত্যেক সূরায় একটি আয়াত তাদের উচিত তারাবীর নামাযে প্রত্যেক সূরার শুরুতে তা পড়বে। হানাফী মতে বিসমিল্লাহ কুরআন মজীদের একটি আয়াত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং মক্কা ও কুফার ক্বারীগণের মতে এ প্রত্যেক সূরার একটি আয়াত।

২০. কেউ কেউ তারাবীতে তিনবার 'কুল হু আল্লাহু' পড়ে।[১] তা পড়া মাকরূহ।

২১. কুরআন খতম করার পর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার কুরআন শুরু করা সুন্নাত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এ কাজ পসন্দ করেন যে, কেউ কুরআন খতম করলে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার শুরু করে أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ পর্যন্ত পড়বে।

১. কেউ বলেন-'কুল হু আল্লাহ' তিনবার পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু নামাযে নয়, নামাযের বাইরে।

কুরআন তেলাওয়াতের নিয়মনীতি

১। তাহারাত–পাক-পবিত্রতা

কুরআন পাক আল্লাহ পাকের পবিত্র ও মহান কালাম। তাতে হাত লাগাতে এবং তেলাওয়াত করার জন্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পুরোপুরি ব্যবস্থা দরকার। অযু না থাকলে অযু করা এবং গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করা অপরিহার্য।

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٥(واقعه ٧٩)

"তাতে সে ব্যক্তিই হাত লাগাতে পারে যে একান্ত পাক-পবিত্র।"

–(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৭৯)

হায়েয, নেফাস ও জানাবাতের (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় কুরআন শুনা তো জায়েয, কিন্তু পড়া এবং স্পর্শ করা হারাম। বিনা অযুতে পড়া জায়েয কিন্তু স্পর্শ করা ঠিক নয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) সকল অবস্থায় তেলাওয়াত করতেন এবং বিনা অযুতেও। কিন্তু জানাবাতের অবস্থায় কখনো তেলাওয়াত করতেন না। হযরত ওমর (রা) বলেন, হায়েয হয়েছে এমন নারী এবং গোসল ফরয হয়েছে এমন লোক কুরআন থেকে কিছুই পড়বে না (অর্থাৎ এমন অবস্থায় কুরআন পড়া হারাম)।–(তিরমিযি)

২। খাঁটি নিয়ত

কুরআন তেলাওয়াতের সময় নিয়ত খাঁটি হওয়া উচিত। তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য হতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং হেদায়াত চাওয়া। কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করা। নিজের খোশ এলহানের ওপর গর্ব করা, নিজের দীনদারীর ঢাকঢোল পেটানো, লোকে প্রশংসা করুক এমন বাসনা পোষণ করা নিকৃষ্ট ধরনের মানসিকতা। এমনিভাবে যারা মানুষ দেখানো কুরআন পড়ে অথবা দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্যে কুরআন পড়ে তারা কখনো কুরআন থেকে হেদায়াত লাভ করবে না। এসব লোক কুরআন পড়া সত্ত্বেও কুরআন থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে যে নিকৃষ্ট ধরনের মানসিকতা, অসৎ প্রবণতা এবং অসাধু উদ্দেশ্য পোষণ করে, তার মধ্যে কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে না কোনো অনুভূতির সঞ্চার হতে পারে, আর না কুরআনের পরিচয় ও নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করতে পারে।

৩। নিয়মিত পাঠ এবং একে অপরিহার্য মনে করা

কুরআন পাঠ দৈনিক নিয়মিতভাবে হওয়া উচিত। কোনো দিন বাদ না দিয়ে দৈনিক পড়া মুস্তাহাব। তেলাওয়াত যে কোনো সময়ে করা যায় কিন্তু

উপযুক্ত সময় হচ্ছে সকাল বাদ ফজর। যাদেরকে আল্লাহ্ কুরআন হিফয করার সৌভাগ্য দিয়েছেন তাদের তো দৈনিক পড়া এজন্যে নেহায়েত জরুরী যে, না পড়লে মনে থাকবে না। আর কুরআন পাক মুখস্থ করার পর ভুলে যাওয়া কঠিন গোনাহের কাজ। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাক মুখস্থ করেছে, তারপর ভুলে গিয়েছে, সে কেয়ামতের দিন কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হবে।-(বুখারী)

নবী (স) আরও বলেন-

কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করো, নতুবা এ তোমাদের বক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবে। আল্লাহর কসম, রশি ঢিল করলে যেমন উট পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনি সামান্য অবহেলা ও বেপরোয়া মনোভাবের জন্যে কুরআন বক্ষ থেকে বের হয়ে পালিয়ে যায়।-(মুসলিম)

নিয়মিত তেলাওয়াতের প্রেরণা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়লো এবং দৈনিক নিয়মিত তেলাওয়াত করতে থাকলো, তার দৃষ্টান্ত মিশ্‌কে পরিপূর্ণ থলিয়ার মতো যার সুগন্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়া শিখেছে কিন্তু তা তেলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত মিশকে পরিপূর্ণ বোতলের মতো যা কর্ক বা ছিপি দিয়ে বন্ধ করা আছে।-(তিরমিযি)

খোশ এলহানের সাথে তেলাওয়াত করার বিরাট সওয়াব বর্ণনা করতে গিয়ে নবী (স) বলেন, কেয়ামতের দিনে কুরআন পাঠকারীদের বলা হবে, তোমরা যেমন থেমে থেমে ও খোশ এলহানে দুনিয়ায় কুরআন পড়তে তেমনি পড় এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে এক একটি স্তর ওপরে ওঠতে থাক। তোমার ঠিকানা হবে তোমার শেষ আয়াতের নিকটে।-(দারেমী)

রাগ-রাগিনীসহ কুরআন পাঠ মাকরূহ তাহ্রীমী। এর থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪। কুরআন শুনার ব্যবস্থাপনা

উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ কুরআন শুনার ব্যবস্থাপনাও হওয়া উচিত। হযরত খালেদ বিন মাদান বলেন, কুরআন শুনার সওয়াব কুরআন পড়ার দ্বিগুণ। -(দারেমী)

নবী (স) অন্যের কুরআন পড়া শুনতে বড়ো ভালোবাসতেন। একবার তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-কে বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বললেন, হুজুর আপনাকে কুরআন শুনাবো ? কুরআন তো আপনার ওপরে নাযিল হয়েছে। নবী (স) বললেন, হ্যাঁ

শুনাও। কেউ পড়লে তা শুনতে আমার বড়ো ভালো লাগে। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) সূরা নিসা পড়া শুরু করলেন। যখন তিনি পড়লেন–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا○

"চিন্তা করে দেখ, তখন কি অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা নিয়ে আসব এবং তাদের ওপর তোমাকে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দাঁড় করাব।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪১)

তখন নবী (স) বললেন, থাম থাম।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম নবী (স)-এর দু চোখ দিয়ে পানি ঝরছে।–(বুখারী)

হযরত আবু মূসা (রা) খুব সুন্দর কুরআন পড়তেন। যখনই তাঁর সাথে হযরত ওমর (রা)-এর দেখা হতো, তিনি বলতেন, আবু মূসা, আমাকে আমার প্রভুর স্মরণ করিয়ে দাও। তখন আবু মূসা কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতেন। –(সুনানে দারেমী)

৫। চিন্তা-গবেষণা

কুরআন বুঝে শুনে পড়া, তার আয়াতগুলোর ওপরে চিন্তা-গবেষণা করা এবং তার দাওয়াত ও হেকমত আয়ত্ব করার অভ্যাস করা উচিত। এ সংকল্প নিয়ে তেলাওয়াত করা উচিত যে, তার আদেশগুলো মানতে হবে এবং নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহর কেতাব তো এজন্যেই নাযিল হয়েছে যে, তা বুঝে শুনে পড়তে এবং তার হুকুমগুলোর ওপর আমল করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ○

"যে কেতাব তোমার ওপরে নাযিল করেছিলাম তা বরকতপূর্ণ যাতে করে তারা এর আয়াতগুলোর ওপর চিন্তা-গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানীগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"–(সূরা সাদ ঃ ২৯)

ফর ফর করে দ্রুত কয়েক সূরা পড়ার চেয়ে অল্প কিছু চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝে পড়া অনেক ভালো। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন ঃ القدر এবং القرعه -এর মতো ছোট ছোট সূরা বুঝে পড়া অনেক ভালো—ফর ফর করে ال عمران এবং البقرة পড়ার চেয়ে।

নফল নামাযে এটাও জায়েয যে, কেউ একই সূরা অথবা একই আয়াত বার বার পড়বে। তার মর্মকথা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

করবে এবং মহব্বতের সাথে বার বার পড়বে। একবার নবী (স) একই আয়াত বারবার সারারাত পড়তে থাকেন এবং এভাবে ভোর হয়ে যায়। আয়াতটি হলো-

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

"হে রব ! তুমি যদি তাদেরকে আযাব দাও তাহলে এরা তো তোমার বান্দাহ। আর যদি ক্ষমা করে দাও তাহলে তুমি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৮)

অবশ্য কুরআনের অর্থ ও মর্ম না জেনে তেলাওয়াত করারও বিরাট সওয়াব রয়েছে কিন্তু যে তেলাওয়াতের দ্বারা অন্তরের পরিশুদ্ধি ও তাযকিয়া হয় এবং আমলে প্রেরণা সঞ্চার হয় তাহলো বুঝে শুনে পড়া। নবী (স) বলেন ঃ

লোহা যেমন পানিতে জং ধরে, তেমনি অন্তরে জং ধরে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তাহলে এ জং দূর করার উপায় কি ? নবী (স) বললেন, বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং কুরআন তেলাওয়াত করা।

তাওরাতে আছে, আল্লাহ বলেন, বান্দাহ ! তোমার লজ্জা করে না যে, যখন সফরে তোমার কাছে তোমার ভাইয়ের চিঠি আসে তখন তুমি থেমে যাও অথবা রাস্তা থেকে সরে গিয়ে বসে পড় এবং তার এক একটি অক্ষর পড়তে থাক ও তার ওপর চিন্তা-গবেষণা কর। আর এ কেতাব (তাওরাত) হচ্ছে আমার ফরমান যা তোমার জন্যে পাঠিয়েছি যাতে করে তুমি সবসময় চিন্তা-গবেষণা করতে পার এবং তার হুকুমগুলো মেনে চলতে পার। কিন্তু তুমি এটা মানতে অস্বীকার করছো এবং তার হুকুম মেনে চলতে গড়িমসি করছ-আর যদি তা পড় তো তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর না।-(কিমিয়ায়ে সায়াদাত)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, ইসলামের প্রথম যুগের লোকেরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন যে, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর ফরমান এবং তাঁর পক্ষ থেকে এ নাযিল হয়েছে। বস্তুত তাঁরা রাতের বেলায় গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং দিনের বেলায় তার হুকুমগুলো মেনে চলতেন। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তোমরা শুধুমাত্র তার শব্দগুলো পড় এবং অক্ষরগুলোর যের যবরও দুরস্ত কর। কিন্তু আমলের দিক দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তোমরা এ ব্যাপারে একেবারে পেছনে রয়েছ।-(কিমিয়ায়ে সায়াদাত)

৬। একনিষ্ঠা ও বিনয়

পূর্ণ একাগ্রতা, আগ্রহ ও বিনয় নিষ্ঠার সাথে কেবলা মুখী হয়ে তেলাওয়াত করা উচিত। তেলাওয়াতের সময় অবহেলা করে ও বেপরোয়া হয়ে, এদিক সেদিক তাকানো, কারো সাথে কথাবার্তা বলা, এমন কোনো কাজ করা যাতে একাগ্রতা নষ্ট হয় এসব কিছুই মাকরূহ বা অবাঞ্ছিত কাজ।

৭। তাউয-তাসমিয়া

তেলাওয়াত শুরু করার সময় اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া উচিত। মাঝে অন্য কোনো কাজের দিকে মন দিলে কিংবা কারো সাথে কথাবার্তা বললে পুনরায় اعوذ بالله পড়া উচিত। নামাযের বাইরে প্রত্যেক সূরার শুরুতে بسم الله পড়া মুস্তাহাব। শুধু সূরা তাওবার শুরুতে بسم الله না পড়া উচিত।

৮। প্রভাব গ্রহণ

তেলাওয়াতের সময় কুরআন পাকের বিষয়বস্তু থেকে প্রভাব গ্রহণ এবং তা প্রকাশ করা মুস্তাহাব।[১] যখন পুরস্কার এবং জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতের উল্লেখ করা হয় এবং মুমিনদেরকে রহমত ও মাগফিরাতের কল্যাণ ও নাজাতের, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দীদারের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন আনন্দিত হওয়া উচিত। আর যখন আল্লাহর রাগ ও গজব, জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তি, জাহান্নামবাসীর আর্তনাদ প্রভৃতির উল্লেখ সম্বলিত আয়াতগুলো পড়া হবে, তখন তার ভয়ে কাঁদা উচিত। যদি কান্না না আসে তো কান্নার চেষ্টা করতে হবে। নবী (স) তেলাওয়াতের সময় আযাবের আয়াত পড়ে দোয়া করতেন এবং ক্ষমা করে দেয়ার আয়াত পড়লে তাসবিহ পড়তেন।

৯। আওয়াজে ভারসাম্য

তেলাওয়াত অতি উচ্চস্বরে ও অতি নিম্নস্বরে নয় বরঞ্চ উভয়ের মাঝামাঝি স্বরে পড়তে হবে যেন নিজের মনও সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং শ্রোতাদের শোনার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাহলে চিন্তা-ভাবনার দিকে মন আকৃষ্ট হবে।

কুরআন বলে ঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا –(بنى اسرائيل : ١١٠)

"এবং নামায বেশী উচ্চস্বরে পড়ো না, আর না একেবারে নিম্নস্বরে। বরঞ্চ উভয়ের মাঝামাঝি স্বর অবলম্বন করবে।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০)

১. কিন্তু এ ব্যাপারে অত্যন্ত হুঁশিয়ার ও সজাগ থাকতে হবে। কারণ রিয়া মানুষের সকল নেক আমল বরবাদ করে দেয়।

১০। তাহাজ্জুদে তেলাওয়াতের বিশেষ যত্ন

তেলাওয়াত যখনই করা হোক না কেন তা প্রতিদান ও সওয়াবের বিষয় এবং হেদায়াতের কারণ হয়, কিন্তু বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত সবচেয়ে বেশী। আর একজন মুমিনের এটাই আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত যে, সে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করে। তাহাজ্জুদের মনোরম সময় রিয়া, প্রদর্শনী ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত ; লিল্লাহিয়াত ও আল্লাহর দিকে একমুখী হওয়ার উৎকৃষ্টতম এক পরিবেশ, বিশেষ করে মানুষ যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠা ও আন্তরিক আগ্রহ সহকারে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতে থাকে। নবী (স) তাহাজ্জুদে লম্বা তেলাওয়াত করতেন।

১১। কুরআন শরীফ দেখে তেলাওয়াতের বিশেষ যত্ন

নামায ছাড়া অন্য সময় কুরআন শরীফ দেখে দেখে তেলাওয়াত করলে অধিক সওয়াব ও উত্তম প্রতিদান পাওয়া যায়। একেতো তেলাওয়াত করার সওয়াব দ্বিতীয়তঃ কালামুল্লাহকে হাতে স্পর্শ করার এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সওয়াব ও বদলা।-(এতকান)

১২। ক্রমিক পদ্ধতির লক্ষ্য

কুরআনে যে ক্রমিক পদ্ধতি রয়েছে সূরাগুলো সে ক্রমানুসারে পড়া উচিত। অবশ্যি শিশুদের পাঠ সহজ করার জন্যে—এ ক্রমিক ধারা অবলম্বন না করে পড়া জায়েয, যেমন আমপারা সূরা নাস থেকে উল্টো দিকে সূরা নাবা পর্যন্ত পড়ানো হয়। তবে কুরআন পাকের ক্রমিক পদ্ধতির খেলাপ তেলাওয়াত করা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ।

১৩। মনের গভীর একাগ্রতা

অনেকে অযীফা ও যিকির আযকার গভীর একাগ্রতার সাথে করে থাকেন এবং ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত ততোটা একাগ্রতার সাথে করেন না। অথচ কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোনো যিকির-অযীফা হতে পারে না। এর চেয়ে ভালো তাযকিয়ায়ে নফসের (আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির) উপায় আর কিছু হতে পারে না, কুরআনের ওপরে অন্য কোনো অযীফাকে প্রাধান্য দেয়া দীনকে ভালোভাবে উপলব্ধি না করারই ফল এবং তা গোনাহও বটে। নবী (স) বলেন, বান্দাহ তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমেই আল্লাহর বেশী নিকটবর্তী হতে পারে।-(কিমিয়ায়ে সায়াদাত)

নবী (স) বলেন, আমার উম্মতের জন্যে সবচেয়ে ভালো ইবাদাত হচ্ছে তেলাওয়াতে কুরআন।

১৪। তেলাওয়াতের পর দোয়া

তেলাওয়াতের পর নিম্নের দোয়া পড়া সুন্নাত ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

"হে আল্লাহ ! তুমি কুরআনের অসিলায় আমার ওপর রহম কর, তাকে আমার পথপ্রদর্শক, নূর, হেদায়াত ও রহমত বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ ! তার মধ্যে যাকিছু ভুলে যাই তা স্মরণ করিয়ে দাও, আর যা জানি না তা শিখিয়ে দাও এবং আমাকে তাওফিক দাও যেন রাতের কিছু অংশে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তা তেলাওয়াত করতে পারি। আর হে রাব্বুল আলামীন তুমি তাকে আমার সপক্ষে দলীল-প্রমাণ বানিয়ে দাও।"

সিজদায়ে তেলাওয়াতের বয়ান

সিজদায়ে তেলাওয়াতের হুকুম

কুরআনে চৌদ্দটি[১] আয়াত এমন আছে যা পড়লে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়।[২] তা পুরো আয়াত পড়া হোক অথবা পূর্বাপর সহ সিজদার শব্দ[৩] পড়া হোক–সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। একে সিজদায়ে তেলাওয়াত বলে। নবী (স) বলেন ঃ

যখন কেউ সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করে তখন শয়তান এক ধারে বসে বিলাপ করতে থাকে এবং বলে হায় আফসোস, আদম সন্তানদের সিজদার হুকুম দেয়া হলে তারা সিজদা করলো এবং জান্নাতের হকদার হলো। আমাকে সিজদা করার হুকুম দেয়া হলে আমি অস্বীকার করে জাহান্নামের হকদার হলাম।–(মুসলিম, ইবনে মাজা)

সিজদায়ে তেলাওয়াতের স্থানগুলো

সূরা আরাফের ২০৬ আয়াত, সূরা রাদের ১৫ আয়াত, সূরা নহলের ৪৯, ৫০ আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈলের ১০৯ আয়াত, সূরা মরিয়মের ৫৮ আয়াত,

---

১. আহলে হাদীসের নিকটে পনেরো আয়াত। তারা সূরা হজ্জের ৭৭ আয়াতেও সিজদা করেন। শাফেয়ীদের মতেও তাই।

২. ইমাম আবু হানীফা ছাড়া অন্যান্যদের মতে সিজদায়ে তেলাওয়াত সুন্নাত।

৩. ঐসব আয়াতের উপর রেখা টানা থাকে।

সূরা হজ্জের ১৮ আয়াত, সূরা ফুরকানের ৬০ আয়াত, সূরা আন নামলের ২৫-২৬ আয়াত, সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদার ১৫ আয়াত, সূরা সাদের ২৪-২৫ আয়াত, সূরা হা-মীম সাজদার ৩৮ আয়াত, সূরা আন নাজমের ৬২ আয়াত, সূরা ইনশিকাকের ২০-২১ আয়াত এবং সূরায়ে আলাকের ১৯ আয়াত।

সিজদায়ে তেলাওয়াতের শর্ত

সিজদায়ে তেলাওয়াতের চারটি শর্ত ঃ

(অর্থাৎ নামাযের যেসব শর্ত, সিজদায়ে তেলাওয়াতেরও তাই। যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়, সেসব কারণে সিজদায়ে তেলাওয়াতও নষ্ট হয়।)

১. তাহারাত

শরীর পাক হওয়া। অর্থাৎ নাজাসাতে গালীযা থেকে পাক হতে হবে। নাজাসাতে হুকমী থেকে পাক হতে হবে। অযু না থাকলে অযু করতে হবে এবং গোসলের দরকার হলে গোসল করতে হবে।

০ পোশাক পাক হওয়া।

০ নামাযের স্থান পাক হওয়া।

২. সতর ঢাকা।

৩. কেবলার দিকে মুখ করা।

৪. সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ত করা।

অধিকাংশ আলেমের এ মত। কিন্তু কোনো কোনো আলেমের মতে সিজদায়ে তেলাওয়াতের জন্যে অযু থাকা জরুরী নয়। আহলে হাদীসের মতে অযুসহ সিজদায়ে তেলাওয়াত তো উত্তম কিন্তু বিনা অযুতেও জায়েয।

আল্লামা মওদূদী (র) এ সম্পর্কে নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ

এ সিজদার জন্যে অধিকাংশ আলেম ঐসব শর্তের পক্ষে যা নামাযের শর্ত। কিন্তু যতো হাদীস সিজদায়ে তেলাওয়াত সম্পর্কে পাওয়া যায় তার মধ্যে এসব শর্তের জন্যে কোনো দলিল নেই। তার থেকে এটাই মনে হয় যে, সিজদার আয়াত শুনার পর যে যেখানে যে অবস্থায় আছে সিজদাহ করবে তা অযু থাক বা না থাক, কেবলমুখী হওয়া সম্ভব হোক বা না হোক। যমীনের ওপর মাথা রাখার সুযোগ হোক বা না হোক। প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া যায় যারা এ পদ্ধতিতে আমল করেছেন। ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি পথ চলতে চলতে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। কোথাও সিজদার আয়াত এলে ব্যাস মাথা নত করতেন। অযু থাক

বা না থাক, কেবলামুখী থাকুন বা না থাকুন। এসব কারণে আমরা মনে করি যে, যদি কেউ অধিকাংশ আলেমগণের খেলাফ আমল করে তাহলে তাকে মন্দ বলা যাবে না। কারণ আলেম সাধারণের মতের সমর্থনে কোনো প্রমাণিত সুন্নাত নেই এবং প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকও পাওয়া যায় যাঁদের আমল আলেম সাধারণের মতের খেলাপ ছিল।–(তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, সূরা আল আরাফ, টীকা ১৫৭)

সিজদার জন্যে এ নিয়ত করা শর্ত নয় যে, এ সিজদা অমুক আয়াতের। আর যদি নামাযে সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করা হয় তো নিয়ত শর্ত নয়।

সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ম

কেবলামুখী দাঁড়িয়ে সিজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ত করতে হবে এবং আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যেতে হবে। সিজদা করার পর আল্লাহু আকবার বলে ওঠে দাঁড়াতে হবে। তাশাহুদ পড়ার ও সালাম ফেরানোর দরকার নেই।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, যখন তোমরা সিজদার আয়াতে পৌছবে তখন আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবে এবং মাথা উঠাবার সময় আল্লাহু আকবার বলবে।–(আবু দাউদ)

বসে বসেও সিজদায়ে তেলাওয়াত করা যায় তবে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়া মুস্তাহাব।

সিজদায়ে তেলাওয়াতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' ছাড়াও অন্য মসনুন তসবিহ পড়া যায়। কিন্তু ফরয নামাযে সিজদায়ে তেলাওয়াত করতে হলে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়া ভালো। অবশ্যি নফল নামায অথবা নামাযের বাইরে সিজদায়ে তেলাওয়াতে যে কোনো তসবিহ পড়া যায়। যেমন নিম্নের তসবিহ পড়া যেতে পারে ঃ

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ(ابو داود ـ ترمذی)

"আমার চেহরা সেই সত্তাকে সিজদা করছে যিনি তাকে পয়দা করেছেন এবং তার মধ্যে কান ও চোখ দিয়েছেন। এসব তাঁরই শক্তির দ্বারা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা মহত্ব ও বরকতের উৎস, যিনি সর্বোৎকৃষ্ট স্রষ্টা।"

সিজদায়ে তেলাওয়াতের মাসায়েল

১. সিজদায়ে তেলাওয়াত তাদের ওপর ওয়াজিব যাদের ওপর নামায ওয়াজিব। হায়েয নেফায হয়েছে এমন নারী এবং নাবালেগদের ওপর সিজদায়ে

তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। এমন বেহুঁশ লোকের ওপরও ওয়াজিব নয় যে একদিন এক রাতের বেশী বেহুঁশ রয়েছে।

২. সিজদার আয়াত নামাযে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে বিলম্বের অনুমতি নেই। নামাযের বাইরে সিজদার আয়াত পড়লে তৎক্ষণাৎ সিজদা করা ভালো। বিলম্বেও কোনো দোষ নেই। অবশ্যই বিনা কারণে বেশী বিলম্ব করা মাকরূহ।

৩. যদি নামাযে সিজদার আয়াত পড়া হয়। তাহলে এ সিজদা ঐ নামাযেই আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি সিজদার আয়াত পড়ে কেউ অন্য কোনো নামাযে সিজদা আদায় করে তাহলে জায়েয হবে না। যদি কেউ সিজদার আয়াত পড়ে নামাযের মধ্যে সিজদাহ্ করতে ভুলে যায় তাহলে তাওবা এস্তেগফার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। হ্যাঁ যদি এ নামায নষ্ট হয় তাহলে নামাযের বাইরে সিজদাহ্ করা যাবে।

৪. কেউ নামায পড়ছে বা পড়াচ্ছে। সে যদি অন্য কারো কাছে সিজদার আয়াত শুনে, তা সে অন্য লোক নামাযেই পড়ুক অথবা নামাযের বাইরে পড়ুক, তাহলে শ্রবণকারী নামাযী বা ইমামের ওপর সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হবে না।

৫. কোনো মুক্তাদী সিজদার আয়াত পড়লে, না ইমামের ওপর না মুক্তাদীর ওপর সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে।

৬. কেউ ইমামের নিকটে সিজদার আয়াত শুনলো কিন্তু সে এমন সময় জামায়াতে শামিল হলো যখন সিজদাহ্ করে ফেলেছে। তাহলে যদি সে ঐ রাকায়াত পেয়ে যায় যে রাকায়াতে ইমাম সিজদাহ্ করেছে তাহলে তারও সিজদাহ্ হয়ে যাবে। কিন্তু পরের রাকায়াতে শামিল হলে তাকে নামাযের পর সিজদাহ্ করতে হবে।

৭. কেউ যদি মনে মনে সিজদার আয়াত পড়ে, মুখে না পড়ে। অথবা শুধু লেখে অথবা এক এক অক্ষর পড়ে, তাহলে সিজদা ওয়াজিব হবে না।

৮. যদি একই স্থানে সিজদার আয়াত বার বার পড়ে তাহলে একই সিজদাহ দিতে হবে। আর যদি কয়েক সিজদার আয়াত পড়ে তাহলে যতো আয়াত পড়বে ততো সিজদাহ করতে হবে। আবার এক আয়াত কয়েক স্থানে পড়লে যতো স্থানে পড়বে ততোবার সিজদাহ করতে হবে।

৯. তেলাওয়াতের সময় সকল শ্রোতার যদি অযু থাকে, তাহলে সিজদার আয়াত উচ্চৈস্বরে পড়া ভালো। কিন্তু বিনা অযুতে থাকলে অথবা সিজদাহ করার অবকাশ না থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে পড়া ভালো এজন্য যে, তারা অন্য সময়ে সিজদাহ করতে ভুলে যেতে পারে এবং গুনাহগার হবে।

১০. সিজদার আয়াতের আগে এবং পরের আয়াত পড়া এবং সিজদার আয়াত বাদ দেয়া অথবা পুরো সূরা পড়া এবং সিজদার শেষ আয়াত বাদ দেয়া মাকরূহ।

১১. কিছু নাদান লোক কুরআন পড়তে পড়তে সিজদার আয়াতে পৌঁছলে কুরআনের ওপরেই সিজদাহ করে। এভাবে সিজদাহ আদায় হবে না। সিজদায়ে তেলাওয়াত ঐভাবে আদায় করা উচিত যা ওপরে বলা হয়েছে।

১২. সিররী (যা আস্তে পড়া হয়) নামাযগুলোতে এমন সূরা পড়া উচিত নয় যাতে সিজদাহ আছে। এমনি জুমা ও দু' ঈদের নামাযে পড়া উচিত নয় যেখানে বিরাট জামায়াত হয়। তাহলে মুক্তাদীদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি এবং নামায নষ্ট হবে।

শুকরানা সিজদাহ্

যখন কেউ কোনো শুভ সংবাদ শুনে অথবা আল্লাহর রহমতে কোনো বিরাট নিয়ামত লাভ করে অথবা কোনো ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করে অথবা কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় অথবা কোনো বিপদ-মুসিবত দূর হয়ে যায় তখন আল্লাহর ফজল ও করমের জন্যে শুকরানা সিজদাহ্ আদায় করা মুস্তাহাব। কিন্তু এ সিজদাহ্ নামাযের সাথে সাথেই না করা উচিত। নতুবা অজ্ঞ লোক একে নামাযের অংশ মনে করতে থাকবে অথবা এটা সুন্নাত মনে করে পালন করতে থাকবে। এ নামায থেকে পৃথক সিজদাহ। এজন্যে তা এমনভাবেই করা উচিত যাতে কারো কোনো সন্দেহ না থাকে। হযরত আবু বকর (রা) বলেন, নবী (স) যখন কোনো ব্যাপারে খুশী হতেন অথবা কোনো সুসংবাদ শুনতেন তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্যে সিজদাহ করতেন।–(তিরমিযি)

কোনো কোনো লোক বেতেরের পর দু' সিজদাহ করে এবং তা সুন্নাত মনে করে–এটা ভুল। সুন্নাত মনে করে তা করা ভুল এবং ত্যাগ করা উচিত।

এতেকাফের বয়ান

এতেকাফের অর্থ

অভিধানে কোনো স্থানে আটকে পড়া অথবা কোনো স্থানে থেমে যাওয়াকে এতেকাফ বলে। শরীয়াতের পরিভাষায় এতেকাফের অর্থ কোনো লোকের দুনিয়ার সংস্রব, সম্বন্ধ ও বিবি বাচ্চা থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে অবস্থান করা।

এতেকাফের মর্মকথা

এতেকাফ হচ্ছে এই যে—মানুষ দুনিয়াবী কারবার ও সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সাংসারিক কর্ম ব্যস্ততা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিন্তা ও কাজের শক্তি এবং যোগ্যতাকে আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদাতে লাগিয়ে দেবে। তারপর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর প্রতিবেশী হয়ে পড়বে। এ কাজের দ্বারা একদিকে সে ব্যক্তি সকল প্রকার বেহুদা কথাবার্তা ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে এবং অন্যদিকে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক মজবুত হবে। তার নৈকট্য লাভ করবে এবং তাঁর ইয়াদ ও ইবাদাতে মনে শান্তি লাভ করবে। কয়েকদিনের তরবিয়াতের এ আমল তাঁর মনের ওপর এমন গভীর ছাপ ফেলবে যে, চারিদিকে দুনিয়ার রং তামাশা ও মন ভুলানো বস্তুসমূহ দেখার পরও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত রাখতে পারবে। আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচতে পারবে এবং তার হুকুম পালন করে মনে আনন্দ অনুভব করবে। এমনিভাবে সমগ্র জীবন আল্লাহর বন্দেগীতে কাটিয়ে দেবে।

এতেকাফের প্রকারভেদ

এতেকাফ তিন প্রকার—ওয়াজিব, মুস্তাহাব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

ওয়াজেব এতেকাফ

মানতের এতেকাফ ওয়াজিব। কেউ এমনি এতেকাফের মানত করলো অথবা কোনো শর্তসহ মানত করলো-যেমন কেউ বললো, যদি আমি পরীক্ষায় পাশ করি, অথবা যদি আমার অমুক কাজ হয়ে যায় তাহলে এতেকাফ করবো। তাহলে এ এতেকাফ ওয়াজিব হবে এবং তা পূরণ করতে হবে।

মুস্তাহাব এতেকাফ

রমযানের শেষ দশদিন ব্যতিরেকে যতো এতেকাফ করা হবে তা মুস্তাহাব হবে—তা রমযানের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দশদিনে অথবা যে কোনো মাসে করা হোক।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ এতেকাফ

রমযানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করা সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ্ কেফায়া। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে সামষ্টিকভাবে এ সুন্নাতের ব্যবস্থাপনা করা উচিত। কারণ হাদীসগুলোতে এ বিষয়ে তাকীদ করা হয়েছে। কুরআন পাকে আছে ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ

"আপন স্ত্রীদের সাথে মিলিত হইও না যখন তোমরা মসজিদে এতেকাফে থাকবে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

নবী (স) নিয়মিতভাবে প্রতি বছর এতেকাফ করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তা পালন করেন। একবার কোনো কারণে এতেকাফ করতে পারেননি বলে পরের বছর বিশদিন পর্যন্ত এতেকাফ করেন। এজন্যে মুসলমানগণ যদি সামষ্টিকভাবে এ সুন্নাত পরিত্যাগ করে তাহলে গোনাহগার হবে। যদি বস্তির কিছু লোকও এ সুন্নাত পালনের ব্যবস্থাপনা করে তাহলে, যেহেতু তা সুন্নাতে কেফায়া, এ অল্প লোকের এতেকাফ সকলের জন্যে যথেষ্ট হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে যদি গোটা মুসলিম সমাজ এর থেকে বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং নবীর এ প্রিয় সুন্নাতটি একেবারে মিটে যায়।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) প্রতি রমযানের শেষ দশদিন এতেকাফ করতেন। এ আমল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে। তাঁর এন্তেকালের পর তাঁর বিবিগণ এতেকাফের নিয়ম পালন করেন।-(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (স) রমযানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। এক বছর তিনি এতেকাফ করতে পারেননি। সে জন্যে পরের বছর বিশদিন এতেকাফ করেন।-(তিরমিযি)

সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এতেকাফ

মসজিদুল হারামে এতেকাফ করলে তা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এতেকাফ। তারপর মসজিদে নববীতে এবং তারপর বায়তুল মাকদেসে। তারপর উৎকৃষ্ট এতেকাফ হয় কোনো জামে মসজিদে করলে যেখানে রীতিমতো জামায়াতে নামায হয়। তারপর মহল্লার মসজিদে যেখানে জামায়াতে নামায হয়।

এতেকাফের শর্ত

এতেকাফের চারটি শর্ত রয়েছে যা ব্যতিরেকে এতেকাফ সহীহ হবে না।

১। মসজিদে অবস্থান

পুরুষের জন্যে জরুরী যে, সে মসজিদে এতেকাফ করবে তাতে পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতসহ নামায হোক বা না হোক।[১] মসজিদ ছাড়া পুরুষের এতেকাফ সহীহ হবে না।

২। নিয়ত

অন্যান্য ইবাদাতের জন্যে যেমন নিয়ত শর্ত তেমনি এতেকাফের জন্যেও নিয়ত শর্ত। নিয়ত ছাড়া এতেকাফ হবে না। নিয়ত ছাড়া এমনি যদি কেউ মসজিদে অবস্থান করে তাহলে এ অবস্থান এতেকাফ হবে না। তারপর এটাও ঠিক যে ইবাদাতের নিয়ত তখন মাত্রই সহীহ হতে পারে যখন নিয়তকারী মুসলমান হয়। তার জ্ঞান থাকতে হবে। বেহুঁশ বা পাগলের নিয়ত ধরা যাবে না।

৩। হাদাসে আকবর থেকে পাক হওয়া

অর্থাৎ নারী পুরুষের গোসল ফরয হলে তা করে শরীর পাক করে নেবে এবং নারী হায়েয নেফাস থেকে পাক হবে।

৪। রোযা

এতেকাফে রোযা রাখাও শর্ত। অবশ্যি তা শুধু ওয়াজিব এতেকাফের জন্যে। মুস্তাহাব এতেকাফের জন্যে রোযা শর্ত নয়। আর সুন্নাত এতেকাফের জন্যে রোযা শর্ত এজন্য নয় যে, তাও রমযান মাসেই করতে হবে।

এতেকাফের নিয়মনীতি

১. ওয়াজিব এতেকাফ অন্ততপক্ষে একদিনের জন্যে হতে পারে। তার কম সময়ের জন্যে হবে না। এজন্যে ওয়াজিব এতেকাফে রোযা শর্ত।

২. ওয়াজিব এতেকাফে রোযা শর্ত বটে। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, সে রোযা খাস করে এতেকাফের জন্যে করতে হবে। যেমন কেউ রমযান মাসে এতেকাফের মানত করলো। তাহলে এ এতেকাফ সহীহ হবে। রমযানের রোযাই এতেকাফের জন্যে যথেষ্ট। অবশ্যি এটা জরুরী যে এতেকাফে যে রোযা রাখা হবে তা ওয়াজিব হতে হবে, নফল নয়।

---

১. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর নিকটে এটা জরুরী যে, যে মসজিদে জামায়াত হয় তাতে এতেকাফ করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে প্রত্যেক মসজিদেই এতেকাফ দুরস্ত হবে। সে যুগে এর ওপরেই ফতোয়া হয়।–(দুররুল মুখতার)

৩. ওয়াজিব এতেকাফের মুদ্দত কমপক্ষে একদিন এবং বেশী যতো ইচ্ছা হতে পারে।

৪. মুস্তাহাব এতেকাফের কম মুদ্দত নির্ধারিত নেই, কয়েক মিনিটের এতেকাফও হতে পারে।

৫. ওয়াজিব এতেকাফের জন্যে যেহেতু রোযা শর্ত সেজন্যে কেউ যদি রোযা না রাখার নিয়ত করে তবুও রোযা রাখা অপরিহার্য হবে এবং এজন্যে যদি কেউ শুধু রাতের জন্যে এতেকাফের নিয়ত করে তা অর্থহীন হবে।

৬. যদি কেউ রাত ও দিনের এতেকাফের নিয়ত করে অথবা কয়েক দিনের এতেকাফের নিয়ত করে তাহলে রাত তার মধ্যে শামিল মনে করতে হবে এবং রাতেও এতেকাফ করতে হবে। তবে যদি এক দিনের এতেকাফের মানত করা হয় তাহলে সারাদিনের এতেকাফ ওয়াজিব হবে রাতের এতেকাফ ওয়াজিব হবে না।

৭. মেয়েদের নিজ ঘরেই এতেকাফ করা উচিত। তাদের মসজিদে এতেকাফ করা মাকরূহ তানযিহী। সাধারণত ঘরে যে স্থানে তারা নামায পড়ে তা পর্দা দিয়ে ঘিরে নেবে এবং এতেকাফের জন্যে তা নির্দিষ্ট করে নেবে।

৮. রমযানের শেষ দশদিনে যেহেতু এতেকাফ সুন্নাতে মুয়াক্‌দাহ্ কেফায়া, এজন্যে সেটা করা উচিত যাতে বাড়ির কিছু লোক অবশ্যই এর ব্যবস্থা করতে পারে। যদি এর প্রতি অবহেলা করা হয় এবং মহল্লার কেউ যদি এতেকাফ না করে তাহলে সকলেই গোনাহগার হবে।

৯. ওয়াজিব এতেকাফ যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে তার কাযা ওয়াজিব হবে। অবশ্যি সুন্নাত মুস্তাহাব এতেকাফের কাযা নেই।

এতেকাফের মসনুন সময়

এতেকাফের মসনুন সময় রযমানের ২০ তারিখ সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছু পূর্ব থেকে শুরু হয় এবং ঈদের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। তা চাঁদ ২৯শে রমযান উদয় হোক না কেন অথবা ৩০শে রমযানে যে কোনো অবস্থায় মসনুন এতেকাফ পূর্ণ হয়ে যাবে।

এতেকাফকারী ২০শে রমযান সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে পৌঁছবে এবং মেয়ে মানুষ হলে বাড়ীর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে যা সে নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছে। ঈদের চাঁদ উদয় না হওয়া পর্যন্ত এতেকাফের স্থান থেকে বের হবে না। তবে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে, যেমন পেশাব-পায়খানা অথবা ফরয গোসল

প্রভৃতি কাজে অথবা শরীয়াতের প্রয়োজন যেমন জুমার নামায প্রভৃতির জন্যে বের হওয়া জায়েয। কিন্তু প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথেই এতেকাফের স্থানে ফিরে যেতে হবে।

ওয়াজিব এতেকাফের সময়

ওয়াজিব এতেকাফের জন্যে যেহেতু রোযা শর্ত সে জন্যে তার কমসে কম সময় একদিন। একদিনের কম কয়েক ঘন্টার জন্যে এতেকাফের মানত অর্থহীন, কারণ রোযার সময়ই হচ্ছে সুবেহ্ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

মুস্তাহাব এতেকাফের সময়

নফল এতেকাফ যে কোনো সময়ে হতে পারে। না এর জন্যে রোযা শর্ত আর না কোনো বিশেষ মাস বা সময়। যখনই কেউ মসজিদে থাকে নফল এতেকাফের নিয়ত করতে পারে। মসজিদে যে সময়টুকুই থাকবে তার সওয়াব পাবে।

এতেকাফের সময়ে মুস্তাহাব কাজ

১. যিকির আযকার করা—দীনের মাসয়ালা-মাসায়েল ও এলেম-কালামের উপর চিন্তা-ভাবনা করা। তাসবিহ্ তাহ্লিলে লিপ্ত থাকা।

২. কুরআন তেলাওয়াত ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

৩. দরূদ শরীফ ও অন্যান্য যিকির করা।

৪. দীন সম্পর্কে পড়াশুনা করা ও পড়ানো।

৫. ওয়াজ ও তাবলীগ করা।

৬. দীন সম্পর্কিত বই-পুস্তক রচনায় লিপ্ত থাকা।

এতেকাফের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয

১. পেশাব পায়খানার জন্যে বাইরে যাওয়া জায়েয। মনে রাখতে হবে এসব প্রয়োজন এমন স্থানে পূরণ করতে হবে যা মসজিদের নিকটে হয়। মসজিদের নিকটে এমন স্থান আছে কিন্তু তা বেপর্দা অথবা অত্যন্ত নোংরা। তাহলে আপন বাড়ীতে পেশাব পায়খানার জন্যে—যাওয়ার অনুমতি আছে।

২. ফরয গোসলের জন্যেও এতেকাফের স্থান থেকে বাইরে যাওয়া জায়েয। তবে মসজিদেই গোসল করার ব্যবস্থা থাকলে সেখানেই গোসল করতে হবে।

৩. খানা খাওয়ার জন্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় যদি খানা নিয়ে আসার কোনো লোক না থাকে। খানা আনার লোক থাকলে মসজিদে খাওয়াই জরুরী।

৪. জুমা ও ঈদের নামাযের জন্যেও বাইরে যাওয়া জায়েয। আর যদি এমন মসজিদে এতেকাফ করা হয় যেখানে জামায়াত করা হয় না। তাহলে পাঞ্জেগানা নামাযের জন্যে অন্যত্র যাওয়া জায়েয।

৫. যদি কোথাও আগুন লাগে, অথবা কেউ পানিতে পড়ে ডুবে যাচ্ছে অথবা কেউ কাউকে মেরে ফেলছে অথবা মসজিদ পড়ে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে এসব অবস্থায় এতেকাফের স্থান থেকে বাইরে যাওয়া শুধু জায়েযই নয় বরঞ্চ জরুরী। কিন্তু এতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

৬. কেউ যদি কোনো প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যেমন জুমার নামাযের জন্যে বের হলো এবং এ সময়ে সে কোনো রোগীর সেবা করলো অথবা জানাযায় শরীক হলো–তাহলে তাতে কোনো দোষ হবে না।

৭. যে কোনো প্রাকৃতিক অথবা শরীয়াতের প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয।

৮. জুমার নামাযের জন্য–এতটা পূর্বে যাওয়া, যাতে করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং জুমার সুন্নাতগুলো নিশ্চিন্তে পড়া যায়, জায়েয আছে। সময়ের আন্দায এতেকাফকারীর ওপর নির্ভর করে।

৯. কাউকে যদি জোর করে এতেকাফের স্থান থেকে বের করে দেয়া হয় অথবা কেউ তাকে যদি বাইরে আটক রাখে তাহলেও এতেকাফ শেষ হয়ে যাবে।

১০. যদি কাউকে কোনো ঋণদাতা বাইরে আটক করে অথবা সে ব্যক্তি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এতেকাফের স্থানে পৌছতে বিলম্ব হয়ে যায় তবুও এতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. যদি কেনাবেচার কোনো লোক না থাকে এবং বাড়ীতে খাবার কিছু না থাকে তাহলে প্রয়োজনমত কেনাবেচা করা এতেকাফকারীর জায়েয।

১২. আযান দেয়ার জন্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয।

১৩. যদি কেউ এতেকাফ করার নিয়ত করতে গিয়ে এ নিয়ত করে যে, সে জানাযার জন্যে যাবে তাহলে যাওয়া জায়েয হবে। অন্য নিয়ত করলে তার জন্যে যাওয়া জায়েয হবে না।

১৪. এতেকাফ অবস্থায় কাউকে দীন সম্পর্কে পরামর্শ অথবা চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়া জায়েয। বিয়ে করা, ঘুমানো এবং আরাম করা জায়েয।

এতেকাফে যেসব কাজ নাজায়েয

১. এতেকাফ অবস্থায় যৌনক্রিয়া করা এবং স্ত্রীকে আলীঙ্গন করা ও চুমো দেয়াতে বীর্যপাত না হলে এতেকাফ নষ্ট হবে না।

২. এতেকাফ অবস্থায় কোনো দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরূহ তাহরিমী। বাধ্য হয়ে করলে জায়েয হবে।

৩. এতেকাফ অবস্থায় একেবারে চুপচাপ বসে থাকা মাকরূহ তাহরিমী। যিকির ফিকির, তেলাওয়াত প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকা উচিত।

৪. মসজিদে বেচাকেনা করা। লড়াই-ঝগড়া করা, গীবত করা অথবা কোনো প্রকার বেহুদা কথা বলা মাকরূহ।

৫. কোনো প্রাকৃতিক ও শরয়ী প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদের বাইরে যাওয়া অথবা প্রাকৃতিক ও শরয়ী প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে সেখানেই থেকে যাওয়া জায়েয নয়। তাতে এতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

লায়লাতুল কদর

রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে এমন এক রাত আছে যাকে লায়লাতুল কদর এবং 'লায়লাতুম মুবারাকাতুন' বলা হয়েছে এবং তাকে এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম বলা হয়েছে। কুরআন বলে ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ـ(الحديد ١)

"আমরা এ কিতাবকে এক মুবারক রাতে নাযিল করেছি।"

দ্বিতীয় আর এক স্থানে কুরআন বলে ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝(القدر ١-٣)

"অবশ্যই আমরা এ কুরআনকে 'লায়লাতুল কদরে' নাযিল করেছি। তুমি জান, লায়লাতুল কদর কি ? তা হচ্ছে এমন এক রাত যা হাজার মাস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।"–(সূরা আল কদর)

লায়লাতুল কদরের অর্থ

কদরের দু'টি অর্থ

এক—নির্ধারণ করা, সময় নির্দিষ্ট করা ও সিদ্ধান্ত করা। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর এমন এক রাত যে রাতে আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তার সময় নির্দিষ্ট করেন এবং হুকুম নাযিল করেন ও প্রত্যেক বস্তুর ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ط -(الدخان ٤-٥)

"ঐ রাতে সকল বিষয়ের সুষ্ঠু ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় আমাদের নির্দেশক্রমে"-(সূরা দুখান)।

কুরআনের অন্যত্র আছে ঃ

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝

"এ রাতে ফেরেশতাগণ এবং বিশেষ করে জিবরাঈল নাযিল হন—যারা তাঁদের রবের নির্দেশে সকল কার্য সম্পাদনের জন্যে নীচে নেমে আসেন।"-(সূরা আল কদর ঃ ৪)

দুই—কদরের দ্বিতীয় অর্থ মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর এমন এক রাত আল্লাহর নিকট যার বিরাট মহত্ব ও ফযীলত রয়েছে। তার মর্যাদা ও মহত্বের এ প্রমাণই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ সে রাতে কুরআনের মতো বিরাট নিয়ামত নাযিল করেছেন। এর চেয়ে বৃহত্তর কোনো নিয়ামত না মানুষ ধারণা করতে পারে আর না কামনা করতে পারে। এ মংগল ও বরকত এবং মহত্ব ও ফযীলতের ভিত্তিতেই কুরআন তাকে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলে ঘোষণা করেছে।

লায়লাতুল কদর নির্ধারণ

হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, এ রমযান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে কোনো একটি অর্থাৎ ২১শে, ২৩শে, ২৫শে, ২৭শে, অথবা ২৯শে রাত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন—রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে লায়লাতুল কদর তালাশ কর।-(বুখারী)

এ রাতকে সুস্পষ্ট করে চিহ্নিত না করার তাৎপর্য এই যে, রমযানের এ শেষ দশদিনে যাতে করে যিকির ও ইবাদাতের বেশী করে ব্যবস্থাপনা করা যায়।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) রমযানের শেষ দশ দিন যিকির ও ইবাদাতের এমন ব্যবস্থা করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না।-(মুসলিম)

এ রাতে বেশী বেশী নামায—বন্দেগী, যিকির, তাসবিহ্ ইত্যাদির প্রেরণা দান করে নবী (স) বলেন, যখন লায়লাতুল কদর আসে, তখন জিবরাঈল অন্যান্য ফেরেশতাগণের সাথে যমীনে নেমে আসেন এবং প্রত্যেক ঐ বান্দাহ্র জন্যে রহমত ও মাগফেরাতের দোয়া করেন যে দাঁড়িয়ে বসে আল্লাহ্র ইয়াদ ও ইবাদাতে মশগুল থাকে।-(বায়হাকী)

নবী (স) আরও বলেন, লোক সকল! তোমাদের মধ্যে এমন এক রাত এসেছে যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত রইলো সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল এবং এ রাত থেকে সে-ই বঞ্চিত থাকে যে প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত।-(ইবনে মাজাহ্)

লায়লাতুল কদরের খাস দোয়া

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ। যদি কোনো প্রকারে আমি জানতে পারি কোন্ রাতটি লায়লাতুল কদর, তাহলে কি দোয়া করবো? তার জবাবে নবী (স) বলেন, এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى-

"আয় আল্লাহ তুমি বড়ই মাফ করেনেওয়ালা এবং বড়োই অনুগ্রহশীল। মাফ করে দেয়াই তুমি পসন্দ কর। অতএব তুমি আমার গুনাহগুলো মাফ করে দাও।"

সদকায়ে ফিতরের হুকুম আহকাম

যে বছর মুসলমানদের ওপর রোযা ফরয করা হয় সে বছরই নবী (স) সদকায়ে ফিতর আদায় করার জন্যে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন। আল্লাহ্র ফরয করা ইবাদাতগুলো বান্দাহ্ সকল শর্ত ও নিয়মনীতি সহ পালন করার ব্যবস্থা করে, কিন্তু জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে তার মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে যায়। রোযার মধ্যে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় তার ক্ষতিপূরণের জন্যে রমযানের শেষে সদকায়ে ফিতর শরীয়তে ওয়াজিব করে দিয়েছে। এর দ্বারা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণও হবে এবং গরীব দুঃখী মুসলমান নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া পরার জিনিস পত্র সংগ্রহ করে সকল মুসলমানের সাথে ঈদের নামাযে শরীক হতে পারবে।

যেসব সচ্ছল ব্যক্তির কাছে তার প্রয়োজন পূরণের পর এতোটা সম্পদ থাকবে যার মূল্য নেসাবের পরিমাণ হয়, সে মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব হোক বা না হোক—তাকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

সদকায়ে ফিতর ঈদের দু একদিন আগে দিয়ে দিলে বেশী ভালো হয় নতুবা ঈদের নামাযের পূর্বেই দিয়ে দেয়া উচিত। ঈদের নামাযের পূর্বে দেয়া মুস্তাহাব।

গম দিতে হলে এক সের তিন ছটাক—যব তার দ্বিগুণ। কারো কারো মতে গম এক সের সারে বারো ছটাক। খুরমা মুনাক্কা গমের দ্বিগুণ দিতে হবে।

সদকায়ে ফিতর ঐসব লোককে দেয়া উচিত যাদেরকে যাকাত দেয়া হয়।

كِتَابُ الحَجِّ

হজ্জের অধ্যায়

হজ্জের অধ্যায়

হজ্জের বিবরণ

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। হজ্জের একটা ঈমান উদ্দীপনা ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। এর প্রতি লক্ষ্য না রাখলে হজ্জের মহত্ব, তাৎপর্য ও মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কুফর ও শিরক পরিবেশিত এক শক্তিশালী পরিবেশে এক মুমিন বান্দাহ খালেস তাওহীদের ঘোষণা করেন। তারপর বাতিল যালেম শক্তির চরম বাধা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ঈমান, তাকওয়া, ইখলাস, লিল্লাহিয়াত, এশ্‌ক ও মহব্বত, ত্যাগ ও কুরবানী নির্ভেজাল নিরংকুশ আল্লাহর আনুগত্য ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নজিরবিহিন প্রেরণা ও আমলের দ্বারা ইসলামের পূর্ণাংগ ইতিহাস তৈরী করেন এবং তাওহীদ ও এখলাসের এমন এক কেন্দ্র তৈরী করেন যা দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার থেকে বিশ্ব মানবতা তাওহীদের পয়গাম পেতে থাকবে।

এ ইতিহাসকে নতুন করে স্মরণ করার জন্যে এবং মানুষের মনে আবেগ উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করার জন্যে প্রতি বছর দূরদূরান্ত থেকে তাওহীদের প্রেম পাগল পতংগসমূহ ঐ কেন্দ্রে জমায়েত হয়ে ঐসব কিছুই করে যা তাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক হযরত ইবরাহীম (আ) করেছিলেন। তারা কখনো দু' খণ্ড কাপড় পরিধান করে আবেগ উচ্ছ্বাসে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে এবং কখনো সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে তাদেরকে দৌড়াতে দেখা যায়। কখনো আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে এবং কখনো কুরবানীগাহে পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে আল্লাহর সাথে মহব্বতের শপথ গ্রহণ করে। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সকাল সন্ধ্যায় তাদের এ একই ধ্বনিতে হেরেমের গোটা পরিবেশ গুঞ্জরিত হতে থাকে—"আয় আল্লাহ! তোমার দরবারে তোমার গোলাম হাজির আছে। প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র তোমারই, দয়া করা তোমারই কাজ, তোমার প্রভুত্ব কর্তৃত্বে কেউ শরীক নেই।"

প্রকৃতপক্ষে এসব অবস্থা সৃষ্টি করার এবং নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর ওপরে সোপর্দ করারই নাম হজ্জ।

হজ্জের অর্থ

হজ্জের আভিধানিক অর্থ হলো যিয়ারতের এরাদা করা। শরীয়াতের পরিভাষায় হজ্জের অর্থ হলো সেই সার্বিক ইবাদাত যা একজন বায়তুল্লাহ

পৌছে করে থাকে। যেহেতু হজ্জে মুসলমান আল্লাহর ঘরের যিয়ারতের এরাদা করে সে জন্যে একে হজ্জ বলা হয়।

হজ্জ একটি সার্বিক ইবাদাত

ইসলামী ইবাদাত দু' প্রকারের। এক—দৈহিক ইবাদাত, যেমন নামায, রোযা। দুই—মালের ইবাদাত, যেমন সদকা, যাকাত, দান-খয়রাত প্রভৃতি। হজ্জের বৈশিষ্ট্য এই যে, এ মালেরও ইবাদাত এবং দেহেরও ইবাদাত। অন্যান্য স্থায়ী ইবাদাতগুলোর দ্বারা এখলাস, তাকওয়া, বিনয়, নম্রতা, বন্দেগীর পিপাসা, আনুগত্য, কুরবানী, ত্যাগ ও আত্মসর্মপণ, আল্লাহর নৈকট্য প্রভৃতির যে প্রেরণা ও ভাবাবেগ পৃথক পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করে, হজ্জের সার্বিকতা এই যে, এ সকল অনুভূতি ভাবাবেগ ও মানসিক অবস্থা একই সময়ে এবং একই সাথে তৈরী হয় ও বিকাশ লাভ করে।

যে নামায দীনের উৎস, তা কায়েম করার জন্যে যমীনের উপর যে সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরী করা হয়, হজ্জে মুমিনগণ যে মসজিদের চারধারে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাওয়াফ করে। সারা জীবন দূর-দূরান্ত থেকে যে মসজিদের দিকে মুখ করে মুসলমান নামায পড়ে, হজ্জে তার এ সৌভাগ্য হয় যে, সে ঐ মসজিদে দাঁড়িয়ে নামায সমাধা করে।

যে রোযা মন ও চরিত্রের সংশোধনের উপযোগী ও অনিবার্য উপায় এবং যে রোযায় একজন মুমিন প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে দূরে থেকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শক্তি লাভ করে ও আল্লাহর পথে আল্লাহর সিপাহী ও মুজাহিদ হওয়ার আভ্যাস করে। হজ্জে ইহরাম বাঁধার সময় থেকে ইহরাম খোলা পর্যন্ত ঐরূপ সংগ্রাম সাধনায় দিনরাত কাটিয়ে দেয়, মন থেকে এক একটা চিত্র মুছে ফেলে দিয়ে আল্লাহর মহব্বতের চিত্র অংকিত করে। দিন রাত তাওহীদের ধ্বনী উচ্চারণ করে শুধু মাত্র তাওহীদের পতাকাবাহী হয়ে যায়।

সদকা ও যাকাতে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদ দান করে মুমিন বান্দাহ, ধনলিপ্সার প্রবণতা মুছে ফেলে আল্লাহর প্রেমের বীজ বপন করে। হজ্জেও লোক তার সারা জীবনের সঞ্চিত ধন শুধু আল্লাহর মহব্বতে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে এবং তার পথে কুরবানী করে তার সাথে কৃত ওয়াদা চুক্তি পূরণ করে। মোটকথা, হজ্জের দ্বারা আল্লাহর সাথে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক, মন ও চরিত্রের সংশোধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল উদ্দেশ্য একই সাথে পূর্ণ হয়। তবে শর্ত এই যে, হজ্জ শুধুমাত্র যেন হজ্জের অনুষ্ঠান পালনের কাজ না হয়।

হজ্জের হাকীকত

হজ্জের হাকীকত বা মর্মকথা এই যে, ব্যক্তি তার নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে তার প্রভুর হাতে সোপর্দ করে দেবে এবং একনিষ্ঠ মুসলমান হয়ে যাবে। আসলে আল্লাহ তায়ালার পাক সত্তা থেকে এ শক্তি আশা করা যায় যে, সংস্কার-সংশোধনের সকল প্রকার নির্ভরযোগ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বান্দাহর জীবনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায় তা হজ্জের করণীয় কাজগুলো এবং হজ্জের স্থানগুলোর বরকতে দূর হয়ে যাবে এবং সে হজ্জের মাধ্যমে এমন পাক সাফ হয়ে ফিরে আসবে যেন সে আজই জন্মগ্রহণ করেছে। সেই সাথে হজ্জ প্রকৃত অবস্থার একটা কষ্টিপাথরও বটে। অর্থাৎ কার হজ্জ প্রকৃত হজ্জ এবং কে হজ্জের সকল আরকান পালন এবং বায়তুল্লাহর যিয়ারত করা সত্ত্বেও বঞ্চিত রয়ে গেছে। আর এটাও সত্য যে হজ্জের তওফীক লাভ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করা থেকে বঞ্চিত থাকে, তার সম্পর্কে খুব কম আশাই করা যেতে পারে যে, অন্য কোনো উপায়ে তার সংশোধন হতে পারবে। এজন্যে হজ্জ পালনকারীর জন্যে এটা অত্যন্ত জরুরী যে, সে যেন তার আবেগ অনুভূতি ও কামনা বাসনার পর্যালোচনা করে এবং হজ্জের এক একটি রুকন ও আমল পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও অনুভূতির সাথে আদায় করে হজ্জের সেসব ফায়দা হাসিল করে যার জন্যে হজ্জ ফরয করা হয়েছে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র)-এর কাছে এক ব্যক্তি হাজির হলো যে, বায়তুল্লাহ যিয়ারত করে (হজ্জ করে) ফিরে এসেছে কিন্তু তার জীবনের ওপর হজ্জের কোনো ছাপ দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে আসছ ? সে বললো, হযরত আমি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে আসছি।

হযরত জুনাইদ (র) খুব আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন। তুমি হজ্জ করেছ নাকি ?

মুসাফির—জি হ্যাঁ, আমি হজ্জ করেছি।

হযরত—যখন তুমি হজ্জের জন্যে ঘর-বাড়ী ছেড়ে বের হয়েছিলে, তখন তুমি গুনাহ থেকে দূরে ছিলে কিনা ?

মুসাফির—হযরত, আমি এভাবে চিন্তা করিনি।

হযরত—তাহলে তো তুমি হজ্জের জন্যে মোটেই বের হওনি। আচ্ছা বলতো এ পবিত্র সফরে তুমি যেসব মনযিল অতিক্রম করেছ এবং যেখানে যেখানে রাত কাটিয়েছে তখন তুমি কি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মনযিলগুলোও অতিক্রম করেছ কিনা এবং পথের স্থানগুলো অতিক্রম করেছ কিনা ?

মুসাফির—হযরত, আমার তো এসব খেয়ালই হয়নি।

হযরত—তাহলে তুমি তো না বায়তুল্লাহর দিকে কোনো সফর করেছ। আর না সেদিকে কোনো মনযিল অতিক্রম করেছ। আচ্ছা বল তো তুমি যখন ইহরাম বাঁধলে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের পোশাক খুলে ফেললে তখন তার সাথে সাথে তোমার মন্দ স্বভাব ও অভ্যাসগুলো তোমার জীবন থেকে দূরে নিক্ষেপ করলে কিনা ?

মুসাফির—হযরত, এভাবে তো আমি চিন্তা করে দেখিনি।

হযরত জুনাইদ তখন খুব দুঃখ করে বললেন। তাহলে তুমি ইহরামই বা বাঁধলে কোথায় ? আচ্ছা বলত যখন তুমি আরাফাতের ময়দানে দাঁড়ালে তখন কিছু মুশাহাদার অনুভূতি হয়েছিল কি ?

মুসাফির—হযরত, এর অর্থই বুঝলাম না।

হযরত—তার অর্থ এই যে, আরাফাতের ময়দানে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করার সময় তুমি তোমার মধ্যে এ অবস্থা কি অনুভব করেছ যে, তোমার রব তোমার সামনে এবং তুমি তাকে দেখছ ?

মুসাফির-হযরত, এ অবস্থা তো আমার হয়নি।

হযরত—তাহলে তুমি তো আরাফাতে পৌছনি। আচ্ছা তারপর বল দেখি, মুযদালাফায় পৌছার পর তোমার প্রবৃত্তির কামনা বাসনা পরিহার করেছ কিনা ?

মুসাফির—হযরত ! আমি এ বিষয় তো কোনো মনোযোগ দেইনি।

হযরত—তাহলে তুমি তো মুযদালাফায়ও যাওনি। আচ্ছা, বল দেখি, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার সময় আল্লাহ্ তায়ালার সৌন্দর্যের জ্যোতি ও অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করেছ কি ?

মুসাফির—হযরত ! আমি এর থেকে বঞ্চিত ছিলাম।

হযরত—তাহলে তুমি মোটেই তাওয়াফ করনি। আচ্ছা, তারপর তুমি যখন সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করলে তখন সাফা-মারওয়া ও তার মধ্যে সায়ী করার হিকমত, মর্মকথা ও তার উদ্দেশ্য হাসিল করেছ কি ?

মুসাফির—এসবের তো কোনো অনুভূতিই আমার ছিল না।

হযরত—তাহলে তুমি বলতে গেলে সায়ীও করনি। তারপর তুমি কুরবানগাহে গিয়ে যে কুরবানী করলে, তখন তুমি তোমার প্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনাকেও কুরবানী করেছ কি ?

মুসাফির—হযরত ! এদিক আমি লক্ষ্যই করিনি।

হযরত—তাহলে তুমি কুরবানীই বা করলে কোথায় ? আচ্ছা বল দেখি, তুমি জমরাতে পাথর মারলে, তখন তুমি তোমার অসৎ সহকর্মী, সাথী ও কুপ্রবৃত্তিকেও তোমার কাছ থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছ কি ?

মুসাফির—তাতো করিনি।

হযরত—তাহলে তুমি 'রামীও' করোনি।

তারপর হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র) বড় দুঃখের সাথে বলেন, যাও ফিরে যাও এবং এরূপ মনের অবস্থাসহ আবার হজ্জ কর। যাতে করে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয় যাঁর ঈমান ও ওয়াদা পালনের স্বীকৃতি করতে গিয়ে কুরআন এ সাক্ষ্য দেয়–

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى

"এবং তিনি ইবরাহীম (আ) যিনি তাঁর রবের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণের হক আদায় করেছেন।"

হজ্জের মহত্ব ও গুরুত্ব

কুরআন ও সুন্নাতে হজ্জের হিকমত, দীনের মধ্যে হজ্জের মর্যাদা, তার মহত্ব ও গুরুত্বের ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআন বলে–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ○ (ال عمران : ٩٧)

"মানুষের ওপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছবার শক্তি-সামর্থ যে রাখে সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরের আচরণ করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

১. হজ্জ বান্দাহর ওপর আল্লাহর হক। যারাই বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যাবার শক্তি-সামর্থ রাখে, তাদের জন্যে আল্লাহর হক আদায় করা ফরয। যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, সেসব যালেম আল্লাহর হক নষ্ট করে। আয়াতের একথার দ্বারা হজ্জ ফরয হওয়া প্রমাণিত হয়। বস্তুত হযরত আলী (রা)-এর বয়ান থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, নবী (স)-এর পক্ষ থেকে হজ্জ ফরয হওয়ার ঘোষণা তখনই করা হয় যখন এ আয়াত নাযিল হয়।
–(তিরমিযি–কিতাবুল হজ্জ)

এ অর্থে সহীহ মুসলিমেও একটি রেওয়ায়েত আছে, যাতে নবী (স) বলেন–

হে লোকেরা ! তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব হজ্জ আদায় কর।

২. আর একটি গুরত্বপূর্ণ যে সত্যের প্রতি এ আয়াত দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে এই যে, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা কুফরী আচরণ, যেমন বলা হয়েছে। ঠিক যেভাবে কুরআনে নামায ত্যাগ করাকে এক স্থানে মুশরিকী কার্যকলাপ বলা হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (روم ٣١)

"এবং নামায কায়েম কর এবং (নামায ত্যাগ করে) মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না।"

ঠিক তেমনি আলোচ্য আয়াতের এ স্থানে হজ্জ না করাকে কুফরী আচরণ বলা হয়েছে। নবী (স) ইরশাদ করেন–

যে ব্যক্তির কাছে হজ্জের জরুরী খরচের অর্থ সামগ্রী মওজুদ আছে, যানবাহন আছে—যার দ্বারা সে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে, তারপর সে হজ্জ করে না তাহলে সে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা খৃষ্টান হয়ে মরুক তাতে কিছু আসে যায় না। এজন্যে যে আল্লাহ বলেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط

হাদীস বর্ণনাকারীর উদ্দেশ্য এই যে—যারা হজ্জ করে না নবী (স) তাদেরকে ইহুদী নাসারার সমতুল্য বলেছেন। হজ্জ যারা করে না তাদেরকে ইহুদী নাসারার সমতুল্য এবং নামায যারা পড়ে না তাদেরকে মুশরিকদের সমতুল্য ঘোষণা করার মর্ম এই যে, আহলে কিতাব হজ্জ একেবারে পরিত্যাগ করেছিল এবং মুশরিকগণ হজ্জ করলেও নামায পরিত্যাগ করেছিল। এজন্যে নামায পরিত্যাগ করাকে মুশরিকী ক্রিয়াকর্ম এবং হজ্জ পরিত্যাগ করাকে ইহুদী-খৃষ্টানের ক্রিয়াকর্ম বলা হয়েছে। অতএব এটাও এক মোক্ষম সত্য যে, স্বয়ং কুরআনেও এ ধরনের লোককে এ সতর্কবাণীও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে হাদীস বর্ণনাকারী আয়াতের শুধু প্রথম অংশ পাঠ করেছেন। নতুবা যে সতর্কবাণীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা আয়াতের এ অংশে রয়েছে। যথা ঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ۔

"যারা অর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করতে অস্বীকার করার আচরণ দেখাবে তারা যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বজগতের কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না।" অর্থাৎ হজ্জ পরিত্যাগকারীর কুফরী আচরণের কোনো পরোয়া তিনি করেন না। তিনি ঐসব লোকের কোনো পরোয়া করেন না যে, তারা কোন্ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছে। এ হচ্ছে সতর্কবাণীর বড়ো কঠিনতম প্রকাশভঙ্গী। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তার অসন্তোষ ও মুখাপেক্ষহীনতার কথা ঘোষণা করেন, সে ঈমান ও হেদায়াত দ্বারা কি করে ভূষিত হতে পারে ?

হযরত হাসান (রা) বলেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) বলেছেন, আমার দৃঢ় ইচ্ছা এই যে, যেসব শহর ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেসব শহরে কিছু লোক পাঠিয়ে দেব। তারা খোঁজ-খবর নিয়ে দেখবে যে কারা হজ্জ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করছে না। তাদের ওপর আমি জিযিয়া[১] নির্ধারিত করে দেব। তারা মুসলমান নয়, তারা মুসলমান নয়।-(আল মুনতাকা)

মুসলিম ঐ ব্যক্তিকে বলে যে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সোপর্দ করে দেয়। আর হজ্জের মর্মও এই যে, ব্যক্তি তার নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেবে। এরা যদি মুসলিম হতো তাহলে কি করে হজ্জের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতো এবং সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কি করে হজ্জ থেকে উদাসীন থাকতো ?

হজ্জের ফযীলত ও প্রেরণা

হজ্জের এ গুরুত্বকে সামনে রেখে নবী (স) বিভিন্নভাবে এর প্রেরণা দান করেছেন। বিভিন্নভাবে এর অসাধারণ ফযীলত বর্ণনা করে এর জন্যে প্রেরণা ও আবেগ সৃষ্টি করেছেন।

১. যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর যিয়ারতের জন্যে এলো, তারপর কোনো অশ্লীল যৌন ক্রিয়া করলো না, আল্লাহর নাফরমানীর কোনো কাজ করলো না, তাহলে সে গোনাহ থেকে এমনভাবে পাকসাফ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো, যেমন পাকসাফ সে ঐদিন ছিল যেদিন সে তার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল।-(বুখারী, মুসলিম)

---

১. জিযিয়া এমন এক প্রতিরক্ষা কর যা অমুসলিমদের নিকট থেকে তার জানমালের নিরাপত্তার বিনিময়ে গ্রহণ করা হয়।

২. হজ্জ ও ওমরাহকারী আল্লাহর মেহমান। সে তার মেযবান আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তিনি তা কবুল করেন, সে তার কাছে মাগফেরাত চাইলে তিনি তাকে মাগফেরাত দান করেন।–(ইবনে মাজাহ)

৩. হজ্জ ও ওমরাহ্ পর পর করতে থাক। কারণ হজ্জ ও ওমরাহ্ উভয়ই দারিদ্র ও অভাব এবং গোনাহগুলোকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন আগুনের ভাট্টি লোহা ও সোনা চাঁদির ময়লা দূর করে তা বিশুদ্ধ করে দেয়। হজ্জে মাবরুরের প্রতিদান তো একমাত্র জান্নাত।–(তিরমিযি, নাসায়ী)

হজ্জে মাবরুর বলে এমন হজ্জকে যা পরিপূর্ণ এখলাস (নিষ্ঠা) অনুভূতি ও শর্তাবলীর পালনসহ আদায় করা হয় এবং যার মধ্যে হজ্জকারী আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার পুরোপুরি ব্যবস্থা করে।

৪. যদি কোনো হেরেম শরীফ যিয়ারতকারীর সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয়, তাহলে তার বাড়ী পৌঁছবার আগেই তাকে সালাম কর, তার সাথে মুসাফা কর এবং তাকে অনুরোধ কর তোমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের দোয়া করার। এজন্যে যে, তার গোনাহের মাগফেরাতের ফায়সালা করা হয়ে গেছে।–(মুসনাদে আহমদ)

৫. হযরত হুসাইন (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে আরজ করলো, হুজুর, আমার শরীর মন উভয়ই দুর্বল। ইরশাদ হলো, তুমি এমন জেহাদ কর যাতে একটা কাঁটাও গায়ে না লাগে। প্রশ্নকারী বলে হুজুর, এমন জেহাদ আবার কেমন, যাতে কোনো আঘাত ও দুঃখ-কষ্টের আশংকা নেই? নবী (স) ইরশাদ করেন, তুমি হজ্জ কর।–(তাবারানী)

৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে নবী (স)-এর একেবারে নিকটে সওয়ারীর উপরে ছিল এমন সময়ে হঠাৎ সে নীচে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে। নবী (স) বললেন, তাকে গোসল দিয়ে ইহরামের পোশাকসহই দাফন কর। এ কিয়ামতের দিনে 'তালবিয়া' পড়া অবস্থায় ওঠবে (তালবিয়ার জন্যে পরিভাষা দ্রষ্টব্য)। তার মাথা ও মুখমণ্ডল খোলা থাকতে দাও।–(বুখারী, মুসলিম)

৭. হযরত আবু যর (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর কাছে আরয করে বলেন, পরওয়ারদেগার ! যে বান্দাহ তোমার ঘর যিয়ারত করতে আসবে তাকে কি প্রতিদান দেয়া হবে ? আল্লাহ বলেন, হে দাউদ ! সে আমার মেহমান। তার অধিকার হচ্ছে এই যে, দুনিয়াতে আমি তার ভুলত্রুটি মাফ করে দেই এবং আখেরাতে যখন

সে আমার সাথে সাক্ষাত করবে, তখন তাকে আমি আমার রহমত দিয়ে ধন্য করি।

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত দশটি। তার মধ্যে কোনো একটি শর্ত পাওয়া না গেলে হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

১. **ইসলাম ঃ** অমুসলিমের প্রতি হজ্জ ওয়াজিব হতে পারে না।

২. **জ্ঞান থাকা ঃ** পাগল, মস্তিষ্ক বিকৃত ও অনুভূতিহীন লোকের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।

৩. **বালেগ হওয়া ঃ** নাবালেগ শিশুদের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়, কোনো সচ্ছল ব্যক্তি বালেগ হওয়ার পূর্বেই শৈশব অবস্থায় হজ্জ করলে তাতে ফরয আদায় হবে না। বালেগ হওয়ার পর পুনরায় তাকে হজ্জ করতে হবে। শৈশবের হজ্জ নফল হবে।

৪. **সামর্থ ঃ** হজ্জকারীকে সচ্ছল হতে হবে। তার কাছে প্রকৃত প্রয়োজন ও ঋণ থেকে নিরাপদ এতোটা অর্থ থাকতে হবে যা সফরের ব্যয়ভার বহনের জন্যে যথেষ্ট হয় এবং হজ্জ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার অধীন পরিবারস্থ লোকের জীবিকা নির্বাহের জন্যে যথেষ্ট অর্থ মওজুদ থাকে, কারণ এসব লোকের ভরণপোষণের দায়িত্ব শরীয়াত অনুযায়ী তার।

৫. **স্বাধীনতা ঃ** গোলাম ও বাঁদীর ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।

৬. **শারীরিক সুস্থতা ঃ** এমন অসুস্থ না হওয়া যাতে করে সফর করা সম্ভব নয়। অতএব ন্যাংড়া, বিকলাংগ, অন্ধ এবং অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির স্বয়ং হজ্জ করা ওয়াজিব নয়। অন্যান্য সব শর্তগুলো পাওয়া গেলে অন্যের সাহায্যে হজ্জ করাতে পারে।

৭. কোনো যালেম ও স্বৈরাচারী শাসকের পক্ষ থেকে জীবনের কোনো আশংকা না থাকা এবং কারাগারে আবদ্ধ না থাকা।

৮. **পথ নিরাপদ হওয়া ঃ** যদি যুদ্ধ চলছে এমন অবস্থা হয়, পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে, যানবাহন ধ্বংস করা হচ্ছে, পথে চোর-ডাকাতের আশংকা থাকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জলপথে ভ্রমণ সম্ভব না হয় অথবা যে কোনো প্রকারের আশংকা যদি থাকে, তাহলে এসব অবস্থায় হজ্জ ওয়াজিব

হবে না। অবশ্যি এ অবস্থায় এমন লোকের অসিয়ত করে যাওয়া উচিত যে, তার পরে অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুকূল হলে তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ হজ্জ করবে।

৯. হজ্জের সফরে স্বামী অথবা কোনো মুহাররম ব্যক্তি থাকতে হবে ঃ এর ব্যাখ্যা এই যে, সফর যদি তিন রাত দিনের কম হয় তাহলে মেয়েলোকের স্বামী ছাড়া সফরের অনুমতি আছে। তার বেশী সময়ের সফর হলে স্বামী অথবা মুহাররম পুরুষ ছাড়া হজ্জের সফর জায়েয নয়।[১] এটাও জরুরী যে, এ মুহাররম জ্ঞানবান, বালেগ, দীনদার এবং নির্ভরযোগ্য হতে হবে। অবোধ শিশু, ফাসেক এবং অনির্ভরযোগ্য লোকের সাথে সফর জায়েয নয়।

১০. ইদ্দত অবস্থায় না হওয়া ঃ ইদ্দত স্বামীর মৃত্যুর পর হোক অথবা তালাকের হোক, ইদ্দতের সময় হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

হজ্জ সহীহ হওয়ার শর্ত

হজ্জ সহীহ হওয়ার শর্ত চারটি। এ শর্তগুলোসহ হজ্জ করলে তা সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হবে। নতুবা হবে না।

১. **ইসলাম ঃ** ইসলাম হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার যেমন শর্ত, তেমনি সহীহ হওয়ার শর্ত। যদি কোনো অমুসলিম হজ্জের আরকান আদায় করে এবং তারপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন, তাহলে এ হজ্জ তার যথেষ্ট হবে না যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে করেছে। এজন্যে যে, হজ্জ সহীহ হওয়ার জন্যে জরুরী যে, হজ্জকারী মুসলমান হবে।

২. **হুঁশ-জ্ঞান থাকা ঃ** হুঁশ-জ্ঞানহীন ও পাগল ব্যক্তির হজ্জ সহীহ হবে না।

৩. সকল আরকান নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে আদায় করা। হজ্জের মাসগুলো হচ্ছে শাওয়াল, যুলকাদ ও যুলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। এমনি হজ্জের সকল আরকান আদায় করার সময়ও নির্দিষ্ট আছে,

---

১. যে মহিলার স্বামী নেই এবং কোনো মুহাররম পুরুষও নেই, তার ঐসব বন্ধু সফরকারীর সাথে যাওয়া জায়েয যাদের নৈতিক চরিত্রের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। এ হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেকের অভিমত। নির্ভরযোগ্য বন্ধুবান্ধব-এর ব্যাখ্যা ইমাম শাফেয়ী (র) এভাবে করেছেনঃ কিছুসংখ্যক মেয়েলোক নিভরযোগ্য হতে হবে এবং তারা মুহাররম লোকের সাথে হজ্জে যাচ্ছে। তাহলে এ দলের সাথে স্বামীহীন একজন মেয়েলোক যেতে পারে। অবশ্যি দলে মাত্র একজন মেয়েলোক থাকলে যাওয়া উচিত নয়। ইমাম শাফেয়ীর এ অভিমত অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এতে একজন স্বামীহীন ও মুহাররমহীন মেয়েলোকের হজ্জ আদায় করার সুযোগ রয়েছে এবং ওসব ফেতনার আশংকাও নেই যার কারণে কোনো মেয়েলোকের মুহাররম ছাড়া সফর করা নিষিদ্ধ।

স্থানও নির্দিষ্ট আছে। আর ব্যতিক্রম করে হজ্জের আরকান আদায় করলে হজ্জ সহীহ হবে না।

৪. যেসব কারণে হজ্জ নষ্ট হয় তার থেকে বেঁচে থাকা এবং হজ্জের সকল আরকান ও ফরয আদায় করা। যদি হজ্জের কোনো রুকন আদায় করা না হয় কিংবা ছুটে যায় তাহলে হজ্জ সহীহ হবে না।

হজ্জের আহ্‌কাম

১. হজ্জ ফরয হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান থাকলে জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। হজ্জ ফরযে আইন এবং তার ফরয হওয়া কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে। যে ব্যক্তি হজ্জ ফরয হওয়া অস্বীকার করবে সে কাফের এবং যে ব্যক্তি হজ্জের শর্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করবে না সে গুনাহগার এবং ফাসেক।

২. হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে সে বছরই তা আদায় করা উচিত। ফরয হওয়ার পর বিনা কারণে বিলম্ব করা এবং এক বছর থেকে আর এক বছর পর্যন্ত টালবাহানা করা গুনাহ।

নবী (স) বলেন, যে হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করে তার তাড়াতাড়ি করা উচিত। হতে পারে যে, সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, অথবা সওয়ারীর উটনী হারিয়ে যেতে পারে। আর এটাও হতে পারে যে, অন্য কোনো প্রয়োজন তার হতে পারে।-(ইবনে মাজাহ)

উটনী হারিয়ে যাওয়ার অর্থ সফরের উপায়-উপাদান না থাকা। পথ নিরাপদ না থাকা এবং এমন কোনো প্রয়োজন এসে যাওয়া যার জন্যে হজ্জের আর সম্ভাবনা থাকে না। মানুষ ফরযের বোঝা মাথায় নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। পরিস্থিতি কখন অনুকূল হবে এবং জীবনেরই বা কি ভরসা ? অতএব কোন্ ভরসায় মানুষ বিলম্ব করবে এবং হজ্জ করার পরিবর্তে শুধু টালবাহানা করতে থাকবে ?

৩. হজ্জের ফরয আদায় করার জন্যে যাদের অনুমতি নেয়া শরীয়াতের দিক দিয়ে জরুরী যেমন কারো মা-বাপ দুর্বল অথবা রোগাক্রান্ত এবং তার সাহায্য প্রার্থী অথবা কোনো ব্যক্তি কারো কাছে ঋণী অথবা কারো জামীন —এমন অবস্থায় অনুমতি ছাড়া হজ্জ করা মাকরূহ তাহরীমি।

৪. হারাম কামাইয়ের দ্বারা হজ্জ হারাম।

৫. ইহরাম না বেঁধে মীকাতে প্রবেশ করলে হজ্জ ফরয হয়ে যায়।

৬. হজ্জ ফরয হওয়ার পর কেউ বিলম্ব করলো, তারপর সে অসমর্থ হয়ে পড়লো এবং অন্ধ, পঙ্গু অথবা কঠিন অসুখে পড়লো এবং সফরের যোগ্য রইলো না, তাহলে সে তার নিজের খরচে অন্যকে পাঠিয়ে বদলা হজ্জ করে নেবে।

মীকাত ও তার হুকুম

১. মীকাত অর্থ সেই নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত স্থান যেখানে ইহরাম বাঁধা ছাড়া মক্কা মুকাররামা যাওয়া জায়েয নয়। যে কোনো কারণেই কেউ মক্কা মুকাররামা যেতে চাক, তার জন্যে অপরিহার্য যে, সে মীকাতে পৌছে ইহরাম বাঁধবে। ইহরাম বাঁধা ছাড়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া মাকরূহ তাহরিমী।-(ইলমুল ফেকাহ)

২. বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকদের জন্য পাঁচটি মীকাত নির্দিষ্ট আছে।

ক. যুল হুলায়ফাহ ঃ

এটি মদীনাবাসীদের জন্যে মীকাত। ঐসব লোকের জন্যেও যারা মদীনার পথে মক্কা মুকাররমা আসতে চায়। এ মীকাত মদীনা থেকে মক্কা আসবার পথে প্রায় আট নয় কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এ মীকাত মক্কা থেকে অন্যান্য সব মীকাতের তুলনায় অধিকতর দূরত্বে অবস্থিত, আর মদীনাবাসীদের এ অধিকারও রয়েছে এজন্যে যে, সর্বদা মদীনাবাসী আল্লাহর পথে অধিকতর কুরবানী করেছে।

খ. যাতে ইরাক ঃ

এটি ইরাক এবং ইরাকের পথে আগত লোকদের মীকাত। এ মীকাত মক্কা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

গ. হুজফাহ

এটি সিরিয়া এবং সিরিয়ার দিক থেকে আগমনকারী লোকদের জন্যে মীকাত। মক্কা থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় একশ আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

ঘ. কারনুল মানাযেল ঃ

মক্কা মুকাররামা থেকে পূর্ব দিকে পথের ওপর এক পর্বতময় স্থান যা মক্কা থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি নজদবাসীদের মীকাত এবং ঐসব লোকের জন্যে যারা এ পথে আসে।

ঙ. ইয়ালামলাম ঃ

মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইয়ামেন থেকে এসেছে এমন পথের ওপর একটি পাহাড়ী স্থান যা মক্কা থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে। এটি ইয়ামেন এবং এ পথে আগমনকারী লোকদের মীকাত। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের লোকের জন্যেও এ মীকাত।

এসব মীকাত স্বয়ং নবী (স) নির্ধারিত করে দিয়েছেন। বুখারী ও মুসলিম থেকে একথা জানা যায়। এসব মীকাত ঐসব লোকের জন্যে যারা মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী, যাদেরকে পরিভাষায় আফাকী বলে। এখন যারা মীকাতের মধ্যে বসবাস করে তারা যদি হেরেমের সীমার ভেতরে হয় তাহলে হেরেমই তাদের মীকাত। আর হেরেমের সীমার বাইরে হিলে অবস্থানকারী হলে তার জন্যে হিল মীকাত। অবশ্যি হেরেমের মধ্যে অবস্থানকারী ওমরার জন্যে ইহরাম বাঁধতে চাইলে তার মীকাত হিল, হেরেম নয়।

হজ্জের ফরয

হজ্জের চারটি ফরয। তার মধ্যে কোনো একটি ছুটে গেলে হজ্জ হবে না। ফরয নিম্নরূপ ঃ

১. ইহরাম—এটি হজ্জের শর্ত এবং হজ্জের রুকন।

২. আরাফাতে অবস্থান কিছু সময়ের জন্যে হলেও।

৩. যিয়ারতে তাওয়াফ—এর প্রথম চার চক্কর ফরয এবং বাকী তিন চক্কর ওয়াজিব।

৪. এ ফরযগুলো নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্ধারিত ক্রম অনুসারে আদায় করা।

ইহরাম ও তার মাসয়ালা

১. হজ্জের নিয়ত করে হজ্জের পোশাক পরিধান করা ও তালবিয়া পড়াকে ইহরাম বলে। হজ্জের নিয়ত করে তালবিয়া পড়ার পর লোক মুহরেম হয়ে যায়। যেমন নামাযে তাকবীর বলার পর লোক নামাযে প্রবেশ করে এবং

তারপর খানাপিনা, চলাফেরা প্রভৃতি হারাম হয়ে যায়, তেমনি ইহরাম বাঁধার পর হজ্জ শুরু হয়ে যায়। তারপর বহু জিনিস যা ইহরাম বাঁধার পূর্বে জায়েয ও মুবাহ ছিল, ইহরাম অবস্থায় সেসব করা হারাম হয়ে যায়। এজন্যে একে ইহরাম বলে।

২. যে কোনো কারণে মক্কা যেতে হোক, ভ্রমণ, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক—মীকাতে পৌছে ইহরাম বাঁধা অত্যাবশ্যক। ইহরাম ছাড়া মীকাত থেকে সামনে অগ্রসর হওয়া মাকরূহ তাহরিমী।

৩. ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। শিশুদের গোসল করাও মসনুন। মেয়েলোক হায়েয-নেফায অবস্থায় থাকলে তাদের গোসল করাও মসনুন। হ্যাঁ, তবে গোসল করতে অসুবিধা হলে বা কষ্ট হলে অযু অবশ্যি করে নেয়া উচিত। এ অযু বা গোসল শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যে, পাক-পবিত্রতার জন্যে নয়। এজন্যে পানি না পেলে তায়াম্মুম করার দরকার নেই।

৪. ইহরামের জন্যে গোসল করার পূর্বে চুল কাটা, নখ কাটা এবং সাদা চাদর ও তহবন্দ পরা এবং খুশবু লাগানো মুস্তাহাব।

৫. মীকাতে পৌছার পূর্বেও ইহরাম বাঁধা জায়েয। ইহরামের সম্মান রক্ষা করতে পারলে তা ভালো। নতুবা মীকাতে পৌছার পর ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব।

৬. **ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ঃ** এসবের মধ্যে এমন কিছু আছে যা সব সময়ই নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় সেসব করা অধিকতর গোনাহের কাজ। যেমন ঃ

১. যৌনকার্যে লিপ্ত হওয়া অথবা যৌন সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা করা, আপন স্ত্রীর সাথেও এ ধরনের কথাবার্তায় আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ।

২. আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ করা।

৩. লড়াই-ঝগড়া ও গালাগালি করা। কর্কশ কথা বলা।

৪. বন্য পশু শিকার করা। শিকার করাই শুধু হারাম নয়। বরঞ্চ শিকারীর সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতা করা অথবা শিকারীকে পথ দেখানো অথবা শিকারের দিকে ইংগিত করাও হারাম।

৫. সিলাই করা জামা-কাপড়। যেমন শার্ট, পাঞ্জাবী, পায়জামা, শিরওয়ানী, কোট-প্যান্ট, টুপি, মোজা, বেনিয়ান, দস্তানা প্রভৃতি পরিধান করা। মেয়েরা

সিলওয়ার, কামিস পরতে পারে। মোজাও পরতে পারে এবং ইচ্ছা করলে অলংকারও ব্যবহার করতে পারে।

৬. রঙিন ও খুশবুদার রঙে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা। মেয়েরা রেশমী কাপড় পরতে পারে এবং রঙিন কাপড়ও। অবশ্যি খুশবুদার হওয়া চলবে না।

৭. মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকা। মেয়েরা মাথার চুল ঢেকে রাখবে।

৮. মাথা ও দাড়ি সাবান প্রভৃতি দিয়ে ধোওয়া।

৯. শরীরের কোনো স্থানের চুল কামানো। কোনো কিছুর সাহায্যে চুল উঠিয়ে ফেলা।

১০. নখ কাটা অথবা পাথর প্রভৃতিতে ঘঁষে সাফ করা।

১১. খুশবু লাগানো।

১২. তৈল ব্যবহার করা।

৭. ইহরাম অবস্থায় জায়েয কাজ ঃ

ওপরে যেসব বিষয় বলা হলো তা ছাড়া অন্যসব কিছু করা জায়েয। যেমনঃ

১. কোনো ছায়ায় আমরা করা।

২. গোসল করা, মাথা ধোয়া, তবে সাবান ব্যবহার না করা।

৩. শরীর বা মাথা চুলকানো। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন চুল উঠে না যায় অথবা চুলের উকুন পড়ে না যায়।

৪. টাকা-পয়সা, অস্ত্র প্রভৃতি সাথে রাখা।

৫. অবসর সময়ে ব্যবসা করতে দোষ নেই। কুরআনে আছে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ

"হজ্জের সময়ে তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহ (ব্যবসার দ্বারা মুনাফা) তালাশ কর, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।"

৬. ইহরামের কাপড় বদলানো ও ধোয়া।

৭. আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করা।

৮. সুরমা লাগানো তবে খুশবু সুরমা নয়।

৯. খাত্‌না করা।

১০. নিকাহ্ করা।

১১. অনিষ্টকর জীব হত্যা করা। যেমন চিল, কাক, ইঁদুর, সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, কুকুর প্রভৃতি। নবী (স) বলেন, হেরেমে এবং ইহরামের অবস্থায় পাঁচ

প্রকারের জীব হত্যায় কোনো দোষ নেই। যেমন ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু আক্রমণকারী কুকুর।

১২. সামুদ্রিক শিকার জায়েয। কোনো গায়ের মুহরেম (যে ইহরাম অবস্থায় নেই) যদি স্থলের কোনো শিকার তোহফা দেয় তাহলে তা খাওয়া জায়েয।

৮. ইহরামের পদ্ধতি ঃ

ভালোভাবে চুল নখ কেটে গোসল করে খুশবু লাগিয়ে ইহরামের পোশাক পরবে। অর্থাৎ এক চাদর, এক তহবন্দ পরে দু' রাকায়াত নফল নামায পড়বে। তারপর হজ্জ অথবা ওমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়বে।[১] হজ্জ অথবা ওমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়ার সাথে সাথে ইহরাম বাঁধা হয়ে যায়। তারপর সে মুহরেম হয়ে যায়। তালবিয়ার পরিবর্তে যদি কুরবানীর উট মক্কার দিকে রওয়ানা করে দেয়া হয় তাহলে তা তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

তালবিয়া ও তার মাসয়ালা

হজ্জের নিয়ত করার পরই হেরেম যিয়ারতকারী যেসব কথা বলে তাকে তালবিয়া বলে, যথা ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ -

"হে আল্লাহ আমি হাজির। আমি তোমার ডাকে হাজির। আমি তোমার দরবারে হাজির আছি, তোমার কোনো শরীক নেই। এটা সত্য যে, প্রশংসা ও শোকর পাবার অধিকারী তুমি। দান ও অনুগ্রহ করা তোমারই কাজ। তোমার প্রভুত্ব কর্তৃত্বে কেউ শরীক নেই।"

১. ইহরাম বাঁধার পর একবার তালবিয়া পড়া ফরয। বেশী বলা সুন্নাত।

২. ইহরাম বাঁধার পর থেকে ১০ই যুলহাজ্জ তারিখে প্রথম জুমরায় পাথর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকতে হবে। প্রত্যেক নীচুতে নামার সময় এবং ওপরে ওঠার সময় প্রত্যেক কাফেলার সাথে মিলিত হবার সময় প্রত্যেক নামাযের পর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তালবিয়া পড়তে হবে।

---

১. মুফরেদ হলে শুধু হজ্জের নিয়ত করবে। কারেন হলে হজ্জ ও ওমরাহ উভয়ের নিয়ত করবে। মুতামাত্তা হলে প্রথমে ওমরার নিয়ত করবে এবং ওমরাহ শেষ করে হজ্জের নিয়ত করবে। এসব পরিভাষার জন্যে পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

৩. জোরে জোরে তালবিয়া পড়া সুন্নাত। নবী (স) বলেন—আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এসে এ ফরমান পৌছিয়ে দেয় যে, আমি যেন আমার সঙ্গীদেরকে হুকুম দেই তারা যেন উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পড়ে।[১]

৪. তালবিয়া পড়লে তিনবার পড়তে হবে। তিনবার পড়া মুস্তাহাব।

৫. তালবিয়া পড়ার সময় কথা বলা মাকরূহ। সালামের জবাব দেয়া যেতে পারে।

৬. যে তালবিয়া পড়ছে তাকে সালাম না দেয়া উচিত। তাকে সালাম করা মাকরূহ।

৭. তালবিয়ার পর দরুদ পড়া মুস্তাহাব।

তালবিয়ার হিকমত ও ফযীলত

কা'বা নির্মাণের পর আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রিয় হাবিব হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হুকুম করেন–

"এবং মানুষকে হজ্জের জন্যে সাধারণ আহ্বান জানিয়ে দাও যেন তারা তোমার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে অথবা উটের পিঠে চড়ে আসে।"

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই যে আহ্বান, বান্দার পক্ষ থেকে তার জবাব হচ্ছে এই তালবিয়া। বান্দাহ বলে, পরওয়ারদেগার তোমার ডাক শুনেছি এবং তুমি যে তলব করেছ তার জন্যে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী কিছুক্ষণ পরপর এ ধ্বনী বুলন্দ করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে বলেছে, পরওয়ারদেগার ! তুমি তোমার ঘরে হাজিরা দেয়ার জন্যে ডেকেছ এবং আমরা শুধু তোমার মহব্বতে সবকিছু ছেড়েছুড়ে পাগলের মতো এসে হাজির হয়েছি। আমরা তোমার সে দয়া-অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করছি। তোমার তাওহীদের স্বীকৃতি দিচ্ছি। এ তালবিয়া ধ্বনী মুমিনের শিরায় শিরায় তাওহিদের বিশ্বাস প্রতিধ্বনীত করে এবং তাকে এভাবে তৈরী করে যে, দুনিয়াতে তার জীবনের উদ্দেশ্য শুধু মাত্র এই যে, সে তাওহীদের বাণী সর্বত্র পৌছিয়ে দেবে।

নবী (স) তালবিয়ার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন কোনো মুমিন বান্দাহ লাব্বায়েক ধ্বনী করে, তখন তার ডানে বামে যাকিছু আছে সবই

---

১. মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক (র), তিরমিযি, আবু দাউদ প্রভৃতি। কিন্তু মেয়েরা উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পড়বে না। হেদায়ায় আছে মেয়েরা তালবিয়া পড়ার সময় আওয়াজ বুলন্দ করবে না। এজন্যে যে এতে করে ফেতনার আশংকা হতে পারে। তারা রমলও করবে না এবং সায়ী করার সময় দৌড়াবে না। এজন্যে যে, এতে পর্দা নষ্ট হবে।

লাব্বায়েক ধ্বনী করে তা পাথর হোক, বৃক্ষলতা হোক কিংবা মাটি হোক। এমন কি যমীনের এক প্রান্ত থেকে তা অপর প্রান্তে পৌছে যায়।-(তিরমিযি)

নবী (স) আরও বলেন, যে মুহরেম ব্যক্তি সারাদিন লাব্বায়েক লাব্বায়েক ধ্বনী করে এবং এভাবে যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন তার সকল গুনাহ মিটে যায় এবং সে এমন পাক হয়ে যায় যেন সে সদ্য তার মায়ের পেট থেকে জন্ম লাভ করছে।

তালবিয়ার পর দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ۔

"হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছ থেকে তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রার্থী এবং জাহান্নাম থেকে তোমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় চাই।"

হযরত আম্মারা বিন খুযায়মা তার পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী (স) যখন ইহরাম বাঁধার জন্যে তালবিয়া পড়তেন, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত ভিক্ষা চাইতেন এবং তার রহমতের বদৌলতে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইতেন।-(মুসনাদে শাফেয়ী)

ইহরামের পর বায়তুল্লাহ যিয়ারতকারী যে দোয়া ইচ্ছা করতে পারে এবং যতো খুশী করতে পারে। কিন্তু প্রথমে ওপরের মসনুন দোয়া অবশ্যই করবে। কারণ এ এক সার্বিক দোয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি এ তিনটি বস্তু একজন মুমিনের চরম আকাঙ্ক্ষা এবং তার সকল চেষ্টা চরিত্রের ফল।

ওয়াকুফ ও তার মাসয়ালা

১. ওয়াকুফ অর্থ দাঁড়ানো ও অবস্থান করা। হজ্জের সময় তিন স্থানে অবস্থান করতে হয় এবং তিন স্থানের হুকুম বিভিন্ন রকমের। উপরন্তু এসব স্থানে অবস্থানকালে যেসব আমল করতে হয় তার জন্যে সেখানে পৌছতে হয়। এর নিয়ত করা এবং দাঁড়ানো জরুরী নয়। কিন্তু আহলে হাদীসের মতে নিয়ত করা শর্ত।

২. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরাফাত, যেখানে অবস্থান করতে হয়। আরাফাত এক অতি প্রকাণ্ড ময়দান। হেরেমের সীমা যেখানে শেষ সেখান থেকে আরাফাত এলাকা শুরু হয়। এ ময়দান মক্কা মুকাররমা থেকে প্রায় পনের কিলো-মিটার দূরে। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান হজ্জের রুকনগুলোর বড়ো

একটা রুকন। বরঞ্চ নবী (স) একবার আরাফাতের অবস্থানকেই হজ্জ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ الحج عرفة। আরাফাতের দিনে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ একই পোশাক পরিধান করে আল্লাহর দরবারে বিনয় নম্রতার মূর্ত ছবি হয়ে দাঁড়ায় তখন তারা যেন এ সময়ের জন্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে হাশরের ময়দানে পৌছে যায়। এ এক বিরাট ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য। এখানে অবস্থানের ফলে হাশরের ময়দানের কথা মনে জাগ্রত হয়।

এর গুরুত্ব এই যে, যদি কোনো কারণে হাজী ৯ই যুলহজ্জের দিনে অথবা দিনগত রাতে আরাফায় পৌছতে না পারে তাহলে তার হজ্জ হবে না। হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠান যথা তাওয়াফ, সায়ী, রামি প্রভৃতি যদি বাদ পড়ে তাহলে তার ক্ষতি পূরণ সম্ভব। কিন্তু আরাফাতে অবস্থান করা না হলে তার ক্ষতিপূরণের কোনো উপায় নেই।

৩. আরাফাতে অবস্থানের সময় ৯ই যুলহজ্জ বেলা গড়ে যাওয়ার পর (যোহর ও আসরের নামায পড়ার পর)। কিন্তু যেহেতু এ হজ্জের সবচেয়ে বড়ো রুকন এবং এর ওপরেই হজ্জ নির্ভরশীল, সে জন্যে এ সময়কে প্রশস্ত করে দিয়ে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, যদি কেউ নয় ও দশ যুলহজ্জের মধ্যবর্তী রাত সুবেহ সাদেকের পূর্বে কোনো সময় কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আরাফাতে পৌছে যায় তাহলে তার অবস্থান নির্ভরযোগ্য হবে এবং তার হজ্জ হয়ে যাবে।[১]

৪. আরাফাতে অবস্থান যতো দীর্ঘ হয় ততো ভালো। এ ধারণা ও অনুভূতি সহ আল্লাহর দরবারে দাঁড়ানো যেন হাশরের ময়দান। বান্দার নিজের মনে বলবে আমি সকল কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একাকী নিজের মামলা মিটাবার জন্যে ও তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করার জন্যে তার দরবারে দাঁড়িয়েছি। এ হচ্ছে মুমিনের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। কে জানে জীবনে এ সৌভাগ্য আর হবে কিনা। এজন্যে ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের শক্তি জাগ্রত রেখে পূর্ণ অনুভূতির সাথে এ দিন-রাতের এক একটি মুহূর্তের গুরুত্ব অনুভব করতে হবে। নবী (স)-এর ব্যাপারে হযরত জাবের (রা) বলেন, যোহর ও আসর নামাযের পর নবী (স) তার উটনি কাসওয়ার পিঠে সওয়ার হলেন এবং আরাফাতের ময়দানের বিশেষ অবস্থানের জায়গায় এলেন। তারপর যেদিকে পাথরের বড়োবড়ো খণ্ড পড়েছিল তার উটনিকে সে মুখী

---

১. আবদুর রহমান বিন ইয়ামার ওয়াবলী বলেন, আমি নবী (স)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, হজ্জের ওয়াকুফ হচ্ছে আরাফাত। যে ব্যক্তি মুযদালফার রাতে ফজর হওয়ার পূর্বে পৌছবে, তার হজ্জ হয়ে যাবে।-(তিরমিযি, আবু দাউদ)

করলেন। তারপর জনতাকে সামনে রেখে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে যখন সূর্য অস্ত গেল তখন তিনি মুযদালফার দিকে রওয়ানা হলেন।-(মুসলিম)

৫. আরাফাতে অবস্থানের গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করে নবী (স) বলেন, বছরের ৩৬০ দিনের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই যে দিনে আল্লাহ তায়ালা আরাফাতের দিনের চেয়ে অধিক পরিমাণে বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। এ দিন আল্লাহ্ বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। ফেরেশতাদের কাছে তিনি বান্দাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলেন, হে ফেরেশতাগণ ! দেখছ এ বান্দারা কি চায়-(মুসলিম)? হযরত আনাস বিন মালেক (রা) বলেন, নবী (স) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করলেন। সূর্য অস্ত যাবে এমন সময় তিনি হযরত বেলাল (রা)-এর প্রতি ইশারায় বললেন, লোকদের চুপ করতে বলো। হযরত বেলাল (রা) সকলকে বললেন, চুপ কর। তখন নবী (স) বললেন, হে লোক সব। এই মাত্র জিবরাঈল আমার কাছে এসে আল্লাহ্ তায়ালার সালাম ও এ পয়গাম পৌঁছে গেলেন আল্লাহ্ আরাফাতের ময়দানের সকলকে মাফ করে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ পয়গাম কি আমরা সাহাবীদের জন্যে খাস না সকল উম্মতের জন্যে ? নবী (স) বললেন, এ তোমাদের জন্যে এবং ঐসব লোকের জন্যেও যারা তোমাদের পরে এখানে আসবে।-(আত তারগীব)

আরাফাতের ময়দানের দোয়া

আরাফাতের ময়দানের দোয়ার বিশেষ যত্ন নেয়া দরকার এবং ওখানে অবস্থানকালে সর্বদা আল্লাহর দিকে একাগ্রচিত্ত হয়ে থাকতে হবে। নবী (স) বলেন, সবচেয়ে ভালো দোয়া হলো আরাফাতের দিনের দোয়া। নিম্নে কিছু মসনুন দোয়া দেয়া হলো ঃ

(ক) নিম্নের দোয়া নবী (স) আরাফাতের ময়দানে খুব বেশী করে করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَاٰبِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا تَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ-

"হে আল্লাহ ! তুমি এমন প্রশংসার অধিকারী যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছ এবং আমরা যতোটা করতে পারি তার চেয়ে অনেক ভালো প্রশংসার হকদার তুমি। হে আল্লাহ ! তোমার জন্যেই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু। তোমার দিকেই আমাকে ফিরে যেতে হবে এবং তোমার জন্যেই আমার সবকিছু। হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে, মনের মধ্যে সৃষ্ট কুমন্ত্রণা (অস্‌অসা) থেকে, কাজকর্মের কুফল ও বিভেধ থেকে। হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি ওসব বিপদ থেকে যা বাতাসে বয়ে নিয়ে আসে।−(তিরমিযি)

(খ) আল হিযবুল মকবুলে এক সার্বিক দোয়া বর্ণিত হয়েছে যা করলে বরকত পাওয়া যাবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مَا سَئَلَكَ بِهٖ نَبِيُّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَ بِهٖ نَبِيُّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ط رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ - رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ط رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَنِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ الرَّحِيْمِ - رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

"আয় আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে সেই কল্যাণ চাই যা তোমার নবী (স) তোমার কাছে চেয়েছেন। ঐসব অমংগল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই যেসব থেকে তোমার নবী (স) তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। পরওয়ারদেগার ! আমরা আমাদের জীবনের ওপরে বড়ো যুলুম করেছি। তুমি যদি মাফ না কর এবং আমাদের ওপর রহম না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবো। হে আমার রব ! আমাকে নামায

কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদেরকেও তার তাওফীক দাও। পরওয়ারদেগার ! আমার দোয়া কবুল কর। আমার মা-বাপকে মাফ করে দাও। সেদিন সকল মুসলমানকে মাফ করে দিও যেদিন হবে হিসাব-কেতাবের দিন। হে আমার রব ! আমার মা-বাপ উভয়ের ওপর রহম কর যেমন তারা আমার শৈশবকালে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে আমার প্রতিপালন করেছে। হে রব ! আমাদের মাফ করে দাও এবং আমাদের ঐসব ভাইদেরকে মাফ করে দাও যারা ঈমান আনার ব্যাপারে আমাদের অগ্রগামী ছিল, এবং আমাদের মনের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা বিদ্বেষ হতে দিও না, যারা ঈমান এনেছে। হে আল্লাহ ! তুমি বড়ো মেহেরবান ও দয়াশীল ! পরওয়ারদেগার ! তুমি সবকিছু শুন এবং জান, তুমি আমাদের তাওবা কবুল করো, তুমি তাওবা কবুলকারী ও দয়াশীল। গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো শক্তি এবং হুকুম পালন করার সামর্থ অতীব উচ্চ ও মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে পাওয়া যেতে পারে না।"

(গ) নবী (স) এ দোয়া বেশী করে করতে বলেছেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

"হে আমাদের রব ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।"

এসব মসনুন দোয়া ছাড়াও আরও কিছু মসনুন দোয়া আছে যা পড়া যেতে পারে। তাছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের যে যে কল্যাণ মানুষ আল্লাহর কাছে চাইতে পারে তা চাইবে এবং বারবার চাইবে। কারণ ঐ সময়ে আল্লাহ বান্দার ওপর বড়ো দয়াশীল হয়ে যান এবং তিনি তার মেহমানকে বঞ্চিত করেন না।

৭. মুযদালাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। মুযদালাফার সীমানায় পায়ে হেঁটে প্রবেশ করা মসনুন। এখানে অবস্থানের সময় মাঝে মাঝে তালবিয়া, তাহলীল ও তাহমীদ পড়া মুস্তাহাব। এখানে একরাত্রি কাটানো মসনুন। হাদীসে আছে নবী (স) সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরাফাত থেকে মুযদালাফা রওয়ানা হন এবং এখানে পৌঁছে মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়েন। তারপর শুয়ে পড়েন এবং ফজর পর্যন্ত বিশ্রাম করেন।

৮. যুলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে কোনো সময়ে মিনাতে পৌঁছা মসনুন। সূর্য উঠার পর ওখানে পৌঁছা, যোহর ওখানে পড়া এবং ওখানেই রাত্রি যাপন করা মুস্তাহাব।

তাওয়াফ ও তার মাসায়েল

তাওয়াফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর চারদিকে চক্কর দেয়া ও প্রদক্ষিণ করা। ইসলামী পরিভাষায় তার অর্থ বায়তুল্লাহর চার ধারে ভক্তি সহকারে প্রদক্ষিণ করা ও চক্কর দেয়া।

বায়তুল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা

বায়তুল্লাহ ইট-পাথরের নিছক একটা ঘর নয়। বরঞ্চ দুনিয়ার বুকে আল্লাহর মহত্বের বিশেষ নিদর্শন ও তাঁর দীনের বিশেষ অনুভূত কেন্দ্র যা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর আপন তত্ত্বাবধানে এমন একজন শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য পয়গাম্বর দ্বারা নির্মাণ করান যাঁর নেতৃত্ব ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান সমভাবে মেনে নিয়েছে। واذ بوانا لابراهيم مكان البيت "এবং স্মরণ করো সে সময়টি যখন আমরা ইবরাহীমকে এ ঘরের (কা'বা) স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম।"-(সূরা হজ্জ ঃ ২৬)

কুরআন পাক একথার সাক্ষ্য দান করে যে, আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরী করা হয় তাহলো এ বায়তুল্লাহ (কা'বা ঘর)।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ -

"নিসন্দেহে সর্বপ্রথম ইবাদাতের ঘর যা মানুষের জন্যে তৈরী করা হয় তা ঐ ঘর যা মক্কায় রয়েছে।"

প্রকৃতপক্ষে বায়তুল্লাহ দীনের উৎস কেন্দ্র। কুরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ তাওহিদের উৎস এবং নামাযের প্রকৃত স্থান, আর এ তাওহিদ এবং নামায গোটা দীনের মস্তিষ্ক ও সারাংশ। আকীদার দিক দিয়ে তাওহিদ দীনের আসল বুনিয়াদ এবং আমলের দিক দিয়ে নামায দীনের স্তম্ভ। বায়তুল্লাহর নির্মাণ এ দু' বুনিয়াদী উদ্দেশ্যের জন্যেই। এজন্যে আল্লাহ তাকে কল্যাণ ও বরকতের এবং হেদায়াতের উৎস বলে ঘোষণা করেছেন। مبارکا وهدى للعلمين "এতে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছে এবং বিশ্ববাসীর জন্যে তাকে হেদায়াতের উৎস বানিয়ে দেয়া হয়েছে।"[১]

---

১. সূরা আল বাকারার ১২৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَعَهِدْنَآ اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ -

"এবং আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে অসিয়ত করেছিলাম এই বলে—আমার এ ঘরকে রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্যে পাক রেখো।" সূরা হজ্জে ২৬ আয়াতে বলা হয়-

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা দু' স্থানে তাকে بيتي (আমার ঘর) বলে উল্লেখ করেছেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর বংশধরকে মক্কার প্রস্তরময় মরু প্রান্তরে পুনবার্সিত করার সময় বলেন, হে আল্লাহ ! আমি তাদেরকে তোমার ঘরের প্রতিবেশী করে পুনর্বাসিত করছি।[১] বায়তুল্লাহর মহত্ব এর চেয়ে অধিক আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা এ ঘর যিয়ারত করে হজ্জ করাকে মুসলমানদের ওপরে তার এক অধিকার বলে উল্লেখ করেছেন। আর হজ্জ এই যে, মুমিন ইহরাম বেঁধে অর্থাৎ নিজেকে বায়তুল্লাহতে হাজির হওয়ার যোগ্য জানিয়ে ভক্তি ভরে তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করবে। তাতে লাগানো হিজরে আসওয়াদকে চুমো দেবে। মুলতাযেমের সাথে দেহমন নিবিড় করে দেবে। মসজিদুল হারামে নামায পড়বে এবং আরাফাতে অবস্থান করবে।

তাওয়াফের ফযীলত

আল্লাহর ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য এই যে, তার তাওয়াফ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এর জন্যে তাকীদ করেছেন এবং এ তাকীদ কুরআনে দু' স্থানে করা হয়েছে।

(١) اَنْ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ-

(٢) وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ-

১. আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে পাক রাখ।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৫)

২. এ প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করতে হবে।–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ২৬)

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّاتُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ-

"এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন আমি ইবরাহীম–এর জন্যে এ ঘর নির্ধারিত করেছিলাম হেদায়াত সহ যে, আমার সাথে যেন কাউকে শরীক করা না হয় এবং আমার ঘরকে তাওয়াফ, কিয়াম, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্যে যেন পাক রাখা হয়।"

১. সূরা ইবরাহীমের ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে–

رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ٧

"হে আল্লাহ ! পানি ও তরুলতাহীন মরুপ্রান্তরে তোমার পবিত্র ঘরের পাশে আমার সন্তানদেরকে পুনবার্সিত করলাম।"

তাওয়াফের ফযীলত বর্ণনা করে নবী (স) বলেন, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ নামাযের মতোই এক ইবাদাত। পার্থক্য শুধু এই যে, তাওয়াফে তোমরা কথা বলতে পার এবং নামাযে তার অনুমতি নেই। অতএব তাওয়াফের সময় কেউ কথা বলতে চাইলে মুখ থেকে যেন ভালো কথা বের হয়–(তিরমিযি, নাসায়ী)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, হিজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামেনী হাত দিয়ে স্পর্শ করা গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ। আমি তাকে একথাও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এ ঘর সাতবার তাওয়াফ করেছে এবং পূর্ণ অনুভূতি ও নিবিষ্ট মনে করেছে তার প্রতিদান একটি গোলাম আযাদ করার সমান। নবী (স)-কে আরও বলতে শুনেছি যে, তাওয়াফের সময় যে কদম ওঠাবে তার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে একটি করে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন এবং একটি করে নেকী লিখে দেবেন।–(তিরমিযী)

ইস্তেলাম

ইস্তেলামের আভিধানিক অর্থ স্পর্শ করা এবং চুমো দেয়া। পারিভাষিক অর্থ হিজরে আসওয়াদকে চুমো দেয়া এবং রুকনে ইয়ামেনী স্পর্শ করা। তাওয়াফের প্রত্যেক পাক বা ঘূর্ণন শুরু করার সময় হিজরে আসওয়াদের ইস্তেলাম করা এবং তাওয়াফ শেষ করার সময় হিজরে আসওয়াদের ইস্তেলাম করা সুন্নাত। রুকনে ইয়ামেনীর ইস্তেলাম মুস্তাহাব।

হিজরে আসওয়াদের ইস্তেলামের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে চুমো দেয়ার সময় মুখ থেকে যেন কোনো শব্দ না হয়। হিজরে আসওয়াদে শুধু মুখ রাখা মসনুন। এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অত্যন্ত ভিড়ের কারণে চুমো দেয়া সম্ভব না হলে কোনো ছড়ি প্রভৃতির দ্বারা হিজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তাতে চুমো দেবে। তাও সম্ভব না হলে দু' হাতের তালু হিজরে আসওয়াদের দিকে করে হাত কান পর্যন্ত তুলে হাতে চুমো দেবে।

হিজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনীর ইস্তেলামের ফযীলত সম্পর্কে নবী (স) বলেন–

আল্লাহর কসম ! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জীবন দান করে ওঠাবেন। তার দু'টি চোখ হবে যা দিয়ে সে দেখবে। তার মুখ হবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। যেসব বান্দাহ তার ইস্তেলাম করবে তাদের সপক্ষে সে সাক্ষ্য দেবে।–(তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

রুকনে ইয়ামেনীর দোয়া

রুকনে ইয়ামেনীর ফযীলত বয়ান করতে গিয়ে নবী (স) বলেন—রুকনে ইয়ামেনীতে সত্তরজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। তারা ঐসব প্রত্যেক বান্দার দোয়ার পর আমীন বলে যারা এ দোয়া করে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَا وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ ـ

"হে আল্লাহ ! আমি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা ও স্বাচ্ছন্দ চাই। হে আমাদের রব ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর এবং নেক লোকদের সাথে বেহেশতে স্থান দাও।"

তাওয়াফের প্রকার ও তার হুকুমাবলী

বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছয় প্রকার এবং প্রত্যেকের হুকুম পৃথক পৃথক।

১. **তাওয়াফে যিয়ারত ঃ** একে তাওয়াফে ইফাদা এবং তাওয়াফে হজ্জও বলে। তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের অন্যতম রুকন। কুরআন বলে–وليطوفوا بالبيت العتيق এ প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করা উচিত। ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে তাওয়াফে যিয়ারতের কথাই বলা হয়েছে, যা আরাফাতে অবস্থানের পর দশ তারিখে করা হয়। কোনো কারণে যিলহজ্জের দশ তারিখে করতে না পারলে ১১/১২ তারিখেও করা যেতে পারে।

২. **তাওয়াফে কুদুম ঃ** একে তাওয়াফে তাহিয়্যাও বলে। মক্কা প্রবেশের পর প্রথম যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে কুদুম বলে। এ তাওয়াফ শুধু তাদের জন্য ওয়াজিব যারা মীকাতের বাইরের অধিবাসী।[১] পরিভাষায় একে আফাকী বলে।

৩. **তাওয়াফে বেদা ঃ** বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় নেবার সময় যে শেষ তাওয়াফ করা হয় তাকে বিদায়ী তাওয়াফ বা তাওয়াফে সদর বলে। এ তাওয়াফও আফাকীর (মীকাতের বহিরাগত) জন্যে ওয়াজিব। এ তাওয়াফের পর

---

১. ইলমুল ফিকাহ ৫ম এবং কুদুরীতে একে মসনুন বলা হয়েছে। ইমাম মালেক (র)-এর নিকটে অবশ্যি তাওয়াফে কুদুম ওয়াজিব বলা হয়েছে। তাঁর যুক্তি এই যে, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর যিয়ারতের জন্যে আসবে তার উচিত তাওয়াফে তাহিয়্যা করা।–(আয়নুল হেদায়া, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৯৭)

মুলতাযেমের সাথে নিজেকে জড়িত করে বুক ও ডান গাল তাতে লাগিয়ে এবং ডান হাতে বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে একান্ত বিনয় সহকারে ও অশ্রু কাতর কণ্ঠে দোয়া করা উচিত। এ হচ্ছে বিদায়ের সময় এবং বলা যায় না যে আবার কখন এ সৌভাগ্য হবে। এ তাওয়াফ সম্পর্কে নবী (স)-এর হেদায়াত হচ্ছে–

কেউ যেন বিদায়ী তাওয়াফ না করে বায়তুল্লাহ থেকে ফিরে না যায়। শুধু মাত্র ঐ মেয়েলোকের জন্যে অনুমতি আছে যার হায়েয হয়েছে।–(বুখারী)

৪. **তাওয়াফে উমরাহ ঃ** এ হচ্ছে উমরার তাওয়াফ যা উমরার রুকন। এ তাওয়াফ ছাড়া উমরাহ হবে না।

৫. **তাওয়াফে নযর ঃ** কেউ তাওয়াফে নযর মানলে তা করা ওয়াজিব।

৬. **নফল তাওয়াফ ঃ** এটা যে কোনো সময়ে করা যায়। মক্কায় যতোদিন থাকার সুযোগ হয়। বেশী বেশী তাওয়াফ করার চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য আর মানুষের কি হতে পারে ?

তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহ

তাওয়াফের মধ্যে নয়টি জিনিস যত্ন সহকারে পালন করা ওয়াজিব।

১. **নাজাসাতে হুকমী ঃ** অর্থাৎ হাদাসে আসগার ও হাদাসে আকবার থেকে পাক হওয়া। মেয়েদের জন্যে হায়েয, নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নয়। হযরত আয়েশা (রা)-এর হজ্জের সময় মাসিক ঋতু শুরু হলে তিনি কাঁদতে থাকেন। নবী (স) বলেন, এতে কাঁদার কি আছে ? এ এমন জিনিস যা আদম কন্যাদের রক্তের সাথে সম্পর্কিত। তুমি ওসব কাজ করতে থাক যা হাজীদের করতে হয়। কিন্তু বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না যতোক্ষণ না তুমি তার থেকে পাক হবে।–(বুখারী, মুসলিম)

২. **সতরে আওরত ঃ** অর্থাৎ শরীরের ঐসব অংশ ঢেকে রাখা যা ঢাকা জরুরী। নবী (স) বলেন ঃ لايطوف بالبيت عريان অর্থাৎ উলংগ হয়ে (সতর খুলে) কেউ যেন তাওয়াফ না করে।–(বুখারী)

৩. হিজরে আসওয়াদের ইস্তেলাম থেকে তাওফায় শুরু করা।

৪. তাওয়াফ ডান দিক থেকে শুরু করা। হযরত জাবের (রা) বলেন, নবী (স) মক্কায় তশরিফ আনার পর সর্বপ্রথম তিনি হিজরে আসওয়াদের নিকট

গেলেন, তার ইস্তেলাম করলেন এবং তারপর ডান দিক থেকে তাওয়াফ শুরু করলেন।

৫. পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা। ওজর থাকলে সওয়ারীতে তাওয়াফ জায়েয। নফল তাওয়াফ বিনা ওজরে সওয়ারিতে জায়েয। কিন্তু পায়ে হেঁটে করাই ভালো।

৬. তাওয়াফের প্রথম চার ফরয চক্করের পর বাকী তিন চক্কর (শওত) পুরো করা।

৭. সাত তাওয়াফ শেষ করার পর দু' রাকায়াত নামায পড়া। হযরত জাবের (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে বায়তুল্লাহ পৌছার পর তিনি হিজরে আসওয়াদের ইস্তেলাম করলেন। প্রথম তিন চক্করে তিনি রমল[১] করলেন, বাকী চারটি সাধারণভাবে করলেন। তারপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হলেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى (এবং মাকামে ইবরাহীমকে স্থায়ী জায়নামায বানিয়ে নাও)। তারপর তিনি এমনভাবে দাঁড়ালেন যে মাকামে ইবরাহীম তাঁর ও বায়তুল্লাহর মধ্যখানে রইলো তারপর তিনি নামায পড়লেন।-(মুসলিম)

৮. হাতীমের বাইরে থেকে তাওয়াফ করা যাতে করে হাতীম তাওয়াফের মধ্যে শামিল হয়।

৯. ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে থাকা।

তাওয়াফের দোয়া

খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করার জন্যে হিজরে আসওয়াদের নিকট পৌছলে بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বলে নিম্নের দোয়া পড়তে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

"হে আল্লাহ! তোমার ওপর ঈমান এনে, তোমার কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, তোমার নবী (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণে (এ ইস্তেলাম এবং তাওয়াফের কাজ শুরু করছি)।"

---

১. পরিভাষা দ্রঃ

তাওয়াফের সময় আস্তে আস্তে এ দোয়া পড়তে হবে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

"আল্লাহ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধে, সকল প্রশংসা তার জন্যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই যে সৎপথে চালাতে পারে এবং কোনো শক্তি নেই যে পাপাচার থেকে বাঁচাতে পারে।"

যখন রুকনে ইয়ামেনী পৌঁছবে তখন রুকনে ইয়ামেনী এবং হিজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পড়বে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ -

নিম্নের দোয়াও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ

"হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে তৃপ্তি দান কর যাকিছু তুমি আমাকে দিয়েছ তার ওপর এবং তার মধ্যেই আমাকে বরকত দান কর। আর প্রত্যেকটি অদৃশ্য বস্তুতে তুমি মংগল ও কল্যাণসহ তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যাও।"

তার সাথে নিম্নের দোয়াও পড়া ভালো ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ ছাড়া কেউ ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। শাসন কর্তৃত্ব তারই, প্রশংসা সব তাঁরই এবং তিনি সকল কিছুর ওপর শক্তিমান।"

তাওয়াফের মাসায়েল

১. প্রত্যেক তাওয়াফ অর্থাৎ চক্কর পুরো করার পর দু' রাকায়াত নামায পড়া ওয়াজিব। দু' তাওয়াফ একত্র করা এবং মাঝখানে নামায না পড়া মাকরূহ্ তাহরিমী।

২. সাত চক্কর দেয়ার পর যদি কেউ অষ্টম চক্কর দেয় তাহলে অতিরিক্ত ছয় চক্কর দিয়ে আর এক তাওয়াফ করা দরকার। এজন্যে যে নফল ইবাদাত শুরু করার পর তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৩. যেসব সময়ে নামায মাকরূহ। সেসব সময়ে তাওয়াফ মাকরূহ নয়।

৪. তাওয়াফ করার সময় পাঞ্জেগানা নামাযের মধ্যে কোনো নামাযের সময় এলে, অথবা জানাযা এলে অথবা অযুর প্রয়োজন হলে, এসব থেকে ফিরে আসার পর নতুন করে তাওয়াফ শুরু করার প্রয়োজন নেই। যেখানে ছেড়ে যাবে সেখান থেকেই আবার শুরু করে তাওয়াফ পুরো করবে।

৫. তাওয়াফ করতে করতে যদি ভুলে যায় যে, কত চক্কর হলো, তাহলে নতুন করে শুরু করতে হবে। তবে যদি কোনো নির্ভরযোগ্য লোক স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে তার কথামতো কাজ করবে।

৬. তাওয়াফের সময় খানাপিনা করা, বেচাকেনা করা, গুনগুন করে কবিতা পাঠ বা গান করা এবং বিনা প্রয়োজনে কথা বলা মাকরূহ।

৭. তাওয়াফকালে নাজাসাতে হাকীকী থেকে পাক হওয়া মসনুন।

৮. হজ্জ ও ওমরাহ উভয়ের প্রথমে যে তাওয়াফ করা হয় তাতে রমল করা মসনুন এবং ইযতেবাগও মসনুন। (এগুলোর জন্যে পরিভাষা দ্রঃ)।

রমল

কাঁধ হেলিয়ে-দুলিয়ে দ্রুত চলা, যাতে করে শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রকাশ ঘটে। একে বলা হয় রমল।

নবী (স) যখন সপ্তম হিজরীতে বিরাট সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম (রা) সহ ওমরাহ করার জন্যে মক্কায় আসেন, তখন কিছু লোক পরস্পর এভাবে বলাবলি করতে থাকে—"এদের কি অবস্থা। এরা বড়ো দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিয়েছে। আসলে মদীনার আবহাওয়া বড্ডো খারাপ।"

নবী (স) যখন মক্কাবাসীদের এসব কথা শুনতে পান, তখন তিনি হুকুম দেন—"তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল কর" অর্থাৎ দ্রুত চলে শক্তি প্রদর্শন করবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাহদের সে সময়ের আচরণ এতো পসন্দ করেন যে, তা স্থায়ী সুন্নাত হিসেবে গণ্য হয়।

যে তাওয়াফে সায়ী করা হয় শুধু তাতে 'রমল' সুন্নাত। অতএব যদি কেউ তাওয়াফে কুদুমের পর সায়ী করতে না চায়, সে এ তাওয়াফে রমল করবে না। কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করবে যার পরে তাকে সায়ী করতে হয়। তেমনি কেরান হজ্জকারী যদি তাওয়াফে ওমরায় রমল করে থাকে তাহলে তাওয়াফে হজ্জ রমল করবে না। যদি কেউ প্রথম তিন চক্করে রমল করতে ভুলে যায় তাহলে পরে আর মোটেই করবে না। সাত চক্করেই রমল করা মাকরূহ তানযীহী।

ইযতেবাগ

চাদর প্রভৃতি এমনভাবে গায়ে দেয়া যাতে করে তার এক কিনারা ডান কাঁধের ওপর দেয়ার পরিবর্তে ডান বগলের নীচ দিয়ে গায়ে দেয়া এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা। এভাবেও শক্তি প্রদর্শন করা যায়।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

হজ্জের ওয়াজিব নয়টি

১. সায়ী করা। অর্থাৎ সাফা-মারওয়ার মাঝে দ্রুত চলা।[১]

২. মুযদালফায় অবস্থান করা। অর্থাৎ ফজর শুরু হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সময়ে সেখানে পৌঁছা।

৩. 'রামী' করা। অর্থাৎ জুমরাতে পাথর মারা।

৪. তাওয়াফে কুদুম করা। অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করা। তাওয়াফে কুদুম তাদের জন্যে ওয়াজিব যারা মীকাতের বাইরে থাকে যাদেরকে 'আফাকী' বলা হয়।

৫. বিদায়ী তাওয়াফ করা। অর্থাৎ খানায়ে কা'বা থেকে শেষ বিদায়ের সময় তাওয়াফ করা। এটাও শুধু আফাকীদের জন্যে ওয়াজিব।

---

১. কুরআন পাকের বয়ান থেকে তাই মনে হয়। কিন্তু আহলে হাদীসের মতে সায়ী ফরয। তার দলীল নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

مَا اَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ اَمْرَءٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ـ(مسلم)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির হজ্জ ও ওমরাহ পরিপূর্ণ বলে গণ্য করেন না যে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করলো না।–(মুসলিম)

৬. মাথা মুড়ানো বা চুল ছাঁটা। হজ্জের আরকান শেষ করার পর মাথা মুড়িয়ে ফেলা অথবা চুল ছাঁটা। যুলহজ্জের দশ তারিখে জুমরাতে ওকবায় পাথর মারার পর মাথা মুড়িয়ে ফেলা বা চুল ছাঁটা ওয়াজিব।

৭. কুরবানী করা। এ শুধু 'কারেন' অথবা হজ্জে তামাত্তু-এর জন্যে ওয়াজিব। মুফরেদ-এর ওপর ওয়াজিব নয়।

৮. দু' নামায একত্রে পড়া। অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে যোহর-আসর একত্রে এবং মুযদালাফায় মাগরিব-এশা একত্রে পড়া ওয়াজিব।

৯. রামী, মস্তক মুণ্ডন ও কুরবানী ক্রমানুসারে করা।

সায়ী

অভিধানে সায়ী শব্দের অর্থ যত্ন সহকারে চলা, দৌড়ানো এবং চেষ্টা করা। পারিভাষিক অর্থে সায়ী বলতে হজ্জের সেই ওয়াজিব আমল বুঝায় যাতে হেরেম যিয়ারতকারী সাফা ও মারওয়া নামক দু'টি পাহাড়ের মাঝে দৌড়ায়। সাফা বায়তুল্লাহর দক্ষিণে এবং মারওয়া উত্তর দিকে অবস্থিত। আজকাল এ দু'টি পাহাড়ের নামমাত্র চিহ্ন অবশিষ্ট আছে এবং তাদের মধ্যবর্তী স্থানে দুটি পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। একটি সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত দৌড়ের জন্যে এবং অপরটি মারওয়া থেকে সাফা আসার জন্যে। অর্থাৎ দু'টি পাশাপাশি আপ-ডাউন সড়ক। এ সড়ক দু'টির ওপর বিরাট ছাদ তৈরী করে সড়ক দু'টিকে ঢেকে দেয়া হয়েছে যাতে করে সায়ীকারীগণ রৌদ্রে কষ্ট না পায়।

সায়ীর হাকীকত ও হিকমত

কুরআন পাক বলে-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ সাফা ও মারওয়া নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশাবলীর মধ্যে গণ্য। شعيره শব্দের বহুবচন। কোনো আধ্যাত্মিক মর্ম এবং কোনো ধর্মীয় স্মৃতি অনভব ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে যে জিনিস নিদর্শন স্বরূপ নির্ধারিত করা হয় তাকে شعيره বলে। প্রকৃতপক্ষে এসব স্থান (সাফা মারওয়া) আল্লাহ পুরস্তি এবং ইসলামের বাস্তব বহিঃপ্রকাশের স্মরণীয় স্থান। মারওয়া হচ্ছে সেই স্থান যেখানে আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ)-কে উপুড়

করে শুইয়ে তাঁর গলায় ছুরি চালাতে উদ্যত হয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর দেখা স্বপ্ন কার্যে পরিণত করতে পারেন। সেই সাথে তাঁর জীবনের প্রিয়তম বস্তুকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করে তাঁর স্বীয় উক্তির اسلمت لرب (আমি পুরোপুরি নিজেকে রাব্বুল আলামীনের অধীন করে দিয়েছি) বাস্তব সাক্ষ্যদান করেন।

ইসলাম বা আত্মসমর্পণ করার এ অভিনব দৃশ্য দেখার সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে ডেকে বলেন, ইবরাহীম ! তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ছিল এক বিরাট পরীক্ষা।

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ ـ

"এবং আমরা তাকে এ বলে ডাকলাম, হে ইবরাহীম ! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয় আমরা নেক লোকদের এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। এটা সত্য যে এ হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা।"

সাফা ও মারওয়ার ওপর দৃষ্টি পড়তেই স্বাভাবিকভাবেই মুমিনের মনে কুরবানীর এ গোটা ইতিহাস ভেসে ওঠে। আর সেই সাথে ইবরাহীম ও ইস-মাঈল আলাইহিস সালামের চিত্রও ভেসে ওঠে।

এ সত্যটিকে মনে বদ্ধমূল করার জন্যে এবং এ প্রেরণাদায়ক ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে সায়ীকে আল্লাহ তায়ালা হজ্জের মানাসেকের মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ط فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○ (البقرة ١٥٤)

"অতএব যে ব্যক্তি হজ্জেও ওমরা করে, তার এ দুয়ের মধ্যে সায়ী করতে কোনো দোষ নেই। আর যে আগ্রহ সহকারে কোনো ভালো কাজ করে, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন এবং তার মূল্য দান করেন।"

জাহেলিয়াতের যুগে মক্কার মুশরিকগণ এ দুটি পাহাড়ের ওপর তাদের প্রতিমার বেদী নির্মাণ করে রেখেছিল। সাফার ওপরে 'আসাফের' এবং মারওয়ার ওপরে 'নায়েলার' প্রতিমা ছিল। তাদের চারধারে তাওয়াফ করা হতো। এজন্যে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল যে, এ দু' পাহাড়ের মাঝে তারা 'সায়ী' করবে কিনা। তখন আল্লাহ বলেন এ 'সায়ী' করতে কোনো দোষ

নেই। এজন্যে যে, 'সায়ী' বলতে হজ্জের মানাসেকের (করণীয় অনুষ্ঠানাদি) মধ্যে গণ্য। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের যেসব মানাসেক শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে 'সায়ী' করার নির্দেশও ছিল। এজন্যে কোনো প্রকার ঘৃণা অনীহা ব্যতিরেকেই মুসলমানগণ যেন মনের আগ্রহ সহকারে সাফা-মারওয়ার সায়ী করে। আল্লাহ মনের অবস্থা ভালোভাবে জানেন এবং মানুষের সৎ আবেগ অনুভূতি ও সৎকাজ সম্মানের চোখে দেখেন।

সায়ীর মাসায়েল

১. কাবার তাওয়াফের পর 'সায়ী' করা ওয়াজিব। তাওয়াফের পূর্বে 'সায়ী' জায়েয নয়।

২. 'সায়ী' করার সময় হাদাসে আসগার ও হাদাসে আকবার থেকে পাক হওয়া ওয়াজিব নয় বটে, কিন্তু মসনুন।

৩. 'সায়ী'তেও সাতবার দৌড় দিতে হয়। এ সাতবারই ওয়াজিব।

৪. তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথেই 'সায়ী' শুরু করা মসনূন, তবে ওয়াজিব নয়।

৫. 'সায়ী' সাফা থেকে শুরু করা ওয়াজিব।

৬. 'সায়ী' পায় হেঁটে করা ওয়াজিব। বিশেষ কারণে সওয়ারীতে করা যায়।

৭. গোটা হজ্জে এক বারই সায়ী করা উচিত। তা তাওয়াফে কুদুমের পরে অথবা তাওয়াফে যিয়ারতের পরে হোক। তাওয়াফে যিয়ারতের পর করা ভালো।

৮. সাফা-মারওয়ার ওপরে ওঠা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দু' হাত দোয়ার জন্যে ওঠানো এবং দোয়া করা মসনূন।

৯. সায়ী করার সময় কেনাবেচা মাকরূহ। প্রয়োজন হলে কথা বলা যায়।

সায়ী করার পদ্ধতি ও দোয়া

তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে যিয়ারত যার পরেই সায়ী করা হোক, তাওয়াফ শেষ করে সাফা পাহাড়ে ওঠতে হবে। তারপর এ আয়াত পড়তে হয়– ان الصفا والمروة من شعائر الله (সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত)। সাফার এতোটা উচ্চতায় চড়তে হবে যেন বায়তুল্লাহ চোখে পড়ে। তারপর বায়তুল্লাহর দিক মুখ করে তিনবার আল্লাহু আকবার বলে নিম্নের দোয়া পড়তে হয় ঃ

لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ وَنَجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ -

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তার কোনো শরীক নেই। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের ওপর পরিপূর্ণ শক্তিশালী। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং তিনি একক। তিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তার বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সমস্ত কাফের দলকে পরাজিত করেছেন।"-(মুসলিম)

তারপর দরূদ শরীফ পড়ে যে দোয়া করার ইচ্ছা তা করা উচিত। নিজের জন্যে, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনের জন্যে দোয়া করা উচিত। এ হচ্ছে দোয়া কবুলের স্থান। সে জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যে প্রাণভরে দোয়া করা উচিত। তারপর আবার নিম্নের দোয়া পড়তে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاِنِّىْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَّاتَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ -(موطا)

"আয় আল্লাহ ! তুমি বলেছ আমার কাছে চাও আমি দিব। আর তুমি কখনো ওয়াদা খেলাপ করো না। তোমার কাছে আমার চাওয়া এই যে, তুমি যেমন আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দান করেছ, তেমনি এ সম্পদ থেকে তুমি কখনো আমাকে বঞ্চিত করো না। এভাবে আমার যেন মৃত্যু হয় এবং আমি যেন মুসলমান হয়ে মরতে পারি।"-(মুয়াত্তা)

তারপর সাফা থেকে নেমে মারওয়ার দিকে চলতে হবে এবং এ দোয়া পড়তে হবে—

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ اَعَزُّ الْاَكْرَمُ -

"হে রব ! আমাকে মাফ কর এবং রহম কর। তুমি পরম পরাক্রান্তশালী ও মহান।"

সাফা থেকে মারওয়ার দিকে যাবার পথে বাম দিকে দু'টি সবুজ চিহ্ন পাওয়া যায়। এ দু'টি চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো সুন্নাত। এটা শুধু পুরুষদের জন্যে। মেয়েরা স্বাভাবিক গতিতে চলবে। তারা দৌড়ালে পর্দার ব্যাঘাত ঘটবে।

তারপর মারওয়া পাহাড়ে ওঠার পর ঐসব দোয়া পড়তে হয় যা সাফার ওপরে পড়া হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে যিকির ও তসবিহতে মশগুল থাকা উচিত। কারণ এটা হচ্ছে দোয়া কবুলের স্থান।

তারপর মারওয়া থেকে নেমে পুনরায় সাফার দিকে যেতে হবে এবং ঐসব দোয়া পড়তে হবে যা আসবার সময় পড়া হয়েছে। আর এভাবে দু' সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াতে হবে। এভাবে সাতবার সাফা-মারওয়া দৌড়াদৌড়ি করতে হবে।

রামী

রামীর আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো। পরিভাষা হিসেবে 'রামী' বলে সেই আমলকে যাতে হাজীগণ তিনটি স্তম্ভের ওপর পাথর মারে। জুমরাতে রামী করা ওয়াজিব। জুমরাত জিমার অথবা জুমরাহ শব্দের বহুবচন। প্রস্তর খণ্ডকে জুমরাহ বলে। মিনার পথে কিছু দূরে দূরে অবস্থিত মানুষ সমান তিনটি স্তম্ভ আছে। সে সবের ওপরে যেহেতু পাথর মারা হয় সে জন্যে এগুলোকেও জুমরাত বলা হয়। এ তিনটিকে জুমরায়ে উলা, জুমরায়ে উস্তা এবং জুমরায়ে ওক্‌বাহ বলে। মক্কার নিকটবর্তী যেটি, তাকে জুমরায়ে ওকবাহ বলে। তার পরেরটিকে বলে জুমরায়ে উস্তা এবং তার পরেরটি যা মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী তাকে জুমরায়ে উলা বলে।

রামীর মর্মকথা ও হিকমত

নবী পাক (স)-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বে (অধিকাংশের মতে পঞ্চাশ দিন হবে) হাবশার খৃষ্টান শাসক আবরাহা বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে আগ্রাসন পরিচালনা করে। সে হস্তীবাহিনী সহ বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হতে থাকে। মক্কার অতি নিকটবর্তী মহার উপত্যকা পর্যন্ত সে উপনীত হয়। আল্লাহ তায়ালা তার এ অসৎ উদ্দেশ্য নস্যাৎ করার জন্যে সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। তাদের প্রত্যেকে ঠোঁটে একটি করে এবং দু পায়ে দু'টি করে ছোট ছোট পাথর নিয়ে এসেছিল এবং গোটা সেনাবাহিনীর ওপরে এমন মুষলধারে বর্ষণ করলো যে, অধিকাংশ ঘটনাস্থলেই ধ্বংসস্তুপে পরিণত এবং অবশিষ্ট পথে পড়ে পড়ে মরতে থাকে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা আবরাহার দুরভিসন্ধি নির্মূল করে দেন।

জুমরাতে পাথর মারা সেই ধ্বংসকারী প্রস্তর বর্ষণের স্মৃতি বহন করে। জুমরাতের ওপরে 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করে পাথর নিক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে এ সত্য সম্পর্কে দুনিয়াকে হুঁশিয়ার করে দেয়া এবং আপন সংকল্পের ঘোষণা করা যে, মু'মিনের অস্তিত্ব দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীনের সংরক্ষণ করার জন্যে।

কোনো শক্তি যদি দূরভিসন্ধি সহকারে দীনের প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং তাকে মূলোৎপাটনের চেষ্টা করে তাহলে তাকে নির্মূল করে দেয়া হবে —জুমরাতে পাথর নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে এ সংকল্পের ঘোষণা করা হয়।

রামীর মাসায়েল

১. রামী করা ওয়াজিব। ইমাম মালেকের নিকট জুমরাতে ওকবায় রামী ফরয। এ রামী না করলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

২. নিচু স্থানে দাঁড়িয়ে রামী করা মসনূন। উঁচু স্থান থেকে করা মাকরূহ।

৩. প্রত্যেক পাথর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা মসনূন।

৪. পাথর যদি জুমরাতে না লাগে অর্থাৎ লক্ষ্যচ্যুত হয় তাহলে তাতে দোষ হবে না।

৫. যুলহজ্জের দশ তারিখে অর্থাৎ প্রথম দিন শুধু জুমরায়ে ওকবাতে পাথর মারবে। তারপর এগারো বারো তারিখে তিনটি জুমরাতেই পাথর মারতে হবে। তের তারিখে পাথর মারা মুস্তাহাব। সর্বমোট সাতবার পাথর মারা হচ্ছে। সাতটি করে উনপঞ্চাশটি পাথর মারতে হয়।

৬. একটি বড়ো পাথর ভেঙে সাতটি করা মাকরূহ।

৭. সাতবারের বেশী পাথর মারা মাকরূহ।

৮. সাতটি পাথর সাতবার মারা ওয়াজিব। কেউ এক সাথে সাতটি পাথর মারলে তা একবারই মারা হবে।

৯. রামীর জন্যে মুযদালাফা থেকে আসার সময়ে মুহাস্সার প্রান্তর থেকে ছোট ছোট পাথর সাথে নিয়ে আসা মুস্তাহাব। জুমরাতের আশপাশ থেকে পাথর কুড়িয়ে নেয়া মাকরূহ।

উল্লেখ্য যে, জুমরাতের পাশে যেসব প্রস্তর কণা রয়ে যায় সেগুলো আল্লাহ কবুল করেন। যেগুলো তাঁর দরবারে কবুল হয়, তা ফেরেশতাগণ ওঠিয়ে নিয়ে যান। এজন্যে ওখানে পড়ে থাকা পাথর কণা দিয়ে রামী করা মাকরূহ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! প্রতি বছর আমরা যেসব পাথর কণা দিয়ে 'রামী' করি তার সংখ্যা তো কমে যায় বলে মনে হয়। ইরশাদ হলো, হ্যাঁ, এসবের মধ্যে যেগুলো আল্লাহ কবুল করেন, তা ওঠিয়ে নেয়া হয়। নতুবা তোমরা দেখতে পেতে যে, পাথর কণাগুলো পাহাড়ের মত স্তুপ হয়ে যেতো।-(দারে কুতনী)

১০. যে পাথর কণা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা হয় যে, তা নাপাক, তার দ্বারা রামী করা মাকরূহ।

১১. দশ তারিখে রামী শুরু করতেই তালবিয়া বন্ধ করা উচিত। বুখারী শরীফে আছে যে, হুজুর (স) জুমরায়ে ওকবাতে রামী করা পর্যন্ত তালবিয়া করতে থাকেন।

১২. দশই যুলহজ্জ রামী করার মসনূন সময় হচ্ছে সূর্যোদয় থেকে বেলা গড়া পর্যন্ত। তারপরেও সূর্যাস্ত পর্যন্ত জায়েয, কিন্তু সূর্যাস্তের পর মাকরূহ। অন্য তারিখগুলোতে বেলা গড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রামী করার মসনূন সময়।

১৩. রামী করার জন্যে এক রাত মিনাতে কাটানো মসনূন।

১৪. দশ তারিখে জুমরায়ে ওকবায় রামী করার পর অন্য তারিখগুলোতে নিম্ন ক্রম অনুসারে রামী করা মসনূন ঃ

প্রথমে জুমরায়ে উলাতে রামী করতে হবে যা মসজিদে খায়েফের নিকটে অবস্থিত। তারপর জুমরায়ে উস্তা এবং তারপর জুমরায়ে ওকবা।

১৫. জুমরায়ে উলা ও জুমরায়ে উস্তায় রামী পায়ে হেঁটে করা ভালো এবং জুমরায়ে ওকবায় সওয়ারীতে থেকে করা ভালো।

১৬. জুমরায়ে উলা ও উস্তায় রামী করার পর এতটুকু সময় দাঁড়িয়ে থাকা, যে সময়ে সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করা যায় এবং তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর, দরূদ প্রভৃতি পড়াতে মশগুল থাকা এবং হাত তুলে দোয়া করা মসনূন।

১৭. মিনা ও মক্কার মধ্যবর্তীস্থানে এক প্রান্তর ছিল যাকে মুহাস্‌সাব বলা হতো। এখন সেখানে বসতি হয়ে গেছে। আজকাল তাকে 'মুয়াহেদা' বলে। বিদায় হজ্জে নবী পাক (স) এখানে অবস্থান করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (স) এখানে যোহর, আসর, মাগরিব এবং এশার নামায আদায় করেন। তারপর কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করেন। তারপর এখান থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ পৌঁছে তাওয়াফ করেন।-(বুখারী)

অবশ্য এখানে অবস্থান করা সুন্নাত, ওয়াজিব এবং অপরিহার্য নয়। না করলে কোনো দোষ নেই।

১৮. রামী ওসব বস্তুর দ্বারা করা যায় যার দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। যেমন ইট, পাথর, পোড়া মাটি, পাথর কণা, মাটি, ঢিল প্রভৃতি। কাঠ বা কোনো ধাতব দ্রব্য দ্বারা রামী জায়েয নয়।

রামী করার পদ্ধতি ও দোয়া

জুমরায়ে ওকবাতে প্রথম রামী করার পূর্বে তালবিয়া ছেড়ে দিয়ে রামী করা উচিত। রামী করার মসনূন পদ্ধতি এই যে, কোনো নিচু স্থানে দাঁড়িয়ে প্রথমে এ দোয়া পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا ـ

"আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। শয়তানের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার জন্যে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে (এ কাজ করছি)। হে আল্লাহ ! এ হজ্জকে হজ্জে মাবরুর বানিয়ে দাও। গোনাহ মাফ করে দাও এবং এ চেষ্টা কবুল কর।"

তারপর প্রস্তর কণা আঙুল দিয়ে ধরে প্রত্যেকটি 'আল্লাহু আকবার' বলে মারবে, জুমরাত লক্ষ্য করে মারবে। জুমরায়ে ওকবাতে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর মারা অথবা বড়ো বড়ো ইট বা পাথর দিয়ে মারা, জুমরাতের নিকটে পড়ে থাকা কণা দিয়ে মারা মাকরূহ।

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটার মাসায়েল

মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছাঁটা হজ্জের আমলসমূহের একটি অপরিহার্য আমল। আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে—

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ ط ـ (الفتح : ٢٧)

"তোমরা ইনশাআল্লাহ মসজিদুল হারামে মাথা মুণ্ডন করে অথবা চুল ছেঁটে নিরাপদে প্রবেশ করবে। আর তোমাদের কোনো প্রকারের ভয় ভীতি থাকবে না।"–(সূরা ফাতাহ ঃ ২৭)

আসলে মাথা মোড়ানো বা চুল ছাঁটা ইহরামের অবস্থা থেকে বাইরে আসার এবং হালাল হওয়ার একটা নির্ধারিত শরীয়াতের পন্থা। এর তাৎপর্য সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে শাহ অলীউল্লাহ (র) বলেন, মাথা মোড়ানোর তাৎপর্য এই যে, এ ইহরামের অবস্থা থেকে বাইরে আসার এক বিশেষ নির্ধারিত পদ্ধতি। এমন পদ্ধতি যদি নির্ধারিত করা হতো যা মর্যাদার পরিপন্থী, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ইচ্ছামতো তার ইহরাম খতম করতো এবং পৃথক পৃথক পদ্ধতি প্রবর্তন করতো।–(হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা)

১. দশই যুলহজ্জ কুরবানীর দিন জুমরায়ে ওকবায় রামী করার পর মাথা মোড়ানো বা চুল ছাঁটা ওয়াজিব।

২. পুরুষদের জন্যে মাথা মোড়ানো অথবা চুল ছাঁটা উভয়ই জায়েয। তবে মস্তক মুণ্ডানোর ফযীলত বেশী। এজন্যে যে, নবী (স) মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্য দু'বার মাগফেরাতের দোয়া করেছেন এবং যারা চুল ছাঁটে তাদের জন্যে একবার মাগফেরাতের দোয়া করছেন।–(আবু দাউদ, জামাউল ফাওয়ায়েদ)

৩. মেয়েলোকদের কিছুটা চুল কেটে ফেলা উচিত। তাদের জন্যে মস্তক মুণ্ডন জায়েয নয়। হযরত আলী (রা) বলেন, নবী (স) মেয়েদের মস্তক মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

৪. পুরুষরা সমস্ত মাথার চুলের এক আঙ্গুল পরিমাণ কেটে ফেললে তা জায়েয হবে এবং এক-চতুর্থাংশ চুলের কিছু ছেঁটে ফেলাও জায়েয। মেয়েদের জন্যে তাদের চুলের অগ্রভাগ কিছুটা ছেঁটে ফেললেই যথেষ্ট হবে।

৫. কারো মাথায় যদি চুল মোটেই গজায়নি অথবা টাক থাকে, তাহলে মাথার ওপরে শুধু ক্ষুর বুলালেই যথেষ্ট হবে।

৬. চুল সাফ করার কোনো ওষুধ দ্বারা যদি কেউ চুল সাফ করে তাহলে তাও জায়েয হবে।

৭. মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছাঁটার পর ইহরামের অবস্থার অবসান হয় এবং তারপর তার জন্যে ওসব কাজ হালাল হয়ে যায়, যা ইহরাম অবস্থায় হারাম ছিল। তবে স্ত্রী সহবাস তখনও জায়েয হবে না যতোক্ষণ না তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করা হয়েছে।

কুরবানীর বর্ণনা

কুরবানীর ইতিহাস ততোটা প্রাচীন যতোটা প্রাচীন ধর্ম অথবা মানবের ইতিহাস। মানুষ বিভিন্ন যুগে সমান শ্রদ্ধা, জীবনদান, আত্মসমর্পণ, প্রেম-ভালোবাসা, বিনয়-নম্রতা, ত্যাগ ও কুরবানী, পূজা-অর্চনা ও আনুগত্য প্রভৃতির যে যে পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, আল্লাহর শরীয়াত মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং আবেগ অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ওসব পন্থা-পদ্ধতি স্বীয় বিশিষ্ট নৈতিক সংস্কার সংশোধনসহ আল্লাহ তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষ তাদের আপন কল্পিত দেব-দেবীর সামনে জীবন দানও করেছে। আর এটাই হচ্ছে কুরবানীর উচ্চতম বহিঃপ্রকাশ। এ জীবন দানকেও আল্লাহ তাঁর নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ ধরনের জীবন উৎসর্গ তিনি ছাড়া অন্যের জন্যে হারাম ঘোষণা করেছেন।

মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কুরবানী

মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম কুরবানী হযরত আদম (আ)-এর দু' পুত্র হাবিল ও কাবিলের কুরবানী। এর উল্লেখ কুরআন পাকে রয়েছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ط -(المائدة : ٢٧)

"এবং তাদেরকে আদমের দু' পুত্রের কাহিনী ঠিকমতো শুনিয়ে দাও। যখন তারা দু'জনে কুরবানী করলো, একজনের কুরবানী কবুল হলো, অপরজনের হলো না।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ২৭)

প্রকৃতপক্ষে একজন, যার নাম ছিল হাবিল, মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে একটি অতি সুন্দর দুম্বা কুরবানীরূপে পেশ করে।

অপর ব্যক্তির নাম ছিল কাবিল। সে অমনোযোগ সহকারে খাদ্যের অনুপযোগী খানিক পরিমাণ খাদ্য শস্য কুরবানী স্বরূপ পেশ করলো। হাবিলের কুরবানী আকাশ থেকে এক খণ্ড আগুন এসে জ্বালিয়ে গেল। এটাকে কবুল হওয়ার আলামত মনে করা হতো। অপরদিকে কাবিলের খাদ্য শস্য আগুন স্পর্শই করলো না। আর তা ছিল কবুল না হওয়ার আলামত।

সকল খোদায়ী শরীয়াতে কুরবানী

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যতো শরীয়াত নাযিল হয়েছে সে সবের মধ্যে কুরবানীর হুকুম ছিল। প্রত্যেক উম্মতের ইবাদাতের এ ছিল একটা অপরিহার্য অংশ।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ـ (الحج : ٣٤)

"এবং আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্যে কুরবানীর এক রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যেন তারা ঐসব পশুর ওপর আল্লাহর নাম নিতে পারে যেসব আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন।"-(সূরা হজ্জ ঃ ৩৪)

অর্থাৎ কুরবানী প্রত্যেক শরীয়াতের ইবাদাতের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ ও জাতির নবীদের শরীয়াতে অবস্থার প্রেক্ষিতে কুরবানীর নিয়ম-পদ্ধতি ও খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে। কিন্তু মৌলিক দিক দিয়ে সকল আসমানী শরীয়াতে একথা যে, পশু কুরবানী শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই করতে হবে এবং করতে হবে তাঁর নাম নিয়েই।

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ـ

"অতএব ঐসব পশুর ওপরে শুধু আল্লাহর নাম নাও।"

পশুর ওপর আল্লাহরই নাম নেয়াকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাকে যবেহ করতে হলে আল্লাহর নাম নিয়েই যবেহ করতে হবে এবং তাঁর নাম নিয়েই তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে যবেহ কর। কারণ তিনি তোমাদেরকে এসব পশু দান করেছেন। তিনি এসব তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি তাদের মধ্যে তোমাদের জন্যে বিভিন্ন মংগল নিহিত রেখেছেন।

কুরবানী এক বিরাট স্মরণীয় বস্তু

আজকাল দুনিয়ার সর্বত্র মুসলমানরা যে কুরবানী করে এবং তার ফলে বিরাট উৎসর্গের যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ফিদিয়া। কুরআনে এ মহান কুরবানীর ঘটনা পেশ করে তাকে ইস-লাম, ঈমান ও ইহসান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কুরবানী প্রকৃতপক্ষে এমন এক সংকল্প, দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ ও জীবন দেয়ার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ যে, মানুষের কাছে যাকিছু আছে তা সবই আল্লাহর

এবং তাঁর পথেই তা উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত। এটা এ সত্যেরও নিদর্শন যে, আল্লাহর ইংগিত হলেই বান্দাহ তাঁর রক্ত দিতেও দ্বিধা করে না। এ শপথ, আত্মসমর্পণ ও জীবন বিলিয়ে দেয়ার নামই ঈমান, ইসলাম ও ইহসান।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى ط قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِىٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ○ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ○ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ○ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ○ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ○ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ○ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ○ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ○ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ○ (الصفت ١٠٢ - ١١١)

"যখন সে (ইসমাঈল) তার সাথে চলাফেরার বয়সে পৌছলো তখন একদিন ইবরাহীম তাকে বললো, প্রিয় পুত্র ! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যেন যবেহ করছি। বল দেখি কি করা যায় ? পুত্র (বিনা দ্বিধায়) বললো, আব্বা ! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা শীঘ্র করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে অবিচল দেখতে পাবেন। অবশেষে যখন পিতা পুত্র উভয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সপর্দ করলেন এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুর করে শুইয়ে দিলেন (যবেহ করার জন্যে), তখন আমরা তাকে সম্বোধন করে বললাম, ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমরা সৎকর্মশীলদের এরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। বস্তুত এ এক সুস্পষ্ট অগ্নি পরীক্ষা। আর আমরা বিরাট কুরবানী ফিদিয়া স্বরূপ দিয়ে তাকে (ইসমাঈলকে) উদ্ধার করেছি। আর আমরা ভবিষ্যতের উম্মতের মধ্যে (ইবরাহীমের) এ সুন্নাত স্মরণীয় করে রাখলাম। শান্তি ইবরাহীমের ওপর, এভাবে জীবনদানকারীদেরকে আমরা এ ধরনের প্রতিদানই দিয়ে থাকি। নিশ্চিতরূপে সে আমাদের মু'মিন বান্দাদের মধ্যে শামিল।"-(সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ১০২-১১১)

অর্থাৎ যতোদিন দুনিয়া টিকে থাকবে, ততোদিন উম্মতে মুসলেমার মধ্যে কুরবানীর এ বিরাট স্মৃতি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ফিদিয়া রূপে অক্ষুণ্ন থাকবে। আল্লাহ এ ফিদিয়ার বিনিময়ে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জীবন রক্ষা

করেন এ উদ্দেশ্যে যে, কিয়ামত পর্যন্ত যেন তাঁর উৎসর্গীকৃত বান্দাগণ ঠিক এ দিনে দুনিয়া জুড়ে কুরবানী করতে পারে। এভাবে যেন তারা আনুগত্য ও জীবন দেয়ার এ মহান ঘটনার স্মৃতি জাগ্রত রাখতে পারে। কুরবানীর এ অপরিবর্তনীয় সুন্নাতের প্রবর্তক হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)। আর এ সুন্নাতকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখবে হযরত নবী মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতের জীবন দানকারী মু'মিনগণ।

নবী (স)-এর প্রতি নির্দেশ

কুরবানী ও জীবন দানের প্রেরণা ও চেতনা সমগ্র জীবনে জাগ্রত রাখার জন্যে নবী (স)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ج

وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ○(الانعام ١٦٢-١٦٣)

"বল, [হে মুহাম্মদ (স)] আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই, আমাকে তারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি সকলের আগে তাঁর অনুগত ও ফরমা বরদার।"-(সূরা আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)

আল্লাহর ওপর পাকা-পোক্ত ঈমান এবং তাঁর তাওহীদের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থই এই যে, মানুষের সকল চেষ্টা-চরিত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট হবে। আর সে ঐসব কিছুই তার পথে কুরবান করে তার ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও জীবন দেয়ার প্রমাণ পেশ করবে।

কুরবানীর প্রকৃত স্থান তো সেটা যেখানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী তাদের নিজ নিজ কুরবানী পেশ করে। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে হজ্জের অন্যতম আমল। কিন্তু মেহেরবান আল্লাহ এ বিরাট মর্যাদা থেকে তাদেরকেও বঞ্চিত করেননি যারা মক্কা থেকে দূরে রয়েছে এবং হজ্জে শরীক হয়নি। কুরবানীর আদেশ শুধু তাদের জন্যে নয় যারা বায়তুল্লাহর হজ্জ করে, বরঞ্চ এ এক সাধারণ নির্দেশ। এটা প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমানের জন্যে। আর একথা হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন—নবী (স) দশ বছর মদীনায় বাস করেন এবং প্রতি বছর কুরবানী করতে থাকেন।-(তিরমিযি, মেশকাত)

নবী (স) বলেন, যে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে।-(জামউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (স) ঈদুল আযহার দিনে বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করেছে তাকে পুনরায় করতে হবে। যে নামাযের পরে করেছে তার কুরবানী পূর্ণ হয়েছে এবং সে ঠিক মুসলমানের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

একথা ঠিক যে, ঈদুল আযহার দিনে মক্কায় এমন কোনো নামায হয় না যার আগে কুরবানী করা মুসলমানদের সুন্নাতের খেলাপ। এ মদীনার কথা এবং তার সাক্ষ্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) পেশ করেছেন। তিনি আরও বলেন, নবী (স) ঈদগাহতেই কুরবানী করতেন।

কুরবানীর আধ্যাত্মিক দিক

কুরআন কুরবানীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতি ইংগিত করে। সত্য কথা এই যে, কুরবানী প্রকৃতপক্ষে তা-ই যা এসব উদ্দেশ্যের অনুভূতিসহ করা হয়।

১. কুরবানীর পশু আল্লাহ পুরস্তির নিদর্শন

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ(الحج ٣٦)

"আর কুরবানীর উটগুলোকে আমরা তোমার জন্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর একটি বানিয়ে দিয়েছি।"−(সূরা আল হজ্জ ঃ ৩৬)

شعار শব্দ شعيره -এর বহুবচন। شعيره (শায়ীরাহ) ঐ বিশেষ নিদর্শনকে বলে যা কোনো আধ্যাত্মিক ও অর্থপূর্ণ তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তা স্মরণ করার কারণ ও আলামত হয়ে পড়ে, কুরবানীর পশু ঐ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূত আলামত। কুরবানীকারী আসলে এ আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করে যে, কুরবানীর পশুর রক্ত তার আপন রক্তেরই স্থলাভিষিক্ত। সে আবেগও প্রকাশ করে যে, তার জীবনও আল্লাহর পথে ঐভাবে কুরবানী করা হবে, যেভাবে এ পশু সে কুরবানী করছে।

২. কুরবানী আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের বাস্তব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (الحج ٣٦)

"এভাবে এসব পশুকে তোমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছি যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।"−(সূরা আল হজ্জ ঃ ৩৬)

আল্লাহ্ তায়ালা পশুকে মানুষের বশীভূত করে দিয়ে তাদের ওপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ এসব থেকে বহু উপকার লাভ করে। তার দুধ পান করে, গোশত খায়। তার হাড়, চামড়া, পশম প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরী করে। চাষাবাদে তার সাহায্য নেয়। তাদের পিঠে বোঝা বহন করে, তাদেরকে বাহন হিসেবেও ব্যবহার করে। তাদের দ্বারা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিও প্রকাশ করে। কুরআন এসবের উপকারের দিকে ইংগিত করে ও তাদেরকে মানুষের বশীভূত করার উল্লেখ করে আল্লাহ্•পুরস্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকা◌ের প্রেরণা সঞ্চার করতে চায়। সেই সাথে এ চিন্তাধারাও সৃষ্টি করতে চায় যে, যে মহান আল্লাহ্ এ বিরাট নিয়ামত দান করেছেন—তাঁর নামেই কুরবানী হওয়া উচিত। কুরবানী আল্লাহর বিরাট নিয়ামতের বাস্তব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৩. কুরবানী আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ

كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ط-(الحج ٣٧)

"আল্লাহ্ এভাবে পশুদেরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাঁর দেয়া হেদায়াত অনুযায়ী তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর।"

–(সূরা আল হজ্জ ৩৭)

অর্থাৎ আল্লাহর নামে পশু যবেহ্ করা প্রকৃতপক্ষে একথারই ঘোষণা যে, যে আল্লাহ এসব নিয়ামত দান করেছেন এবং যিনি এসব আমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছেন—তিনিই এসবের প্রকৃত মালিক। কুরবানী সেই আসল মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং একথারও বাস্তব বহিঃপ্রকাশ যে, মু'মিনের অন্তর থেকে আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে সে উপরোক্ত সত্যের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ও ঘোষণা করে এবং মুখে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে এ সত্যের স্বীকৃতি দান করে।

কুরবানীর প্রাণ শক্তি

প্রাক ইসলামী যুগে লোক কুরবানী করার পর তার গোশত বায়তুল্লাহর সম্মুখে এনে রেখে দিত। তার রক্ত বায়তুল্লাহর দেয়ালে মেখে দিত। কুরআন বললো, তোমাদের এ গোশত ও রক্তের কোনোই প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তাঁর কাছে তো কুরবানীর সে আবেগ অনুভূতি পৌঁছে যা যবেহ্ করার সময় তোমাদের মনে সঞ্চারিত হয় অথবা হওয়া উচিত। গোশত ও রক্তের নাম

কুরবানী নয়। বরঞ্চ কুরবানী এ তত্ত্বেরই নাম যে, আমাদের সবকিছুই আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর পথেই উৎসর্গ করার জন্যে।

কুরবানীকারী শুধুমাত্র পশুর গলায় ছুরি চালায় না। বরঞ্চ তার সকল কুপ্রবৃত্তির ওপর ছুরি চালিয়ে তাকে নির্মূল করে। এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানী করা হয়, তা হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সুন্নাত নয়, একটা জাতীয় রসম মাত্র। তাতে গোশতের ছড়াছড়ি হয় বটে, কিন্তু সেই তাকওয়ার অভাব দেখা যায় যা কুরবানীর প্রাণ শক্তি।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط الحج :٣٧)

"ওসব পশুর রক্ত-মাংস আল্লাহর কাছে কিছুতেই পৌঁছে না—বরঞ্চ তোমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের তাক্ওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে।"

যে কুরবানীর পেছনে তাক্ওয়ার আবেগ-অনুভূতি নেই আল্লাহর দৃষ্টিতে সে কুরবানীর কোনোই মূল্য নেই। আল্লাহর কাছে সে আমলই গৃহীত হয় যার প্রেরণা দান করে তাক্ওয়া।

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ۔

"আল্লাহ্ শুধুমাত্র মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন।"

উট কুরবানীর আধ্যাত্মিক দিক

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ق فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ج فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط ۔(الحج : ٣٦)

"এবং কুরবানীর উটগুলোকে আমরা তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ পুরস্তির নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছি। এতে তোমাদের জন্যে শুধু মংগল আর মংগল। অতএব, তাদেরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে—তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও এবং যখন (পড়ে গিয়ে) তাদের পার্শ্বদেশ যমীনে লেগে যাবে তখন তোমরা স্বয়ং তা (গোশত) খাও এবং খাইয়ে দাও তাদেরকে যারা চায় না এবং তাদেরকেও যারা চায়।"-(সূরা হজ্ব ঃ ৩৬)

উট কুরবানী করার নিয়ম এই যে, তাদেরকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে তাদের হলকুমে (কণ্ঠদেশে) ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়, তখন তার

থেকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়। রক্ত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা মাটিতে পড়ে যায়। কুরবানীর এ দৃশ্য একবার মনের মধ্যে অংকিত করুন এবং চিন্তা করুন যে, পশুর এ কুরবানী কোন্ বস্তু। এটা তো এই যে, এভাবে আমাদেরও জীবন আল্লাহর পথে কুরবান হওয়ার জন্যে তৈরী আছে। প্রকৃতপক্ষে এ কুরবানী আপনজনের কুরবানীরই স্থলাভিষিক্ত। এ অর্থেই উট কুরবানীর চিন্তা করুন। তার আহত হওয়া, রক্ত প্রবাহিত হওয়া, মাটিতে পড়ে যাওয়া এবং আল্লাহর পথে জীবন দেয়ার দৃশ্যটা একবার ভেবে দেখুন, যেন মনে হবে যে, জেহাদের ময়দানে আল্লাহর সৈনিকগণ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কণ্ঠদেশে শত্রুর তীর অথবা গুলী বিদ্ধ হচ্ছে, তারপর খুনের ঝর্ণা ছুটছে। তারপর খুনরাঙা যমীন তাদের জীবনদানের সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং তারা একজন মাটিতে পড়ে আল্লাহর হাতে তাদের জান পেশ করছে।

কুরবানীর পদ্ধতি ও দোয়া

যবেহ করার জন্যে পশুকে এমনভাবে শোয়াতে হবে যেন তা কেবলামুখী হয়, ছুরি খুব ধারালো করতে হবে। যথাসম্ভব কুরবানী নিজ হাতে যবেহ করতে হবে। কোনো কারণে নিজে যবেহ করতে না পারলে তার নিকটে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

যবেহ করার সময় প্রথম এ দোয়া পড়তে হবে–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا
وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ـ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ

"আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ইবরাহীমের তরীকার ওপরে একনিষ্ঠ হয়ে ঐ আল্লাহর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি যিনি আসমান যমীন পয়দা করেছেন এবং আমি কখনো শিরককারীদের মধ্যে নই। আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ—রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্যে, তাঁর কোনো শরীক নেই। এ নির্দেশই আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমি অনুগতদের মধ্যে একজন। হে আল্লাহ ! এ তোমারই জন্যে পেশ করা হচ্ছে এবং এ তোমারই দেয়া।"–(মেশকাত)

তারপর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করতে হবে। যবাইয়ের পর এ দোয়া পড়তে হবে—

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ـ

"আয় আল্লাহ ! তুমি এ কুরবানী আমার পক্ষ থেকে কবুল কর যেমন তুমি তোমার পিয়ারা হাবীব মুহাম্মদ (স) এবং তোমার খলীল ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানী কবুল করেছিলে।"

দোয়ার প্রথমে منى শব্দ আছে। নিজের কুরবানী হলে منى বলতে হবে। আর অন্য বা একাধিক লোকের পক্ষ থেকে হলে তাদের নাম বলতে হবে।

কুরবানীর ফযীলত ও তাকীদ

নবী (স) কুরবানীর ফযীলত ও অসংখ্য সওয়াবের উল্লেখ করে বলেন—

১. 'নাহারের দিন' অর্থাৎ যুলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করা থেকে ভালো কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছু নেই। কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশু তার শিং, পশম ও খুর সহ হাজির হবে। কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়। অতএব, মনের আগ্রহ সহ এবং সন্তুষ্ট চিত্তে কুরবানী কর।-(তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

২. সাহাবায়ে কেরাম (রা) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ কুরবানী কি বস্তু ? নবী বলেন, এ তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এতে আমাদের জন্যে কি সওয়াব রয়েছে ? নবী বলেন, তার প্রত্যেক পশমের জন্যে এক একটি সওয়াব পাওয়া যাবে।-(তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, নবী (স) হযরত ফাতেমা যোহরা (রা)-কে বলেন, ফাতেমা ! এসো, তোমার কুরবানীর পশুর কাছে দাঁড়িয়ে থাক। এজন্যে যে, তার যে রক্ত কণা মাটিতে পড়বে তার বদলায় আল্লাহ তোমার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। হযরত ফাতেমা (রা) বলেন, এ সুসংবাদ কি আহলে বায়েতের জন্য নির্দিষ্ট, না সকল উম্মতের জন্যে ? নবী (স) বলেন, আমাদের আহলে বায়েতের জন্যেও এবং সকল উম্মতের জন্যেও।-(জামউল ফাওয়ায়েদ)

৪. হযরত ইবনে বারীদাহ (রা) তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বলেন, নবী (স) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে নামাযে যেতেন না। আর ঈদুর আযহার

দিন ঈদুল আযহার নামাযের আগে কিছু খেতেন না।–(তিরমিযি, আহমাদ) তারপর নামায থেকে ফিরে এসে কুরবানীর কলিজী খেতেন।

কুরবানীর আহ্‌কাম ও মাসায়েল

কুরবানী দাতার জন্য মসনূন আমল

যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন যুলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর শরীরের কোনো অংশের চুল না কাটে, মাথা না মোড়ায় এবং নখ না কাটে। কুরবানী করার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটবে। এ আমল মসনূন, ওয়াজিব নয়। যার কুরবানী করার সামর্থ নেই, তার জন্যেও এটা ভালো যে, সে কুরবানীর দিন কুরবানীর পরিবর্তে তার চুল কাটবে, নখ কাটবে এবং নাভীর নীচের চুল সাফ করবে। এ কাজ তার কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হবে।

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যার কুরবানী করতে হবে সে যেন চাঁদ দেখার পর যতোক্ষণ না কুরবানী করেছে ততোক্ষণ চুল ও নখ না কাটে।–(মুসলিম, জামউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন ঈদুল আযহার দিনে (যুলহজ্জের দশ তারিখে) ঈদ পালন করি। আল্লাহ তায়ালা এ দিন উম্মতের জন্যে ঈদ নির্ধারিত করেছেন। একজন জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! বলুন, একজন আমাকে দুধ পানের জন্যে একটা বকরী দিয়েছেন। এখন ঐ বকরী কি আমি কুরবানী করব ? নবী (স) বলেন, না তুমি তা কুরবানী করবে না। কিন্তু কুরবানীর দিন তোমার চুল ছাঁটবে, নখ কাটবে, গোঁফ ছোট করবে এবং নাভীর নীচের চুল সাফ করবে। বাস আল্লাহর কাছে এ তোমার পুরো কুরবানী হয়ে যাবে।–(জামউল ফাওয়ায়েদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

কুরবানীর পশু ও তার হুকুম

১. কুরবানীর পশু নিম্নরূপ ঃ

উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ। এসব পশু ছাড়া অন্য পশু কুরবানী জায়েয হবে না।

২. দুম্বা, ছাগল, ভেড়া শুধু এক ব্যক্তির জন্যে হতে পারবে। একাধিক ব্যক্তি তাতে অংশীদার হতে পারে না।

৩. গরু, মহিষ ও উটের মধ্যে সাতজন অংশীদার হতে পারে, তার বেশী নয়। তবে তার জন্যে দুটি শর্ত ঃ

প্রথম শর্ত এই যে, প্রত্যেক অংশীদারের নিয়ত কুরবানী অথবা আকীকার হতে হবে। শুধু গোশত খাওয়ার নিয়ত যেন না হয়।

দ্বিতীয় শর্ত এই যে, প্রত্যেকের অংশ ঠিক এক-সপ্তমাংস হবে। তার কম কেউ অংশীদার হতে পারে না।

এ দুটো শর্তের মধ্যে কোনো একটি পূরণ না হলে কুরবানী ঠিক হবে না।

৪. উট ও গরু-মহিষে সাতজনেরও কম অংশীদার হতে পারে, যেমন দুই, চার অথবা তার কমবেশী অংশ কেউ নিতে পারে। কিন্তু এখানেও এ শর্ত জরুরী যে, কোনো অংশীদার $\frac{১}{৭}$ এর কম অংশীদার হতে পারবে না। নতুবা কারো কুরবানী ঠিক হবে না।

৫. এক ব্যক্তি গরু খরিদ করলো এবং তার ইচ্ছা যে অন্য লোককে অংশীদার করে কুরবানী করবে। এটা দুরস্ত হবে। যদি খরিদ করার সময় গোটা গরু নিজের জন্যে খরিদ করার নিয়ত করে পরে অন্য লোককে অংশীদার করার ইচ্ছা করে, তাও জায়েয হবে। অবশ্য এটা করা ভালো যে, সে এমন অবস্থায় তা প্রথম ইচ্ছা অনুযায়ী গোটা পশু নিজের জন্যেই কুরবানী করবে। তবে কাউকে শরীক করতে চাইলে সচ্ছল ব্যক্তিকে শরীক করবে, যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব। এমন ব্যক্তিকে যদি শরীক করা হয় যার কুরবানী ওয়াজিব নয়, তাহলে তা দুরস্ত হবে না।

৬. গরু মহিষের কুরবানীতে কেউ এক বা একাধিক অতিরিক্ত লোকের অংশ নিজে নিজেই ঠিক করলো, অংশীদারদের অনুমতি নেয়া হলো না, তাহলে এ কুরবানী জায়েয হবে না। যাদের অংশ রাখা হবে তাদের অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে। এটা করা যাবে না যে, কুরবানীর অংশীদার মনে মনে ঠিক করে প্রথমে কুরবানী করা হলো এবং তারপর অংশীদারের অনুমতি পরে নেয়া হলো।

৭. দুম্বা, ছাগল, ভেড়া পূর্ণ এক বছর বয়সের হলে তার কুরবানী দুরস্ত হবে। এক বছরের কম হলে কুরবানী হবে না। গরু, মহিষ পূর্ণ দু' বছরের হতে

হবে। দু' বছরের কম হলে কুরবানী হবে না। উট পাঁচ বছরের হলে কুরবানী হবে। তার কম হলে জায়েয হবে না।

৮. যে পশুর শিং জন্ম থেকে ওঠেনি, অথবা ওঠার পর কিছু অংশ ভেঙ্গে গেছে তাহলে তার কুরবানী করা জায়েয হবে। কিন্তু শিং যদি গোড়া থেকেই ভেঙ্গে যায় তাহলে তা কুরবানী জায়েয হবে না।

৯. অন্ধ, কানা পশুর কুরবানীও জায়েয নয়। যে পশু তিন পায়ের ওপর চলে এমন ল্যাংড়া পশু কুরবানী করাও জায়েয হবে না। চতুর্থ পা যদি মাটিতে রাখে কিন্তু খুড়িয়ে চলে, তাহলে দুরস্ত হবে।

১০. যে পশুর কান এক-তৃতীয়াংশের বেশী কাটা অথবা লেজ এক-তৃতীয়াংশের বেশী কাটা তার কুরবানী দুরস্ত হবে না।

১১. দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ পশু কুরবানী করা জায়েয হলেও মোটাতাজা ও সুন্দর পশু কুরবানী করা ভালো। পশু যদি এমন দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ হয় যে, তার হাড় একেবারে মজ্জাহীন হয়ে পড়েছে—তাহলে তার কুরবানী দুরস্ত হবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, নবী (স) শিং বিশিষ্ট মোটা তাজা একটা দুম্বা কুরবানী করছিলেন যার চোখের চারপাশে কালো রঙ ছিল, যার মুখও কালো রঙের ছিল এবং যার পাগুলো ছিল কালো রঙের।-(আবু দাউদ)

১২. যে পশুর জন্ম থেকেই কান হয়নি অথবা হয়ে থাকলে খুব ছোট ছোট তা কুরবানী করা দুরস্ত হবে।

১৩. যে পশুর দাঁত মোটেই নেই তার কুরবানী দুরস্ত হবে না। কিছু দাঁত পড়ে গেছে এবং অধিকাংশ দাঁত আছে তাহলে জায়েয হবে।

১৪. খাঁশি, পাঁঠা কুরবানী জায়েয। নবী (স) স্বয়ং খাঁশি দুম্বা কুরবানী করেছেন।

১৫. যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব এমন এক সচ্ছল ব্যক্তি কুরবানীর জন্যে একটি পশু খরিদ করলো। খরিদ করার পর তার মধ্যে এমন ত্রুটি পাওয়া গেল, যার জন্যে তা কুরবানী করা দুরস্ত হলো না। তখন সে আর একটি পশু খরিদ করে কুরবানী করবে। তবে কোনো দরিদ্র লোকের এমন অবস্থা

হলে—যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল না, তার পক্ষে ঐ ক্রটিপূর্ণ পশু কুরবানী করা জায়েয হবে।

১৬. গাই-বকরী গর্ভবতী হলেও তা কুরবানী জায়েয হবে। বাচ্চা জীবিত হলে তাও যবেহ্ করা উচিত।

কুরবানীর হুকুম

১. কুরবানী করা ওয়াজিব। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করবে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রা)-কে একজন জিজ্ঞেস করলো কুরবানী কি ওয়াজিব ? তিনি বলেন, নবী (স) এবং মুসলমানগণ কুরবানী করেছেন। ঐ ব্যক্তি পুনরায় সে প্রশ্ন করলে তার জবাবে হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, তুমি বুঝতেছ না যে, নবী (স) এবং মুসলমানগণ কুরবানী করেছেন।

২. কুরবানী 'কারেন' এবং 'মুতামাত্তার' ওপরে ওয়াজিব। তবে মুফরেদের ওপর ওয়াজিব নয়। সে যদি আপন ইচ্ছায় করে তাহলে তার সওয়াব পাবে।

৩. হাজীদের ছাড়া অন্যান্য সাধারণ মুসলমানের ওপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার দুটো শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত এই যে, যে সচ্ছল হবে। সচ্ছল হওয়ার অর্থ তার ততোটা ধন-সম্পদ থাকতে হবে যে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অতিরিক্ত এতো সম্পদ থাকবে যে, তা হিসেব করলে নেসাব পরিমাণ হবে। অর্থাৎ যার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব।

দ্বিতীয় শর্ত এই যে, মুকীম হতে হবে। মুসাফিরের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

৪. কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব—না বিবির পক্ষ থেকে, আর না সন্তানের পক্ষ থেকে।

৫. কোন ব্যক্তির ওপরে শরীয়াতের দৃষ্টিতে কুরবানী ওয়াজিব ছিল না। কিন্তু সে কুরবানী করার নিয়তে পশু খরিদ করেছে। তাহলে সে পশু কুরবানী করা তার ওয়াজিব হবে।

৬. এক ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল, কুরবানীর তিন দিন অতীত হয়ে গেল কোনো কারণে সে কুরবানী করতে পারলো না। যদি এ উদ্দেশ্যে সে

কোনো ছাগল খরিদ করে থাকে তাহলে জীবিত সে ছাগল খয়রাত করে দেবে। খরিদ করে না থাকলে একটি ছাগলের মূল্য খয়রাত করবে।

৭. কেউ এ বলে মানত মানলো যে, যদি আমার অমুক কাজটি হয়ে যায় তাহলে কুরবানী করবো। আল্লাহর ফযলে তার সে কাজ হয়ে গেল। এখন সে ব্যক্তি সচ্ছল হোক অথবা অসচ্ছল তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। মানত কুরবানীর হুকুম এই যে, তার সমস্ত গোশত গরীব ও অভাবগ্রস্ত লোকের মধ্যে বণ্টন করে দেবে—না কুরবানীকারী খাবে এবং না কোনো সচ্ছল ব্যক্তিকে খাওয়াবে।

কুরবানীর দিনগুলো ও সময়

১. ঈদুল আযহা অর্থাৎ যুলহজ্জের দশ তারিখ থেকে বারো তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করার সময়। এ তিন দিনের যে কোনো দিনে সুযোগ সুবিধা মতো কুরবানী করা জায়েয। তবে কুরবানী করার সবচেয়ে উত্তম দিন হলো ঈদুল আযহার দিন। তারপর এগারো তারিখ এবং তারপর বারো তারিখ।

২. শহর ও বন্দরের অধিবাসীদের জন্যে ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী জায়েয নয়। নামাযের পর কুরবানী করবে। তবে গ্রামাঞ্চলের লোক ফজর নামাযের পরও কুরবানী করতে পারে।[১]

৩. শহরের অধিবাসী যদি তাদের কুরবানী গ্রামাঞ্চলে করায় তাহলে তাদের কুরবানী গ্রামাঞ্চলে ফজরের পরও হতে পারে। ঈদের নামাযের পূর্বেই যদি গোশত এসে যায় তাহলেও কুরবানী জায়েয হবে।

৪. কুরবানীর দিনগুলোতে অর্থাৎ ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময়ে দিনে বা রাতে, কুরবানী করা জায়েয।

তবে রাতে কুরবানী না করা ভালো। কারণ কোনো রগ হয়তো ভালোভাবে কাটা নাও যেতে পারে যার জন্যে কুরবানী দুরস্ত হবে না।

৫. কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার দুটো শর্ত মুকীম হওয়া এবং সচ্ছল হওয়া। যদি কোনো ব্যক্তি সফরে থাকে এবং বারো তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে বাড়ী পৌঁছে এবং সে যদি সচ্ছল হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হবে ; সে যদি মুকীম এবং দরিদ্র হয়, কিন্তু ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে যদি আল্লাহ তাকে মালদার বানিয়ে দেয় তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

---

১. সম্ভবত এজন্যে যে, বহু দূর দূরান্তের ঈদগাহ থেকে নামায পড়ে আসতে বহু বিলম্ব হবে এমন কি বিকেল হয়ে যেতে পারে।–সম্পাদক

কুরবানীর বিভিন্ন মাসায়েল

১. কুরবানী করার সময়ে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা বা দোয়া পড়া জরুরী নয়। শুধু মনের নিয়ত ও ইরাদা কুরবানী সহীহ হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। তবে মুখে দোয়া পড়া ভালো।

২. নিজের কুরবানী নিজ হাতে যবেহ করা ভালো। কোনো কারণে নিজে যবেহ করতে না পারলে—পশুর কাছে হাজির থাকা দরকার। যেমন—নবী (স) হযরত ফাতেমা (রা)-কে বলেছিলেন—ফাতেমা চল, তোমার কুরবানীর কাছে দাঁড়িয়ে থাক। এজন্যে যে, তার প্রতিটি রক্ত কণার বদলায় তোমার পূর্বের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। ফাতেমা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! একি আমাদের আহলে বায়তের জন্যে নির্দিষ্ট, না সকল সাধারণ মুসলমানদের জন্যে ? নবী (স) বলেন, আমাদের জন্যেও এবং সকল মুসলমানদের জন্যেও।–(জামউল ফাওয়ায়েদ)

৩. গরু মহিষ প্রভৃতি কুরবানীতে কয়েকজন শরীক হলে গোশত ভাগ অনুমান করে করা চলবে না। বরঞ্চ মাথা, গুর্দা, কলিজী প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিস সমান সমান সাত ভাগ করতে হবে। তারপর যার যতো অংশ তাকে ততোটা দিতে হবে।

৪. কুরবানীর গোশত নিজেও খাবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও বন্টন করা যায়। এক-তৃতীয়াংশ গরীব মিসকীনের মধ্যে বন্টন করে বাকী নিজের মধ্যে এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বন্টন করা ভালো। কিন্তু এটা অপরিহার্য নয় যে, এক-তৃতীয়াংশ গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তার কম গরীব দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করলেও কোন দোষ নেই।

৫. গরু মহিষ বা উটে কয়েক ব্যক্তি অংশীদার রয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে গোশত ভাগ করে নেয়ার পরিবর্তে যদি সব একত্রে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে অথবা রান্না করে তাদেরকে খাওয়াতে চায় তাহলে তা জায়েয হবে।

৬. কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে দেয়াও জায়েয। তবে মজুরী বাবদ দেয়া জায়েয নয়।

৭. কুরবানীর চামড়া অভাবগ্রস্তকে দেয়া যায় অথবা তা বিক্রি করে মূল্যও খয়রাত করা যায়। এ মূল্য তাদেরকে দেয়া উচিত যাদেরকে যাকাত দেয়া যায়।

৮. কুরবানীর চামড়া নিজের কাজেও ব্যবহার করা যায়। যেমন জায়নামায বানানো হলো।

৯. কসাইকে গোশত বানাবার মজুরী স্বরূপ গোশত, চামড়া, রশি প্রভৃতি দেয়া ঠিক হবে না। মজুরী পৃথক দিতে হবে। রশি, চামড়া প্রভৃতি খয়রাত করতে হবে।

১০. যার ওপর কুরবানী ওয়াজেব তাকে তো করতেই হবে। যার ওপর ওয়াজিব নয়, তার যদি খুব বেশী কষ্ট না হয় তাহলে তারও করা উচিত। অবশ্য ধার কর্জ করে কুরবানী করা ঠিক নয়।

মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানী

আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন সে শুধু তার ওয়াজিব কুরবানী করেই ক্ষ্যান্ত হবে না। বরঞ্চ কুরবানীর অফুরন্ত সওয়াব পাওয়ার জন্যে আপন মুরব্বীদের পক্ষ থেকে যথা মৃত মা-বাপ, দাদা-দাদী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ভালো। এমন কি যার বদৌলতে হেদায়াত ও ঈমানের সম্পদ লাভ সম্ভব হয়েছে এমন হাদী ও মুরশিদের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া তো মুমিনের জন্যে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। এভাবে আযওয়াজে মুতাহহেরা অর্থাৎ রূহানী মা-দের পক্ষ থেকে কুরবানী করাও অশেষ সৌভাগ্যের কথা।

হাদী'র বয়ান

'হাদী' শব্দের আভিধানিক অর্থ হাদীয়া তোহফা, শরীয়াতের পরিভাষায় হাদী ঐ পশুকে বলা হয় যাকে হেরেম যিয়ারতকারী কুরবানীর জন্যে সাথে নিয়ে যায় অথবা কোনো উপায়ে সেখানে পাঠিয়ে দেয়।

১. 'হাদী' তিন প্রকার ঃ উট, গরু, ছাগল। উট সর্বোৎকৃষ্ট হাদী এবং ছাগল সর্বনিম্ন। ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি ছাগলের পর্যায়ে এবং মহিষ প্রভৃতি গরু গাভীর পর্যায়ে।

২. হাদীর পশুর বয়স, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে হুকুম ও শর্ত তাই যা কুরবানীর পশু সম্পর্কে রয়েছে।

৩. হাদী যদি ইচ্ছাকৃত হয়, যেমন ইফরাদ হজ্জকারী আপন ইচ্ছায় নফল কুরবানী করে। তাহলে সে কুরবানীর গোশত হাদীকারী নিজেও খেতে

পারে। তেমনি কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারী আপন আপন কুরবানীর গোশত খেতে পারে। যেমন সাধারণ কুরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয। কারণ কেরান এবং তামাত্তুর হাদী কোনো অপরাধ অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফ্ফারা নয়। বরঞ্চ শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারীর ওপর ওয়াজিব করেছেন। এজন্যে সাধারণ কুরবানীর গোশতের মতো তা খাওয়া জায়েয। নবী (স) তার হাদীর প্রত্যেকটি পশুর এক এক টুকরা রান্না করিয়ে খেয়েছেন এবং তার শুরবাও পান করেছেন। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর বর্ণনা এবং অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা থেকে একথা প্রমাণিত আছে যে, নবী (স) হজ্জে কয়েকটি কুরবানী করেন। প্রকাশ থাকে যে, কেরান এবং তামাত্তুর তো একটি কুরবানীই হয়ে থাকে এবং বাকীগুলো নফলই হয়ে থাকবে। তিনি যখন প্রত্যেকটি থেকে এক একটা টুকরা রান্না করিয়ে খেয়েছেন তাহলে জানা গেল যে, তামাত্তু, কেরান এবং নফল তিন প্রকারের গোশত কুরবানীকারী স্বয়ং খেতে পারে।

৪. তামাত্তু, কেরান ও ইচ্ছাকৃত নফল কুরবানীর গোশত ছাড়া কোনো হাদীর গোশত নিজের খাওয়া জায়েয নয়। তা সে কোনো অপরাধের কাফ্ফারার হাদী হোক কিংবা মানতের অথবা ইহসারের দমের[১] কুরবানী হোক। নবী (স) যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় বাধাপ্রাপ্ত হলেন এবং বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যেতে পারলেন না, তখন তিনি নাজিয়া আসলামীর মাধ্যমে ইহসারের হাদী পাঠিয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, তার গোশত সে যেন না খায় এবং সংগীকেও খেতে না দেয়।

৫. যে হাদীর গোশত নিজের খাওয়া জায়েয নয় তার সমস্ত গোশত ফকীর মিসকীনকে সদকা করে দিতে হবে এবং তা করা ওয়াজিব। হেরেমের গরীবদের মধ্যে হোক অথবা তার বাইরের হোক উভয়ই জায়েয। হেরেমের গরীবদের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।-(আয়নুল হেদায়া)

৬. যে হাদীর গোশত খাওয়া জায়েয তার সমস্ত গোশত ফকীর মিসকীনকে সদকা করা ওয়াজিব নয়। বরঞ্চ মুস্তাহাব। তার তিন ভাগ করা উচিত। এক ভাগ নিজের জন্যে, এক ভাগ আত্মীয় স্বজনের জন্যে এবং এক ভাগ ফকীর মিসকীনের জন্যে। তবে এমন করা জরুরী নয়। সমস্তই ফকীর মিসকীনকে দিলেও তা জায়েয হবে।

---

১. পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

আবে যমযম, আদব কায়দা ও দোয়া

বায়তুল্লাহর পূর্বদিকে একটি ঐতিহাসিক কূপ আছে যাকে যমযম বলে। হাদীসে এ কুয়ার অনেক ফযীলত ও তার পানির অনেক বরকত ও ফযীলত বয়ান করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর হুকুমে যখন হযরত ইসমাঈল (আ) ও তার মা হযরত হাজেরা (আ)-কে মক্কার বারিহীন মরুভূমিতে এনে পুনর্বাসিত করলেন তখন আল্লাহ তায়ালা মাতা ও সন্তানের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রস্তরময় প্রান্তরে তাদের জন্যে যমযম প্রশ্রবণ প্রবাহিত করে ছিলেন। হাদীসে আছে—

هِىَ هَزْمَةُ جِبْرِيْلَ وَسُقْيَا اِسْمٰعِيْلَ -(دار قطنى)

"এ হচ্ছে জিবরাঈলের তৈরী করা কূপ এবং ইসমাঈল (আ)-এর পানি পানের ছোট হাউয।"-(দারু কুতনী)

সায়ী এবং মাথা মুণ্ডন প্রভৃতি শেষে পেট ভরে যমযমের পানি পান করা উচিত। এমন বেশী করে পানি পান করা, যাতে পাজরাগুলো ডুবে যায়, এটা ঈমানের আলামত। ঈমান থেকে বঞ্চিত মুনাফিক এতোটা পান করতে পারে না। নবী (স) বলেন—আমাদের এবং মুনাফিকদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন এই যে, মুনাফিক যমযমের পানি পেটভরে পান করতে পারে না যাতে পাজরা ডুবে যায়।-(ইবনে মাজাহ্)

আবে যমযমের বরকত ও ফযীলত বয়ান করতে গিয়ে নবী (স) বলেন, আবে যমযম যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয় তার জন্যেই ফলদায়ক হয়। রোগ আরোগ্যের জন্য পান করলে আল্লাহ আরোগ্য দান করবেন। তৃপ্তি লাভের জন্যে পান করা হলে আল্লাহ তৃপ্তিদান করবেন। পিপাসা নিবারণের জন্যে পান করলে আল্লাহ পিপাসা নিবারণ করবেন। এ হচ্ছে সেই কূয়া যা জিবরাঈল (আ) পায়ের গোড়ালীর আঘাতে খনন করেন এবং এ হচ্ছে ইসমাঈল (আ)-এর পানি পানের উন্মুক্ত জলাধার।-(দারু কুতনী)

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) বিশেষভাবে হযরত ইসমাঈল (আ)-ও তার মাতা হযরত হাজেরা (আ)-এর জন্যে বারিহীন অনুর্বর প্রান্তরে যমযম বানিয়ে দিয়েছিলেন যাতে করে তাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) এরশাদ করেছেন, দুনিয়ার সকল পানি থেকে উৎকৃষ্ট যমযমের পানি। ক্ষুধার্তদের জন্যে এ আহার, রোগীর জন্যে আরোগ্য।-(ইবনে আব্বাস)

তিনি আরও বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে যমযমের পানি পান করে যে, সে দুশমন থেকে আশ্রয় লাভ করবে—তাহলে সে আশ্রয় পাবে। -(হাকেম)

যমযমের পানি দাঁড়িয়ে এবং বিসমিল্লাহ্ বলে পান করা উচিত এবং পেটভরে পান করা উচিত। পান করার সময় এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ۔

"আয় আল্লাহ আমি তোমার কাছে মংগলকর ইল্ম চাই, প্রশস্ত রুজি চাই এবং প্রত্যেক রোগ থেকে আরোগ্য চাই।"-(নায়লুল আওতার)

মুলতাযেম ও তার দোয়া

মুলতাযেম বায়তুল্লাহর দেয়ালের সে অংশকে বলে যা কাবার দরজা এবং হিজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ প্রায় ছ' ফুটের একটা অংশ এবং দোয়া কবুলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর মধ্যে একটি। এর সাথে দেহ, বুক ও মুখ লাগিয়ে বিনয় নম্রতার সাথে ও কাতর কণ্ঠে দোয়া করা হজ্জের একটা মসনূন আমল। তাওয়াফ শেষ করার পর মুলতাযেমের সাথে আলিংগনাবদ্ধ হওয়া ও দোয়া করা বিশেষ করে এমন এক অনুভূতি ও ভাবাবেগ সৃষ্টি করে যে, এটা বায়তুল্লাহ্ থেকে বিদায় হওয়ার এক বেদনাদায়ক মুহূর্ত।

হযরত আমর বিন শুয়াইব (রা) বলেন, আমার পিতা শুয়াইব বর্ণনা করেছেন, আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ বিন আমর আল আস (রা)-এর সাথে তাওয়াফ করার সময় কিছু লোককে বায়তুল্লাহ্র সাথে আলিংগনাবদ্ধ দেখলাম। তখন আবদুল্লাহ্ বিন আমরকে বললাম, আমাকে একটু ঐ জায়গায় নিয়ে চলুন, লোকদের সাথে আমরাও বায়তুল্লাহ্র সাথে আলিংগন করি। তিনি বললেন আউযুবিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজীম। তারপর যখন তিনি তাওয়াফ শেষ করলেন তখন হিজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মধ্যবর্তী বায়তুল্লাহ্র ঐ অংশের সাথে আলিংগনাবদ্ধ হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম এটা ঐ স্থান যার সাথে নবী (স)-কে আলিংগনাবস্থায় দেখেছি।-(বায়হাকী)

আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) হিজরে আসওয়াদ এবং বাবে কা'বার মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আপন বক্ষ, মুখমণ্ডল ও দু' হাত প্রসারিত করে কা'বার দেয়ালে রাখলেন এবং বললেন, নবী (স)-কে এমন করতে দেখেছি।-(আবু দাউদ)

মুলতাযেমের দোয়া সম্পর্কে নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন হয়ে এখানে দোয়া চাইবে সে অবশ্যই নিরাপদ হবে।-(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

মুলতাযেমের সাথে দেহ আবিষ্ট করে প্রথমে নিম্নের দোয়া পড়বে। তারপর দীন-দুনিয়ার জায়েয মনস্কামনা পূরণের দোয়া করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَكَ وَيُكَافِيْ مَزِيْدَكَ اَحْمَدُكَ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَعَلٰى جَمِيْعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَعَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَاَعِذْنِيْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَقَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ اَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَاَلْزِمْنِيْ سَبِيْلَ الْاِسْتِقَامَةِ حَتّٰى اَلْقَاكَ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-(اذکار نودی)

"আয় আল্লাহ ! প্রশংসার হকদার তুমিই, এমন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা যার দ্বারা তোমার নিয়ামতের কিছু হক আদায় হতে পারে। আর এসব নিয়ামতের ওপর কিছু এহসান ও এনামের কিছু বিনিময় হতে পারে। আমি তোমার প্রশংসা করছি তোমার ঐসব গুণাবলীর সাথে যা আমার জানা আছে আর যা জানা নেই, আমি তোমার প্রশংসা করছি তোমার ঐসব নিয়ামতের সাথে যা আমার জানা আছে আর যা জানা নেই। সকল অবস্থায় আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আয় আল্লাহ ! দরূদ ও সালাম মুহাম্মাদ (স)-এর ওপরে এবং মুহাম্মাদের বংশধরদের ওপর। আয় আল্লাহ! মরদুদ শয়তান থেকে তোমার পানাহ চাই এবং প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে আমাকে আশ্রয় দাও। তুমি যাকিছু আমাকে দিয়েছ তার ওপর তুষ্ট থাকতে দাও। আমার জন্যে তাতে বরকত দাও। আয় আল্লাহ ! তুমি আমাকে তোমার সম্মানিত মেহমানদের মধ্যে শামিল কর। আর তুমি আমাকে সোজা পথে চলবার তওফীক দাও, রাব্বুল আলামীন, যতোক্ষণ না আমি তোমার সাথে মিলিত হই।"

দোয়া কবুলের স্থানসমূহ

হজ্জের সময় প্রত্যেক আমল করতে গিয়ে যিকর তসবীহতে মশগুল থাকা এবং প্রত্যেক স্থানে বেশী করে দোয়া করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে কিছু

নির্দিষ্ট স্থানে অধিক পরিমাণে দোয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। হযরত হাসান বসরী যখন মক্কা থেকে বসরায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন মক্কাবাসীদের নিকটে একটা পত্র লেখেন। তাতে তিনি মক্কায় অবস্থানের গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করেন এবং বিশেষ করে বলেন যে, নিম্নের এগারোটি স্থানে বিশেষভাবে মু'মিনের দোয়া কবুল হয় ঃ

১. মুলতাযেমের সাথে দেহ-মন আবিষ্ট করে দোয়া করা। নবী (স) বলেন, মুলতাযেম এমন এক স্থান যেখানে দোয়া কবুল হয়। এখানে বান্দাহ্ যে দোয়াই করে তা কবুল হয়।

২. মিযআবের নিচে।

৩. পাক কাবার ভেতরে।

৪. যমযমের নিকটে।

৫. সাফা-মারওয়ায়।

৬. সাফা-মারওয়ায় যেখানে দৌড়ে চলতে হয়।

৭. মাকামে ইবরাহীমের নিকটে।

৮. আরাফাতের ময়দানে।

৯. মুযদালফায়ে।

১০. মিনায়।

১১. জুমরাতের পাশে।

ওমরা

ওমরা অর্থ প্রতিষ্ঠিত গৃহের যিয়ারত করা এবং শরীয়াতের পরিভাষায় ওমরার অর্থ ছোট হজ্জ যা সবসময়ে হতে পারে। তার জন্যে কোনো মাস ও দিন নির্ধারিত নেই। যখনই মন চাইবে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে, সায়ী করবে এবং মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছেঁটে ইহরাম খুলবে। ওমরা হজ্জের সাথেও করা যায় এবং আলাদাও করা যায়। কুরআন বলে–

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ـ

"এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হজ্জ ও ওমরা করি।"–(সূরা আল বাকারা)

হাদীসে ওমরার বিরাট ফযীলত বয়ান করা হয়েছে। নবী (স) বলেন, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল ঈমানের সাক্ষ্যদান। তারপর হিজরত ও জিহাদের

মর্যাদা। তারপর দুটো আমলের চেয়ে উৎকৃষ্ট আমল আর কিছু নেই—একটি হজ্জে মাবরুর এবং দ্বিতীয়টি ওমরাহ মাবরুর।[১]

ওমরাহ মাবরুর অর্থ এমন ওমরাহ যা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তার সকল নিয়ম নীতি ও শর্তগুলোসহ পালন করা হয়।

নবী (স) আরও বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরার নিয়তে বাড়ী থেকে রওয়ানা হলো এবং তারপর সে পথেই মৃত্যুবরণ করলো, সে বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বায়তুল্লাহ যিয়ারতকারীদের জন্যে গর্ববোধ করেন।-(বায়হাকী, দারুকুতনী)

নবী (স) বলেন, হজ্জ ও ওমরাহকারী আল্লাহর মেহমান। তারা আল্লাহর দাওয়াতে আসে। অতএব, তারা যাকিছু তার কাছে চায়, তা পায়।
-(আল-বাযযার)

এক ওমরাহ দ্বিতীয় ওমরাহ পর্যন্ত গুনাহগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যায়।
- (বুখারী, মুসলিম)

ওমরার মাসায়েল

১. জীবনে একবার ওমরা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তাছাড়া তা যখনই করা হোক, তার জন্যে প্রতিদান ও বরকত রয়েছে। হযরত জাবের (রা) বলেন, নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—ওমরাহ কি ওয়াজিব ? নবী (স) বলেন—না, তবে ওমরা করো, এর বড়ো ফযীলত রয়েছে।

২. ওমরার জন্যে কোনো মাস, দিন ও সময় নির্ধারিত নেই যেমন হজ্জের জন্যে রয়েছে। যখনই সুযোগ হবে ওমরাহ করা যেতে পারে।

৩. রমযানে ওমরাহ করা মুস্তাহাব। নবী (স) বলেন, রমযানে ওমরা করা এমন যেন আমার সাথে হজ্জ করা-(আবু দাউদ)। বুখারীতে আছে, রমযানের ওমরা হজ্জের সমান।

৪. ওমরার জন্যে মীকাত হচ্ছে হিল এবং সকলের জন্যেই তাই, চাই তারা আফাকী হোক অথবা মীকাতের ভেতরের হোক অথবা মক্কার অধিবাসী হোক। হজ্জের মীকাত মক্কাবাসীদের জন্যে হিল।

৫. ওমরার আমল শুধু ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ করা, সায়ী করা এবং মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছোট করা।

১. মুসনাদে আহমদ।

হজ্জের প্রকার

হজ্জ তিন প্রকার এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মাসায়েল রয়েছে। (১) হজ্জে এফরাদ, (২) হজ্জে কেরান, (৩) হজ্জে তামাত্তু।

হজ্জে এফরাদ

এফরাদের আভিধানিক অর্থ একাকী করা, একা কাজ করা প্রভৃতি। শরীয়াতের পরিভাষায় এফরাদ ঐ হজ্জকে বলে যার সাথে ওমরাহ্ করা হয় না, শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা হয়—এবং হজ্জের রীতি পদ্ধতি পালন করা হয়। এফরাদ হজ্জকারীকে মুফরেদ বলা হয়। মুফরেদ এহ্রাম বাঁধার সময় শুধু হজ্জের নিয়ত করবে এবং পূর্ব বর্ণিত হজ্জের রুকনগুলো পালন করবে। মুফরেদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

হজ্জে কেরান

কেরান শব্দের অর্থ দুটো জিনিসকে একত্রে মিলানো। পরিভাষা হিসেবে হজ্জ ও ওমরার এহ্রাম এক সাথে বেঁধে উভয়ের রুকন পালন করাকে হজ্জে কেরান বলে। এ হজ্জকারীকে কারেন বলে।

হজ্জে কেরান এফরাদ ও তামাত্তু উভয় থেকে উৎকৃষ্ট।[১]

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, হজ্জ ও ওমরাকে একত্রে মিলিয়ে আদায় কর। এজন্যে যে, এ দুটো দারিদ্র্য ও গুনাহ এমনভাবে নির্মূল করে দেয় যেমন আগুনের চুল্লি লোহা ও সোনা-চাঁদির ময়লা নির্মূল করে দেয়।–(তিরমিযি)

কেরানের মাসায়েল

১. হজ্জের মাসগুলোতে ওমরাহ্ করা কারেনের জন্যে জরুরী।

২. হজ্জে কেরানে ওমরার তাওয়াফ হজ্জের তাওয়াফের আগে করা ওয়াজিব। এবং ওমরার জন্যে পৃথক তাওয়াফ ও সায়ী এবং হজ্জের জন্যেও পৃথক।

৩. কেরানের ওমরায় সকল কাজ সমাধার পর হজ্জের কাজ শুরু করা মসনুন।

৪. কারেনের ওমরার পর মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছাটা নিষেধ।

---

১. ইমাম শাফেয়ীর মতে এফরাদ উৎকৃষ্ট এবং ইমাম মালেকের মতে তামাত্তু উৎকৃষ্ট। এজন্যে যে হজ্জে তামাত্তুর উল্লেখ কুরআনে আছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, কুরবানীর পশু সাথে থাকলে কেরান উৎকৃষ্ট, না থাকলে তামাত্তু উৎকৃষ্ট। আহলে হাদীসের মতে হজ্জে কেরানে ওমরা ও হজ্জের জন্যে একই তাওয়াফ ও সায়ী যথেষ্ট।

৫. কারেনের জন্যে ওমরার তাওয়াফ এবং হজ্জের তাওয়াফে কুদুম এক সাথে করা জায়েয বটে এবং উভয়ের সায়ীও এক সাথে করা জায়েয, কিন্তু এসব করা সুন্নাতের খেলাপ।

৬. কারেনের জন্যে কুরবানী ওয়াজিব। এ কুরবানী এমন শুকরিয়া আদায়ের জন্যে যে, আল্লাহ হজ্জ ও ওমরা এক সাথে আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন। কুরবানীর সামর্থ না থাকলে দশ রোযা রাখা ওয়াজিব। তিন রোযা কুরবানীর দিনের আগে এবং সাত রোযা আইয়ামে তাশরীকের পর। কুরআন বলে ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط (البقرة : ١٩٦)

"যার কুরবানী দেয়ার সামর্থ নেই, সে তিন দিন রোযা রাখবে হজ্জের সময়ে এবং সাত রোযা রাখবে যখন তোমরা হজ্জ শেষ করে ফিরবে, এ মোট দশ দিন।"

৭. হজ্জে কেরান ও তামাত্তু শুধু তাদের জন্যে যারা মীকাতের বাইরের অধিবাসী তাদেরকে আফাকী বলা হয়। কুরআন বলে ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط (البقرة : ١٩٦)

"এ (তামাত্তু ও কেরান) তাদের জন্যে যাদের পরিবার মসজিদে হারামে থাকে না। যারা মীকাতের ভেতরের অধিবাসী তাদের জন্যে শুধু হজ্জে এফরাদ।"

হজ্জে তামাত্তু

তামাত্তু শব্দের অর্থ কিছুক্ষণের জন্যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করা। পারিভাষিক অর্থে হজ্জে তামাত্তু যাকে বলা হয়, তাহলো এই যে, ওমরাহ ও হজ্জ সাথে সাথে করা। এমনভাবে করা যে, এহরাম পৃথক পৃথক বাঁধবে এবং ওমরাহ করার পর এহরাম খুলবে এবং ঐসব সুযোগ ভোগ করবে যা ইহরাম অবস্থায় হারাম ছিল। তারপর হজ্জের এহরাম বেঁধে হজ্জ করবে। এ ধরনের হজ্জে যেহেতু ওমরাহ ও হজ্জের মধ্যবর্তী সময়ে এহরাম খুলে হালাল বস্তু উপভোগ করার সময় পাওয়া যায়, সে জন্যে একে হজ্জে তামাত্তু বলে।

কুরআন বলেন–

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ج (البقرة : ١٩٦

"অতএব যে ব্যক্তি হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে ওমরার ফায়দা লাভ করতে চায় তার জন্যে তার সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী।"

হজ্জে তামাত্তু এফরাদ থেকে ভালো। এজন্যে যে এর মধ্যে দুটো ইবাদাত এক সাথে জমা করার সুযোগ পাওয়া যায়। আর কিছু অধিক ইবাদাত পদ্ধতি সমাধা করার সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

হজ্জে তামাত্তুর দুটো উপায় আছে। একটি এই যে, কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয় এই যে, হাদীর পশু সাথে করে নিবে না। প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে উৎকৃষ্ট।

তামাত্তুর মাসায়েল

১. তামাত্তুকারীর জন্যে জরুরী যে, সে ওমরার তাওয়াফ হজ্জের মাসগুলোতে করবে।[১] অথবা অন্ততপক্ষে ওমরার তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর হজ্জের সময়কালের মধ্যে হতে হবে।

২. তামাত্তু হজ্জের জন্যে জরুরী এই যে, ওমরাহ্ ও হজ্জের তাওয়াফ একই বছর হতে হবে। কেউ যদি এক বছর ওমরার তাওয়াফ করে এবং দ্বিতীয় বছর হজ্জের তাওয়াফ, তাহলে তাকে তামাত্তুকারী বলা যাবে না।

৩. তামাত্তুর জন্যে জরুরী এই যে, প্রথমে ওমরার এহরাম বাঁধতে হবে এবং এটাও জরুরী যে, হজ্জের এহরাম বাঁধার পূর্বে ওমরার তাওয়াফ করে ফেলতে হবে।

৪. তামাত্তুকারীর জন্যে জরুরী এই যে, ওমরাহ্ ও হজ্জের এহরামের মাঝখানে আলমাম করবে না। আলমামের অর্থ ওমরার এহরাম খোলার পর আপন পরিবারের মধ্যে গিয়ে পড়বে না। তবে কুরবানীর পশু সাথে করে আনলে তামাত্তু সহীহ্ হবে।

৫. হজ্জে তামাত্তু শুধু তাদের জন্যে যারা মীকাতের বাইরের অধিবাসী। যারা মক্কায় অথবা মীকাতের ভিতরে বসবাস করে তাদের জন্যে তামাত্তু ও কেরান মাকরূহ্ তাহরিমী।−(ইলমুল ফেকাহ্)

৬. তামাত্তুকারীর জন্যে তাওয়াফে কুদুম করা মসনূন এবং তার উচিত তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করা।

---

১. হজ্জের মাসগুলো হলো−শাওয়াল, যুলকাদ এবং যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন।

৭. কারেনের মতো তামাত্তুকারীর জন্যেও কুরবানী ওয়াজিব। সামর্থ না থাকলে দশ রোযা করবে—হজ্জের সময় কুরবানীর দিনের আগে তিন রোযা এবং আইয়ামে তাশরীকের পর সাত রোযা।

৮. তামাত্তুকারী যদি কুরবানীর পশু সাথে না এনে থাকে তাহলে ওমরার সায়ী এবং মাথা মুণ্ডানোর পর এহরাম খুলবে। সাথে কুরবানীর পশু আনলে এহরাম খুলবে না, ১০ই যুলহজ্জ কুরবানী করার পর এহরাম খুলবে।

নবীর বিদায় হজ্জ

নবী (স)-এর সাহাবী হযরত জাবের (রা)-এর ভাষায় ঃ-

মদীনার শেষ সাহাবী হযরত জাবের (রা)। তার মৃত্যুর পর মদীনায় আর কোনো সাহাবী ছিলেন না। তিনি খুব বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং বয়স হয়েছিল নব্বইয়েরও বেশী। দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ সে সময়ের ঘটনা যখন হযরত হুসাইন (রা)-এর পৌত্র মুহাম্মাদ বিন আলী অর্থাৎ ইমাম বাকের হযরত জাবের (রা)-এর খেদমতে হাযীর হন। ইমাম বাকের (র) বলেন, আমরা কয়েকজন তার খেদমতে হাযীর হলে তিনি প্রত্যেকের নাম ও অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। যখন আমি বললাম যে, আমি হযরত হুসাইনের পৌত্র, তখন তিনি খুবই স্নেহ সহকারে আমার মাথায় হাত বুলালেন। তারপর আমার কোরতার বুকের বোতাম খুলে আমার ঠিক বুকের মাঝখানে হাত রাখলেন। তখন আমার পূর্ণ যৌবন। তিনি বড়ো খুশী হয়ে বললেন, খোশ আমদেদ আমার ভাইপো। তুমি তো হুসাইনের স্মৃতি চিহ্ন। বল, কি জন্যে এসেছ। আমি বলতে লাগলাম ---------। তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন। এমন সময় নামাযের সময় হলো। তিনি একটা ছোট চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন। তাই নিয়ে নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। চাদর এতো ছোট ছিল যে, যখন তা কাঁধের ওপর রাখতেন—তখন তা পড়ে যেতো। এটাই তিনি গায়ে দিয়ে রাখলেন অথচ বড়ো চাদর নিকটেই রাখা ছিল। তিনি আমাদেরকে নামায পড়িয়ে দিয়ে মুক্ত হলেন তখন আমি আরজ করলাম, হযরত আমাদেরকে নবী (স)-এর বিদায় হজ্জের বিবরণ শুনিয়ে দিন।

তিনি হাতের আঙুলের নয় পর্যন্ত গুণে বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা আসার পর ন' বছর হজ্জ করেননি। হিজরতের দশম বছরে তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে দিলেন যে, তিনি হজ্জে যাবেন। এ খবর পাওয়া মাত্র বহু

লোক মদীনায় জমায়েত হতে লাগলো। প্রত্যেকেই এ আশা করছিল যে, সে হজ্জের সফরে নবীর সাথী হবে, তার হুকুম মেনে চলবে এবং তিনি যা করবেন তারাও তাই করবে।

অবশেষে মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় এসে গেল। সমস্ত কাফেলা নবীর সাথে রওয়ানা হয়ে যুলহুলায়ফা পৌঁছে অবস্থান করলো।

এখানে এক বিশেষ ঘটনা ঘটলো। কাফেলার একজন মহিলা, হযরত আবু বকর (রা)-এর স্ত্রী আসমা বিনতে ওমাইস (রা) সন্তান প্রসব করলেন। তিনি নবীকে জিজ্ঞেস করলেন—এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত। নবী (স) বললেন, এ অবস্থায় এহরামের জন্যে গোসল কর এবং এ অবস্থায় অন্যান্য মেয়েদের মতো ল্যাংগোট বাঁধ।

তারপর নবী (স) যুলহুলায়ফায় নামায পড়লেন। নামাযের পর উটনী কাসওয়ার ওপর সওয়ার হলেন। উটনী তাঁকে নিয়ে নিকটস্থ উচ্চ প্রান্তর বায়দায় পৌঁছলো। বায়দার ওপর থেকে যখন আমি চারদিকে তাকালাম তখন দেখলাম যতদূর দেখা যায় চারদিকে ডানে বামে শুধু মানুষ থৈ থৈ করছে। কিছু সওয়ারীর ওপরে, কিছু পায়ে হেঁটে। নবী ছিলেন আমাদের মাঝে। তার ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। তিনি কুরআন ভালোভাবে উপলব্ধি করছিলেন বলে আল্লাহর হুকুমে যা কিছু করতেন—আমরাও তাই করতাম। এখানে পৌঁছে তিনি উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়লেন—

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ -

"আয় আল্লাহ ! বান্দাহ তোমার দরবারে হাযীর। তোমার ডাকে তোমার দরবারে হাযীর হয়েছি। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি হাযীর আছি। প্রশংসার হকদার তুমি এবং দয়া অনুগ্রহ ও পুরস্কার দেয়ার অধিকার তোমারই। শাসন কর্তৃত্বে তোমার (এ ব্যাপারে) কোনো শরীক নেই।"

সকলেই উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পড়লো। তারা কিছু কথা যোগ করলো কিন্তু নবী (স) প্রতিবাদ করলেন না। তিনি তার তালবিয়া সর্বদা পড়তে থাকেন।

হযরত জাবের (রা) বলেন, এ সফরে আমাদের নিয়ত ছিল হজ্জ করার, ওমরাহ আমাদের করার কথা ছিল না। অবশেষে যখন আমরা নবী পাকের

সাথে বায়তুল্লাহ পৌঁছলাম, তখন তিনি প্রথমে হিজরে আসওয়াদে চুমো দিলেন। তারপর তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথমে তিন চক্করে তিনি রমল করলেন এবং পরের চার চক্করে সাধারণ গতিতে চললেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমে এসে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

"এবং মাকামে ইবরাহীমকে নিজের জন্যে ইবাদাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।"

তারপর তিনি এমনভাবে দাঁড়ালেন যে, মাকামে ইবরাহীম তার এবং বায়তুল্লাহর মাঝখানে ছিল। এখানে তিনি দু' রাকাত নামায পড়লেন, প্রথমে রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ পড়লেন। তারপর হিজরে আসওয়াদের নিকটে এসে তাকে চুমো দিলেন। তারপর সাফা পাহাড়ের দিকে চললেন। সাফার নিকটে পৌঁছে পড়লেন- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ এবং বললেন ابداء بما بداء اللّٰه به -আমি সাফা থেকে সায়ী শুরু করছি যেভাবে আল্লাহ্ এ আয়াতে তার উল্লেখ করে শুরু করেছেন।

অতএব তিনি সাফার ওপরে এতোটা উঁচুতে ওঠলেন যে বায়তুল্লাহ স্পষ্ট তার চোখের সামনে এলো। তিনি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি তাওহীদ ও তাকবীরে মশগুল হলেন।

তিনি পড়লেন ঃ

لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصر عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি এক ও একক, তার কোনো শরীক নেই। শাসন কর্তৃত্ব তার এবং তিনি প্রশংসার হকদার। তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিমান। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি এক ও একক। তিনি তার ওয়াদা পূরণ করেছেন—অর্থাৎ দ্বীনকে সমগ্র আরবে বিজয়ী করে দিয়েছেন। তিনি তার বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং কাফের মুশরিকের দলকে তিনি একাকীই পরাস্ত করেছেন।"

তিনি তিনবার একথাগুলো আবৃত্তি করলেন এবং দোয়া করলেন। তারপর নীচে নেমে মারওয়ার দিকে চললেন। মারওয়াতেও তাই বললেন যা সাফায় বলেছিলেন। এভাবে শেষ চক্কর পুরো করে মারওয়ায় পৌঁছলেন। এখানে তিনি

সাথীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি ওপরে ছিলেন এবং সাথীগণ নীচে। তিনি বললেন—

একথা শুনে সুরাকা বিন মালেক দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ হুকুম কি শুধু এ বছরের জন্যে, না চিরদিনের জন্যে ?[১]

"প্রথমে যদি একথা অনুভব করতাম যা পরে অনুভব করলাম, তাহলে হাদীর পশু সংগে আনতাম না। তাহলে এ তাওয়াফ ও সায়ীকে ওমরার তাওয়াফ ও সায়ী গণ্য করে ওমরায় পরিণত করতাম ও ইহরাম খুলে ফেলতাম। তোমাদের মধ্যে যারা হাদীর পশু সাথে আনেনি, তারা এসে ওমরার তাওয়াফ ও সায়ী মনে করে ইহরাম খুলতে পারে।"

নবী (স) জবাবে বলেন, শুধু এ বছরের জন্যে নয়, চিরদিনের জন্যে।

হযরত জাবের (রা) অতপর বলেন, হযরত আলী (রা) ইয়ামেন থেকে নবীর জন্যে অনেক কুরবানীর পশু নিয়ে মক্কায় পৌঁছেন। তিনি দেখলেন তার বিবি হযরত ফাতেমা (রা) ইহরাম খুলে ফেলেছেন। রঙিন কাপড়ও পরেছেন এবং সুরমাও লাগিয়েছেন। এসব হযরত আলী (রা) ভালো মনে না করে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। হযরত ফাতেমা (রা) বলেন, আব্বাজান আমাকে এর হুকুম দিয়েছেন। অর্থাৎ নবী (স) ইহরাম খোলার হুকুম দিয়েছেন।

নবী (স) হযরত আলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়ছিলে তখন কি নিয়ত করেছিলে—শুধু হজ্জের নিয়ত করেছিলে, না হজ্জ ও ওমরাহ উভয়ের নিয়ত করেছিলে ?

আলী (রা) বলেন, আমি বলেছিলাম, আয় আল্লাহ ! আমি ঐ জিনিসের ইহরাম বাঁধছি, যার ইহরাম তোমার রাসূল বেঁধেছেন।

নবী (স) বলেন, আমি যেহেতু আমার সাথে হাদীর পশু এনেছি, সে জন্যে আমার এহরাম খোলার কোন সুযোগ নেই। তুমিও আমার মতো নিয়ত করেছ। অতএব তোমারও ইহরাম খোলার উপায় নেই।

হযরত জাবের (রা) বলেন, ইয়ামেন থেকে হযরত আলীর নিয়ে আসা উট ও নবীর উটের মোট সংখ্যা ছিল একশ।[২]

---

১. মক্কাবাসীদের নিকটে হজ্জের মাসগুলোতে স্থায়ীভাবে ওমরাহ করা কঠিন গুনাহ মনে করা হতো। সুরাকা বিন মালেক দেখলেন যে, হজ্জের মাসগুলোতে তাওয়াফ ও সায়ীকে স্থায়ীভাবে ওমরা গণ্য করা হচ্ছে। তাই তিনি এ প্রশ্ন করেন।

২. কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায় যে, নবী (স) সাথে করে ৬৩টি উট এনেছিলেন এবং হযরত আলী (রা) ইয়ামেন থেকে এনেছিলেন ৩৭টি উট।

সকল সাহাবী নবীর নির্দেশ অনুযায়ী ইহরাম খুলে ফেলেন এবং চুল মুণ্ডন করে বা কাটিয়ে হালাল হয়ে গেলেন। তবে নবী (স) এবং যেসব সাহাবী হাদী সাথে এনেছিলেন ইহরাম অবস্থায় রইলেন।

তারপর ৮ই যুলহজ্জ লোক হজ্জের এহরাম বাঁধে যারা ওমরার পর ইহরাম খুলেছিল। নবী (স) কাসওয়ার ওপর সওয়ার হয়ে মিনা রওয়ানা হন। এখানে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর—এ পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়েন। ফজরের নামাযের পর কিছুক্ষণ তিনি মিনায় অবস্থান করেন। সূর্য ভালোভাবে ওপরে উঠে এলে তিনি আরাফাতের দিকে রওয়ানা হন। তিনি আদেশ করেন যে, 'নিমরা'[২] নামক স্থানে তার জন্যে যেন পশমের তাঁবু খাটানো হয়। কুরাইশগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নবী (স) মাশয়ারুল হারামের নিকটেই অবস্থান করবেন। কারণ, জাহেলিয়াতের যুগে সর্বদা তাই করা হতো। কিন্তু নবী (স) মাশয়ারুল হারামের সীমা অতিক্রম করে আরাফাতের সীমার মধ্যে প্রবেশ করেন। নিমরা নামক স্থানে তার নির্দেশে যে তাবু খাটানো হয়েছিল তার মধ্যে তিনি অবস্থান করেন।

তারপর বেলা যখন পড়ে গেল তখন তিনি কাসওয়ার পিঠে হাওদা বাঁধতে বলেন। হাওদা বাঁধা হলে তিনি উটনীর পিঠে চড়ে 'উরনা' প্রান্তরে পৌছলেন। ওখানে একটা উঁচু স্থানে উটের পিঠ থেকে জনতার সামনে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন–

"সমবেত জনগণ ! অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং অবৈধ পন্থায় কারো সম্পদ হস্তগত করা তোমাদের জন্যে হারাম। এটা ঠিক ঐরূপ হারাম যেমন আজকের দিন এবং এ মাস তোমাদের জন্যে হারাম (এবং তোমরা হারাম মনে কর)।

ভালো করে বুঝে নাও যে, জাহেলিয়াতের যুগের সবকিছুই আমার পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট করা হলো এবং জাহেলিয়াতের যুগের খুন মাফ করা হলো। সকলের আগে আমার বংশের খুন অর্থাৎ রাবিয়া বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিবের পুত্রের খুন মাফ করার ঘোষণা করছি। রাবিয়ার পুত্র বনী সাদ কাবিলায় দুধ পানের জন্যে থাকতো। তাকে হাযীল কাবিলার লোক খুন করে।

---

২. নিমরা প্রকৃতপক্ষে এমন এক স্থান–যেখানে হেরেমের সীমানা শেষ হয়ে আরাফাতের সীমানা শুরু হয়। জাহেলিয়াতের যুগে কুরাইশগণ হেরেমের সীমানার ভেতরে মাশয়ারুল হারামের নিকটে অবস্থান করতো এবং সাধারণ লোক অবস্থান করতো আরাফাতের ময়দানে। এজন্যে কুরাইশগণের ধারণা ছিল যে, নবী (স) ঐ স্থানেই অবস্থান করবেন। কিন্তু তিনি অবস্থান করার প্রকৃত স্থানেই তাঁবু খাটাবার আদেশ পূর্বাহ্নেই করে দিয়েছিলেন।

জাহেলিয়াত যুগের সকল সূদের দাবী পরিত্যক্ত হলো। এ ব্যাপারে আমি সকলের প্রথমে আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সূদের দাবী প্রত্যাহার করার ঘোষণা করছি। আজ তার সকল সূদের দাবী শেষ হয়ে গেল।

সমবেত জনগণ ! মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহর আমানত স্বরূপ তোমরা তাদেরকে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছ। তাদেরকে উপভোগ করা আল্লাহর কালেমা এবং আইন অনুযায়ীই তোমাদের জন্যে হালাল হয়েছে। তোমাদের স্ত্রীদের ওপর বিশেষ হক এই যে, যাদেরকে তোমরা তোমাদের বাড়ীতে আসা পসন্দ কর না, তাদেরকে যেন তোমাদের শয্যার ওপর বসতে তারা সুযোগ না দেয়। তারা যদি এ ভুল করে বসে তাহলে তাদেরকে মামুলী শাস্তি দিতে পার। তাদের বিশেষ হক তোমাদের ওপর এই যে—তোমরা সামর্থ অনুযায়ী তাদের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা করবে।

আমি তোমাদের মধ্যে হেদায়াতের এমন উৎস রেখে যাচ্ছি যদি তাকে তোমরা মজবুত করে ধর এবং তার নির্দেশে চল, তাহলে তোমরা কখনো সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। হেদায়াতের এ উৎস হচ্ছে—'আল্লাহর কেতাব'।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি কিনা। বল সেদিন তোমরা আমার সম্পর্কে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবে ?"

সমবেত জনতা এক বাক্যে বললো—আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তাবলীগের হক আদায় করেছেন। আপনি সবকিছু পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। নসীহত দানকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে কোনো কাজই বাকী রাখেননি।

একথার পর নবী (স) তাঁর শাহাদত অংগুলি আসমানের দিকে উঠিয়ে মানুষের দিকে ইংগিত করে বললেন—"আয় আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক ; আয় আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক, আয় আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক ; আমি তোমার পয়গাম, তোমার আহকাম তোমার বান্দাহদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমার বান্দাহগণও সাক্ষী যে, আমি তাবলীগের হক আদায় করেছি।"

তারপর হযরত বেলাল (রা) আযান দিলেন ও একামত বললেন। নবী (স) যোহরের নামায পড়ালেন। তারপর হযরত বেলাল (রা) দ্বিতীয়বার একামত বললেন এবং নবী (স) আসর নামায পড়ালেন। যোহর-আসর এক

সাথে পড়াবার পর তিনি ঐ স্থানে এলেন যেখানে অবস্থান করা যায়। তারপর তিনি তাঁর কাস্‌ওয়ার মুখ বড়ো বড়ো প্রস্তর খণ্ডের দিকে করে দিলেন এবং সমবেত জনগণ তাঁর সামনে হয়ে গেল। জনতা ছিল সওয়ারীবিহীন ও পদব্রজে। নবী (স) কেবলামুখী হলেন এবং ওখানেই অবস্থান করলেন। অবশেষে সূর্য অস্তমিত হলে তিনি আরাফাত থেকে মুযদালাফার দিকে রওয়ানা হলেন এবং উসামা বিন যায়েদকে তাঁর পেছনে উটের পিঠে বসিয়ে নিলেন। মুযদালফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়লেন। আযান হলো এবং দু' নামাযের জন্যে দু'বার একামত হলো। এ দু' নামাযের মধ্যে তিনি কোন সুন্নাত নফল পড়লেন না। তারপর তিনি বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়লেন। অবশেষে সুবেহ সাদেক হয়ে গেল। আযান ও একামতের পর তিনি ফজরের নামায আদায় করলেন। নামাযের পর তিনি মাশয়ারুল হারামের নিকটে এসে কেবলামুখী দাঁড়িয়ে তসবিহ তাহলীলে মশগুল হলেন। পূর্বদিক যখন বেশ ফর্সা হয়ে গেল তখন সূর্য ওঠার আগেই সেখান থেকে মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। এবার তিনি তাঁর উটের পেছন দিকে ফযল বিন আব্বাসকে বসিয়ে নেন। যখন তিনি 'মুহার উপত্যকার' মাঝে পৌঁছলেন তখন উটনীর গতি দ্রুত করে দেন। মুহার প্রান্তর থেকে বের হয়ে মাঝপথ ধরলেন যা বড়ো জুমরার নিকটে গিয়ে বের হয়েছে। তারপর ঐ জুমরায় পৌঁছে যা গাছের নিকট ছিল, তিনি পাথর মারলেন। জুমরাতে সাতটি ছোট ছোট পাথর মারলেন এবং মারার সময় "আল্লাহু আকবার" বললেন। এসব পাথর নীচু স্থান থেকে মারলেন। পাথর মারা শেষ করে কুরবানী করার স্থানে গেলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি কুরবানী যবেহ করলেন। বাকীগুলো হযরত আলী (রা)-এর দায়িত্বে ছেড়ে দিলেন। তিনি হযরত আলীকে তাঁর হাদীর মধ্যে শরীক করেছিলেন। তারপর প্রত্যেক কুরবানী থেকে এক এক টুকরা নেবার হুকুম করলেন। তা নিয়ে রান্না করা হলো। তারপর নবী (স) এবং হযরত আলী (রা) এ গোশতের কিছু খেলেন এবং শুরবা পান করলেন। তারপর নবী উটনীর পিঠে চড়ে যিয়ারতের জন্যে বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। মক্কায় পৌঁছে যোহর নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি আবদুল মুত্তালিব পরিবারের লোকদের কাছে এলেন যারা যমযমের পানি তুলে লোকদের পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন, বালতি ভরে পানি তুলে লোকদের পান করাও। যদি আমার এ আশংকা হতো যে আমাকে দেখে লোক তোমাদের নিকট থেকে এ খেদমত ছিনিয়ে নেবে, তাহলে আমি আপন হাতে তোমাদের সাথে বালতি টেনে তুলতাম। তারা নবীকে বালতি ভরে পানি দিল এবং নবী তার থেকে পান করলেন।-(মুসলিম-জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন আতিয়া থেকে বর্ণিত)

জেনায়েতের বয়ান

জেনায়েত অর্থ কোনো হারাম কাজ করা, গুনাহ্ করা প্রভৃতি। কিন্তু হজ্জ প্রসংগে জেনায়েতের অর্থ হলো—এমন কোনো কাজ করা যা হেরেমে হওয়ার কারণে অথবা এহরাম বাঁধার কারণে হারাম হয়ে যায়। জেনায়েত দু' প্রকারের—

এক ঃ জেনায়েতে হেরেম।

দুই ঃ জেনায়েতে এহরাম।

লোকের পক্ষ থেকে এমন কোনো কাজ হয়ে যায় যা হেরেমের গণ্ডির মধ্যে হারাম অথবা এমন কোনো কাজ হয় যা এহরাম অবস্থায় হারাম, তাহলে এ দুটোর ক্ষতিপূরণের জন্যে কাফ্ফারা ও কুরবানীর পৃথক পৃথক হুকুম রয়েছে, যা পরে বলা হচ্ছে।

হেরমে মক্কা ও তার মহত্ত্ব

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে বরকতপূর্ণ এবং সবচেয়ে সম্মানের গৃহ ঐটি যাকে আল্লাহ তাঁর "আপনঘর" বলে উল্লেখ করেছেন। যে ঘর তাওহীদ ও নামাযের কেন্দ্রবিন্দু এবং পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর। যা আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে তৈরী করা হয়েছিল। এ ঘর হচ্ছে হেদায়াত ও বরকতের উৎস এবং সমগ্র মানবতার আশ্রয় স্থল।

এ আল্লাহর ঘর যে মুবারক মসজিদের মাঝখানে অবস্থিত, তাকে "মসজিদুল হারাম" (সম্মানার্হ মসজিদ) বলা হয়েছে। এ দুনিয়ার সকল মসজিদ থেকে উৎকৃষ্টতমই নয়, বরঞ্চ প্রকৃত মসজিদ বলা হয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য মসজিদগুলোতে নামায এজন্যে সহীহ্ যে, ওগুলো এ মসজিদে হারামের স্থলাভিষিক্ত এবং ওদিকে মুখ করেই সকলকে নামায পড়তে হয়। মসজিদুল হারামের মহত্ত্ব এতোখানি যে, তাতে এক নামায পড়লে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়।–(ইবনে মাজাহ)

তারপর আল্লাহ্ তায়ালা শুধু এ মক্কা শহরকেই হেরেম গণ্য করেননি, বরঞ্চ তার চারদিকে কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী অঞ্চলকে হেরেমের সীমাভুক্ত করে 'হেরেম' (অর্থাৎ সম্মানযোগ্য অঞ্চল) বলে ঘোষণা করেছেন। তার মহত্ত্বের জন্যে সম্মান প্রদর্শনের কিছু রীতি-পদ্ধতি ও হুকুম-আহকাম নির্ধারিত

করে দিয়েছেন। এ সীমারেখার ভেতরে বহু কাজ এ অঞ্চলের সম্মানের জন্যে হারাম ও নাজায়েয করা হয়েছে যা সারা দুনিয়ায় জায়েয ও মুবাহ্।

হেরেমের এ সীমারেখা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ) নির্ধারণ করেন। পরে নবী (স) তাঁর রেসালাতের যুগে এ সীমারেখার তাজদীদ বা নবায়ন করেন। এ সীমারেখা সুপরিচিত ও সুপরিজ্ঞাত। মদীনার দিকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত হেরেমের সীমানা, ইয়ামেনের দিকে প্রায় এগারো কিলোমিটার, তায়েফের দিকেও তাই এবং ইরাকের দিকেও প্রায় এতো কিলোমিটার, জেদ্দার দিকে প্রায় ষোল কিলোমিটার পর্যন্ত হেরেমের সীমানা। নবী (স)-এর পরে হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত মুয়াবীয়া (রা) ঐ একই সীমারেখা নবায়ন করেন। অতএব, এ সীমারেখা এখন অতি সুপরিচিত। হেরেমের সীমারেখার মহত্ত্ব ও সম্মান আল্লাহ্ ও তাঁর দীনের সাথে সম্পর্ক ও আনুগত্যের পরিচায়ক। যতোদিন পর্যন্ত উম্মত সামগ্রিকভাবে এ ভক্তি-শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন রাখবে ততোদিন তাদের ওপর আল্লাহর হেফাযত ও রহমত অব্যাহত থাকবে এবং তারা দুনিয়াতে মাথা উঁচু করে জীবন-যাপন করতে পারবে। নবী (স) বলেন–

"আমার উম্মত যতোদিন মুকাদ্দাস হেরেমের মহত্ত্ব ও ভক্তি-শ্রদ্ধার হক আদায় করতে থাকবে, ততোদিন তারা কল্যাণ লাভ করতে থাকবে। আর যখন তারা এর সম্মান নষ্ট করবে, তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।"–(ইবনে মাজাহ)

জেনায়েতে হেরেম

১. হেরেমে উৎপন্ন বন্য তৃণলতা, ঘাস, সবুজ শ্যামল গুল্ম-গুচ্ছ কাটা বা উৎপাটন করা জেনায়েত। এ যদি কারো মালিকানাধীন না হয় তাহলে তার কাফ্ফারা এই যে, তার মূল্য আল্লাহর পথে সদকাহ্ করতে হবে, যদি কারো মালিকানাধীন হয় তাহলে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে। সদকাও করতে হবে মালিককেও মূল্য দিতে হবে।

২. ইযখির[১] কাটা বা উৎপাটন করা জায়েয। হযরত আব্বাস (রা)-এর অনুরোধে নবী (স) ইযখির কাটার অথবা উৎপাটনের অনুমতি দিয়েছিলেন।

৩. বন্য তৃণ লতা, ঝোঁপ ঝাড় হোক না কেন, কাটা বা উৎপাটন করা জেনায়েত।

১. ইযখির এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস।

৪. কোন ডাল-পালা যদি বন্য না হয়, লাগানো হয়, তাহলে তা কাটা জেনায়েত হবে না। তেমন কোনো গাছের কিছু পাতা ছেঁড়া জেনায়েত নয়। যদি তা কারো মালিকাধীন না হয়। কারো মালিকানাধীন হলে তার বিনা অনুমতিতে ছেঁড়া যাবে না। মালিক স্বয়ং ছিঁড়লে জেনায়েত হবে না।

৫. হেরেমের শিকার মারা জেনায়েত। হত্যাকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৬. হেরেমের পাখীর ডিম ভাঙা বা রান্না করা জেনায়েত। টিড্ডি মারাও জেনায়েত।

৭. কারো কাছে কিছু শিকার রয়েছে এবং সে হেরেমে প্রবেশ করছে। তার সে শিকার ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। তবে সে শিকার যদি রশি দিয়ে বাঁধা থাকে এবং রশি তার হাতে থাকে অথবা শিকার খাঁচায় আবদ্ধ আছে তাহলে তা ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব নয়।

৮. মীকাতে ইহরাম না বেঁধে হেরেমে প্রবেশ করাও জেনায়েত। এর জন্যে একটি কুরবানী ওয়াজিব।

৯. হেরেমের সীমার ভেতরে এসব মারা জেনায়েত নয়, যথা—বোলতা, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, মাছি, ছারপোকা, মশা, পিঁপড়ে প্রভৃতি এবং ঐসব জীব যা আক্রমণ করতে আসে এবং যার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা অপরিহার্য।

১০. হেরেমের বাইরে গিয়ে মাথা মুণ্ডান বা চুল ছাঁটা (ইহরাম খোলার জন্যে) জেনায়েত। তার জন্যে একটি কুরবানী ওয়াজিব।

ইহরামের জেনায়েত

ইহরামের জেনায়েত তিন প্রকার ঃ-

১. যার জন্যে দু' কুরবানী।

২. যার জন্যে এক কুরবানী।

৩. যার জন্যে সদকা ওয়াজিব।

যাতে দু' কুরবানী ওয়াজিব

১. পুরুষ যদি কোনো গাঢ় খুশবু অথবা গাঢ় মেহদী মাথায় লাগায় এবং একদিন একরাত স্থায়ী হয়, তা সমস্ত মাথায় লাগানো হোক বা এক-চতুর্থাংশ মাথায়—দুটো কুরবানী তার জন্যে ওয়াজিব। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক এমন করলে একটি কুরবানী দিতে হবে।

২. ঐসব জেনায়েত যার জন্যে হজ্জে ইফরাদকারীর একটি কুরবানী ওয়াজিব হয়, কারেনের জন্যে দু' কুরবানী ওয়াজিব হবে।

৩. তামাত্তু হজ্জকারী যদি হাদীর পশু সাথে করে আনে তাহলে তার জন্যে সকল জেনায়েতের জন্যে দু' কুরবানী, আর মুফরেদের জন্যে এক কুরবানী ওয়াজিব হবে।

যেসব জেনায়েতের জন্যে এক কুরবানী

শুধু দু' অবস্থায় উট অথবা গরু কুরবানী ওয়াজিব হয়। নতুবা যেখানে যেখানে কুরবানীর কথা বলা হয়েছে, সেখানে ছাগল অথবা ভেড়া কুরবানী বুঝতে হবে।

১. জানাবাতের অবস্থায় (যার জন্যে গোসল ফরয হয়) যদি কেউ তাওয়াফে যিয়ারত করে, তাহলে এক উট অথবা গরু কুরবানী ওয়াজিব হবে।

২. আরাফাতে অবস্থানের পর তাওয়াফে যিয়ারত অথবা মস্তক মুণ্ডনের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে উট অথবা গরু কুরবানী ওয়াজিব হবে। এ দু' অবস্থা ছাড়া অন্য সকল অবস্থায় ছাগল অথবা ভেড়া কুরবানী ওয়াজিব হবে।

৩. তাওয়াফের ওয়াজিবগুলোর মধ্যে কোনো একটি বাদ গেলে একটি কুরবানী ওয়াজিব হবে।

ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকাও তাওয়াফের ওয়াজিবগুলোর মধ্যে শামিল। এসবের মধ্যে কিছু নিষিদ্ধ কাজের কুরবানী সম্পর্কে নিম্নে মাসায়েল বয়ান করা হচ্ছে।

৪. যদি বেশী খুশবু লাগানো হয় তাহলে এক কুরবানী ওয়াজিব হবে। যদি অল্প খুশবু লাগানো হয় কিন্তু শরীরের বৃহৎ অংশে, যেমন মাথা, হাত পা প্রভৃতির ওপর মালিশ করা হয়, তাহলেও এক কুরবানী ওয়াজিব হবে।

৫. যদি একই স্থানে সমস্ত শরীরে খুশবু লাগানো হয় তাহলে এক কুরবানী এবং বিভিন্ন স্থানে সমস্ত শরীরে লাগানো হয় তাহলে প্রত্যেক স্থানের এক একটি কুরবানী ওয়াজিব হবে।

৬. খুশবু লাগানোর পর কুরবানী করা হলো কিন্তু খুশবু গেল না, তাহলে পুনরায় কুরবানী করতে হবে।

৭. খুশবুদার পোশাক পরে একদিন কাটালে এক কুরবানী ওয়াজিব হবে।

৮. তরল মেহদী মাথা, দাড়ি, হাত ও পায়ে মাখলে এক কুরবানী।

৯. সিলাই করা কাপড় পরিধান করলে কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্ত এই যে, যদি তা একদিন ও একরাত পরিধান করে থাকা হয়। তার কম সময় পরিধান করে থাকলে কুরবানী ওয়াজিব হবে না। শুধু সদকা করতে হবে। এটাও শর্ত যে, সিলাই করা কাপড় নিয়ম মাফিক পরিধান করবে। যদি কোর্তা বা শিরওয়ানী এমনি কাঁধের ওপর ফেলে রাখে এবং আস্তিনে হাত দেয়া না হয়, তাহলে জেনায়েত হবে না।

নাজাসাতে হুকমী থেকে পাক না হয়ে তাওয়াফ করলে কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে মাসয়ালা নিম্নরূপ ঃ

১০. তাওয়াফে যিয়ারত ছাড়া যে কোনো তাওয়াফ জানাবাত অবস্থায় করা হলে এক কুরবানী ওয়াজিব হবে।

১১. তাওয়াফে যিয়ারত হাদাসে আসগার অবস্থায় করা হলে এক কুরবানী ওয়াজিব এবং ওমরার তাওয়াফ হাদাসে আসগার অবস্থায় করা হলে এক কুরবানী ওয়াজিব হবে।

১২. তাওয়াফে যিয়ারতে উর্ধ সংখ্যায় তিন চক্কর বাদ পড়লে এক কুরবানী ওয়াজিব হবে এবং তিনের বেশী বাদ গেলে শুধু কুরবানীতে হবে না ; দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করতে হবে।

১৩. হজ্জের ওয়াজিবগুলোর মধ্যে কোনো ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে এক কুরবানী ওয়াজিব হবে।

১৪. মুফরেদ মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা অথবা তাওয়াফে যিয়ারত ১০ই যুলহজ্জের পরে করলে এক কুরবানী ওয়াজিব হবে।

১৫. কারেন যদি যবেহ্ করার পূর্বে অথবা রামী করার পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করে তাহলে এক কুরবানী ওয়াজিব হবে।

যেসব জেনায়েতে শুধু সদ্কা ওয়াজিব

১. খুশবু ব্যবহার এমন পরিমাণে করা যার জন্যে কুরবানী ওয়াজিব হয় না—সে অবস্থায় সদ্কা ওয়াজিব হবে।[১] যেমন, এক অংগের কম স্থানে খুশবু

১. সদ্কা অর্থ সদ্কায়ে ফিতরের পরিমাণ সদ্কা।

লাগানো হলো, অথবা পোশাক এক বর্গ বিঘত স্থানের কম অথবা বেশী স্থানে লাগানো হলো কিন্তু পুরো একদিন বা পুরো এক রাত ব্যবহার করা হলো না।

২. সেলাই করা পোশাক একদিন অথবা এক রাত্রের কম সময়ে পরিধান করা হয়েছে অথবা এতো সময় মাথা ঢাকা হয়েছে, তাহলে এক সদকা ওয়াজিব হবে। আর যদি অল্প সময়ের জন্যে মাথা ঢাকা হয়েছে অথবা সেলাই করা কাপড় পরা হয়েছে। যেমন এক ঘণ্টারও কম, তাহলে একমুষ্ঠি আটা দিলেই যথেষ্ট হবে।

৩. তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে বেদা (বিদায়ী তাওয়াফ) অথবা কোনো নফল তাওয়াফ হাদাসে আসগারের অবস্থায় করলে এক সদ্‌কা ওয়াজিব হবে।

৪. তাওয়াফে কুদুম অথবা বিদায়ী তাওয়াফ অথবা সায়ী তিন অথবা তিনবারের কম চক্কর পরিত্যাগ করলে প্রত্যেক চক্করের জন্যে এক একটি সদ্‌কা ওয়াজিব হবে।

৫. এক দিনে যতবার রামী ওয়াজিব তার অর্ধেকের কম ছেড়ে দিলে যেমন ১০ই তারিখ জুমরাতুল ওকবায় সাত রামী ওয়াজিব, তার মধ্যে কেউ তিন রামী অর্থাৎ পাথর মারা বাদ দিল। তাহলে প্রত্যেক পাথরের বদলায় এক এক সদকা ওয়াজিব হবে।

৬. কেউ অন্য কোনো ব্যক্তির মাথা অথবা ঘাড়ের চুল বানিয়ে দিল, তা সে দ্বিতীয় ব্যক্তি মুহরেম অথবা গায়রে মুহরেম হোক, তাহলে এক সদকা যে চুল বানিয়ে দেবে তার ওপর ওয়াজিব হবে।

৭. পাঁচটি নখ অথবা তার বেশী কাটিয়ে নেয়া হলো, কিন্তু এক হাত বা পায়ের নখ নয়, বিভিন্ন হাত-পায়ের, তাহলে এক সদকা ওয়াজিব হবে।

নীতিগত হেদায়াত

১. যদি একটি সদকার মূল্য অথবা কয়েকটি ওয়াজিব সদকার মূল্য একটি কুরবানীর মূল্যের সমান হয়, তা কুরবানী সস্তা হওয়ার কারণে হোক কিংবা কয়েকটি সদকার মূল্য এতো বেশী হলো যে, তা দিয়ে একটি কুরবানী খরিদ করা যায়, তাহলে সে মূল্য থেকে কিছু অর্থ কমিয়ে ফেলা উচিত যাতে করে অবশিষ্ট মূল্য কুরবানীর মূল্যের সমান না হয়।

২. হজ্জের কোনো ওয়াজিব যদি বিনা কারণে বাদ যায় তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হবে। আর যদি কোনো ওযরের কারণে বাদ পড়ে তাহলে কুরবানী ও সদকা কোনোটাই ওয়াজিব হবে না।

৩. ইহরাম অবস্থায় যে কাজ নিষিদ্ধ তা করলে কোনো সময়ে কুরবানী এবং কোনো সময়ে সদকা ওয়াজিব হয়। কুরবানী ওয়াজিব হলে এ এখতিয়ারও থাকে যে, কুরবানীর পরিবর্তে ছয়জন মিসকীনকে একটি করে সদকা দিয়ে দেয়া যায়। এ এখতিয়ারও আছে যে, যখন এবং যেখানে ইচ্ছা তিনটি রোযাও রাখা যায়।

সদকা ওয়াজিব হওয়ার পর সদকার স্থলে একটি রোযাও রাখার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

শিকারের বিনিময়

ইহরামে নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে বন্য পশু শিকারও শামিল। এ শিকার করা নিষিদ্ধ এবং শিকারে কাউকে সাহায্য করাও নিষিদ্ধ। বন্য পশু শিকার করলে তার বদলা দিতে হবে। বদলা অর্থ শিকারের মূল্য যা দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক ঠিক করে দেবে। কুরআনে আছে ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا ۢبٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط

"হে ঈমানদারগণ ! ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত শিকার করে, তাকে তার সমতুল্য এক পশু বদলা দিতে হবে। আর এর ফায়সালা তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি করবে। আর এ হাদী কা'বায় পাঠাতে হবে অথবা এ জেনায়েতের কাফ্ফারা স্বরূপ কয়েকজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে অথবা সেই পরিমাণে রোযা রাখতে হবে যাতে করে কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করতে পারে।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৯৫)

এ আয়াতে যে শিকার হারাম করা হয়েছে তা স্থল ভাগের শিকার। নদী বা সমুদ্রের শিকার জায়েয। তা খাওয়া জায়েয হোক বা না হোক। কুরআন সুস্পষ্ট করে বলে ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا ط ـ

"তোমাদের জন্যে সামুদ্রিক শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের জন্যে অবস্থান কালেও এবং কাফেলার পাথেয় হিসেবেও। কিন্তু স্থল ভাগের শিকার যতোক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় আছ তোমাদের জন্যে হারাম।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৯৬)

শিকার ও তার বদলার মাসায়েল

১. স্বয়ং শিকার করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি শিকারীর সাহায্য করাও নিষিদ্ধ। শিকারীর জন্যে যেমন বদলা দিতে হবে, সাহায্যকারীকেও বদলা দিতে হবে।

২. কয়জন মুহরেম মিলিত হয়ে কোনো শিকার করলো অথবা একজন শিকার করলো এবং অন্যান্যজন সাহায্য করলো তাহলে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা বদলা দিতে হবে।

৩. যদি একজন মুহরেম কয়েকটা শিকার করে তাহলে প্রত্যেক শিকারের জন্যে আলাদা আলাদা বদলা দিতে হবে।

৪. শুধু বন্য পশু শিকার করলে তার বদলা দিতে হবে। পালিত পশু শিকার করলে বা হত্যা করলে তার বদলা দিতে হবে না। যেমন কেউ যদি ছাগল, গরু, উট, মুরগী ইত্যাদি মারে তাহলে তার বদলা দিতে হবে না।

৫. যেসব পশুর গোশত হালাল নয়, তা যতো বড়ো হোক না কেন তার বদলা একটা ছাগল। যেমন কেউ হাতি মারল, তাহলে তার বদলায় একটা ছাগল দিতে হবে।

৬. জুঁই অথবা ফড়িং যদি তিনটার চেয়ে বেশী নিজে মারে অথবা অন্যকে মারতে আদেশ দেয় তাহলে এক সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। তিনটা অথবা তিনটার কম মারলে যা ইচ্ছা সদকা হিসেবে দিয়ে দেবে।

৭. শিকার যদি কারো মালিকানায় হয় তাহলে দ্বিগুণ বদলা দিতে হবে আল্লাহর পথে দিতে তো হবেই, মালিককে প্রস্তাবিত মূল্যও দিতে হবে।

৮. শিকার যে স্থানে করা হবে সে স্থানের এবং সে সময়ের মূল্য ওয়াজিব হবে। অন্য কোনো স্থান বা সময়ের মূল্য ধরা যাবে না। এজন্যে স্থান ও কালের জন্যে মূল্যের মধ্যে কমবেশী হয়।

৯. এটাও করা যেতে পারে যে, শিকারের সমতুল্য পশু খরিদ করে হেরেমে যবেহ্ করার জন্যে পাঠিয়ে দিতে হবে। এটাও করা যেতে পারে যে, তার মূল্য দ্বারা খাদ্যশস্য খরিদ করে প্রত্যেক মিসকীনকে এক এক সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ দিয়ে দিতে হবে। অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে সদকার পরিবর্তে এক একটি রোযা রাখতে হবে। কিন্তু প্রস্তাবিত মূল্যে যদি কোনো কুরবানী খরিদ করা না যায়, তাহলে দুটো পন্থা আছে। প্রত্যেক মিসকীনকে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ দিবে অথবা প্রত্যেক সদকার পরিবর্তে একটি করে রোযা রাখবে।

১০. যদি শিকারের প্রস্তাবিত মূল্য এতোটা না হয় যার দ্বারা এক সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ খাদ্য শস্য কেনা যায়, তাহলে যতোটুকু পাওয়া যায় সদকা করবে অথবা একটা রোযা রাখবে।

১১. বদলাতে যে সদকা দেয়া হবে তার হুকুম ও ব্যয়ের খাত তাই, যা সদকায়ে ফিতরের।

এহ্সারের বয়ান

এহ্সারের (احصار) আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া, নিষেধ করা, বিরত রাখা। পরিভাষায় এহ্সারের অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরার জন্যে ইহ্রাম বাঁধলো। তারপর হজ্জ বা ওমরায় যাওয়া থেকে তাকে বিরত রাখা হলো, এমন ব্যক্তিকে পরিভাষায় বলা হয় 'মুহাস্সার' (যাকে বিরত রাখা হয়েছে)।

ইহ্রাম বাঁধার পর হজ্জ থেকে বিরত থাকা, হজ্জ ওমরাহ্ করতে না পারা জেনায়েত। এজন্যে 'মুহাস্সারের' ওয়াজিব যে, সে এহ্সারের বদলার সাধ্যমত কুরবানী করবে। তাকে বলে 'দমে এহ্সার'। কুরআন বলে ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ج وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ط -(البقرة ١٩٦)

"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করলে তা পূরণ কর। যদি কোথাও পরিবেষ্টিত হয়ে পড় কিংবা থেমে যেতে হয়, তাহলে যে কুরবানীই পাওয়া যায় তা আল্লাহর সামনে পেশ কর এবং মাথা মুণ্ডন করো না, যতোক্ষণ না হাদীর পশু গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়।"-(সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)

এহসারের কয়েকটা উপায়

ইহরাম বাঁধার পর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ও হজ্জ করতে না পারার বহু কারণ হতে পারে যার কিছুটা উল্লেখ করা হলো ঃ

১. পথ নিরাপদ না হওয়া, দুশমনের ভয় থাকা, হত্যা ও লুণ্ঠনের ভয়, পথে কোনো হিংস্র জন্তু থাকা অথবা অন্য কোনো প্রকারে জানমালের আশংকা হওয়া।

২. ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া, এমন আশংকা যে, সামনে অগ্রসর হলে রোগ বেড়ে যাবে, দুর্বলতার কারণে আর অগ্রসর হওয়ার শক্তি না থাকা।

৩. ইহরাম বাঁধার পর নারীর সাথে কোনো মুহাররাম পুরুষ না থাকা, আছে তবে অসুস্থ হলো, অথবা মারা গেল, অথবা ঝগড়া হলো এবং সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলো কিংবা কেউ তাকে যেতে দিল না।

৪. সফর খরচ রইলো না, কম হয়ে গেল অথবা চুরি হয়ে গেল।

৫. রাস্তা ভুলে গেল এবং রাস্তা বলে দেয়ার কেউ রইলো না।

৬. কোনো নারীর ইদ্দত শুরু হলো। যেমন স্বামী তালাক দিল অথবা ইহরাম বাঁধার পর স্বামীর মৃত্যু হলো।

৭. কোনো নারী স্বামীর বিনা অনুমতিতে ইহরাম বাঁধলো এবং ইহরাম বাঁধার পর স্বামী নিষেধ করলো। এ সকল অবস্থায় ইহরাম বাঁধার পর সে ব্যক্তি মুহাস্‌সার হয়ে যাবে।

এহসারের মাসায়েল

১. এহসারের ফলে মুহাসসার সাধ্য মতো উট, গরু, ছাগল যা পারে তা-ই খরিদ করে হেরেমে পাঠিয়ে দেবে যেন তার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হয়।

২. এহসারের কুরবানী ওয়াজিব। যতোক্ষণ মুহাস্‌সারের পক্ষ থেকে হেরেমে কুরবানী করা না হয়, ততোক্ষণ মুহাস্‌সার তার ইহরাম খুলবে না। কুরবানীর পশু বা তার অর্থ পাঠাবার সময় সে যবেহ করার দিন ধার্য করে দেবে যাতে করে ঐদিন সে তার ইহরাম খুলতে পারে।

৩. ওমরাহ অথবা হজ্জে এফরাদ করতে বাধাপ্রাপ্ত হলে এক কুরবানী এবং হজ্জে কেরান বা তামাত্তু করতে না পারলে দু' কুরবানী পাঠাতে হবে বা তার অর্থ পাঠাতে হবে।

৪. এহসারের কুরবানীর গোশত মুহাস্‌সারের জন্যে খাওয়া জায়েয নয়। কারণ এটাও এক প্রকার জেনায়েতের কুরবানী।

৫. কুরবানীর পশু পাঠাবার পর যদি বাধা উত্তীর্ণ হয়ে যায় এবং এটা সম্ভব হয় যে, মুহাস্‌সার কুরবানীর পশু যবেহ হবার পূর্বে মক্কায় পৌঁছতে পারবে এবং হজ্জের সৌভাগ্য লাভ করবে। তাহলে শীঘ্রই হজ্জে রওয়ানা হওয়া তার ওপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি কুরবানীর পূর্বে পৌঁছতে না পারে এবং হজ্জের সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে রওয়ানা না হওয়াই তার জন্যে ওয়াজিব।

বদলা হজ্জ

বদলা হজ্জের অর্থ হলো নিজের স্থলে নিজের খরচায় অন্যকে দিয়ে হজ্জ করানো। এক ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে সে নিজে হজ্জে যেতে পারছে না। যেমন অসুস্থতা, অতি বার্ধক্য এবং এ ধরনের অন্য কোন কারণে। সে জন্যে তার এ সুযোগ রয়েছে যে, সে অন্য কাউকে তার স্থলাভীষিক্ত করে হজ্জে পাঠিয়ে দেবে এবং সে ব্যক্তি তার হয়ে হজ্জ করবে।

হযরত আবু রেযীন (রা) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ হয়েছেন, না তিনি হজ্জ করতে পারেন, না ওমরাহ। তিনি সওয়ারীর ওপর বসতেও পারেন না। নবী (স) বলেন—তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরাহ কর।-(তিরমিযি)

এর থেকে জানা গেল যে, অন্যের পরিবর্তেও হজ্জ করা সহীহ্‌ হবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং তার ফরয হজ্জ আদায় করতে পারে না সে অন্যকে পাঠিয়ে নিজের ফরয আদায় করতে পারে। বরঞ্চ এমন অবস্থায় নিজের ফরয আদায় করানো উচিত। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত ফরয এবং যে ব্যক্তি অন্যকে পাঠাবার সুযোগ পায় না সে অসিয়ত করে যাবে যে, তারপর তার মাল থেকে বদলা হজ্জ করাতে হবে।

এক ব্যক্তি নবী (স)-এর দরবারে হাযীর হলো এবং বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং তার জীবদ্দশায় তিনি ফরয হজ্জ আদায় করতে পারেননি। তাহলে আমি কি তার হয়ে হজ্জ করবো ? নবী (স) বললেন, যদি তার কোনো ঋণ থাকতো তাহলে তুমি তা পরিশোধ করতে ? লোকটি বললো ঃ জি হাঁ, অবশ্যই পরিশোধ করতাম। নবী (স) বলেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা তো আরও জরুরী।-(জামউল ফাওয়ায়েদ)

বদলা হজ্জ সহীহ হওয়ার শর্ত

বদলা হজ্জ সহীহ হওয়ায় ষোলটি শর্ত যার মধ্যে প্রথম পাঁচটি শর্ত তার সাথে সম্পর্কিত যে বদলা হজ্জ করাবে এবং এগারোটি শর্ত বদলা হজ্জকারীর সাথে সম্পর্কিত।

১. যে বদলা হজ্জ করাতে চায়, শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার ওপর হজ্জ ফরয হতে হবে। এমন ব্যক্তি যদি বদলা হজ্জ করায় যার ওপর হজ্জ ফরয নয় অর্থাৎ তার সামর্থ নেই, তাহলে এ বদলা হজ্জে ফরয আদায় হবে না। যেমন সে বদলা হজ্জের পর সে ব্যক্তি আর্থিক দিক দিয়ে সামর্থবান হলো এবং তার ওপর হজ্জ ফরয হলো। তখন তার করানো বদলা হজ্জের দ্বারা তার ফরয আদায় হবে না। বরঞ্চ পুনরায় বদলা হজ্জ করাতে হবে, যদি সে নিজে না পারে।

২. যে বদলা হজ্জ করাতে চায় তার স্বয়ং অক্ষম হতে হবে। তার অক্ষমতা যদি সাময়িক হয় যা দূর হওয়ার আশা আছে। তাহলে বদলা হজ্জ করাবার পর যখন সে অক্ষমতা দূর হবে তখন তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে। আর যদি অক্ষমতা স্থায়ী হয় ও তা দূর হবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, যেমন বার্ধক্যের কারণে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা অন্ধ হয়েছে তাহলে এ অক্ষমতার শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা শর্ত নয়। যদি আল্লাহ তায়ালা তার বিশেষ মেহেরবানীতে বদলা হজ্জ করাবার পর তার অক্ষমতা দূর করে দেন তাহলে পুনর্বার হজ্জ করা ফরয হবে না—ফরয আদায় হয়ে গিয়েছে বুঝতে হবে।

৩. বদলা হজ্জ করাবার পূর্বে এ অক্ষমতা প্রকাশ হওয়া দরকার। বদলা হজ্জ করাবার পর যদি অক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহলে বদলা হজ্জ ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে না, অক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার পর বদলা হজ্জ করানো জরুরী হবে।

৪. যে বদলা হজ্জ করাতে চায় তাকে স্বয়ং অন্য কাউকে হজ্জের জন্যে বলতে হবে। যদি কেউ নিজে নিজে অন্যের পক্ষ থেকে তার বলা ছাড়া হজ্জ করে তাহলে ফরয দায়মুক্ত হবে না। মরবার সময় অসিয়ত করাও বলার মধ্যেই শামিল। অবশ্য কারো ওয়ারিশ যদি মৃত ব্যক্তির অসিয়ত ছাড়া তার পক্ষ থেকে বদলা হজ্জ করে বা অন্য কারো দ্বারা করায় তাহলে ফরয আদায় হয়ে যাবে।

৫. যে বদলা হজ্জ করাবে তাকে স্বয়ং হজ্জের সমুদয় খরচ বহন করতে হবে।

৬. বদলা হজ্জকারীকে মুসলমান হতে হবে।

৭. বদলা হজ্জকারীকে হুঁশ-জ্ঞানসম্পন্ন লোক হতে হবে—পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া চলবে না।

৮. বদলা হজ্জকারীকে বুদ্ধিমান হতে হবে—নাবালেগ হলেও চলবে। বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই এমন লোকের বদলা হজ্জ চলবে না। ফরয আদায় হবে না।

৯. বদলা হজ্জকারী ইহরাম বাঁধার সময় তার পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করবে —যে বদলা হজ্জ করাচ্ছে।

১০. সেই ব্যক্তিই বদলা হজ্জ করবে যাকে হজ্জ করতে বলবে ঐ ব্যক্তি যার পক্ষ থেকে বদলা হজ্জ করা হচ্ছে। অর্থাৎ যে বদলা হজ্জ করাচ্ছে সে যাকে বদলা হজ্জ করতে বলবে একমাত্র সেই করবে। তবে যদি এ অনুমতি সে দেয় যে, অন্য কাউকে দিয়েও সে বদলা হজ্জ করাতে পারবে। তাহলে অন্য ব্যক্তির দ্বারাও বদলা হজ্জ সহীহ্ হবে।

১১. বদলা হজ্জকারী ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী হজ্জ করবে যে বদলা হজ্জ করাচ্ছে। যেমন যে ব্যক্তি বদলা হজ্জ করাচ্ছে সে যদি কেরানের কথা বলে কিংবা তামাত্তুর কথা বলে তাহলে বদলা হজ্জকারীকে তদনুযায়ী কেরান অথবা তামাত্তু হজ্জ করতে হবে।

১২. বদলা হজ্জকারী একই প্রকার হজ্জের এবং এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। দু' ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলা হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলে ফরয আদায় হবে না।

১৩. বদলা হজ্জকারী যানবাহনে করে হজ্জে যাবে—পায়ে হেঁটে নয়।

১৪. বদলা হজ্জ যে করাতে চায় তার স্থান থেকেই বদলা হজ্জকারীকে হজ্জের সফর শুরু করতে হবে। যদি মৃত ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ মাল থেকে বদলা হজ্জ করানো হয় তাহলেও এ অর্থে যেখান থেকে হজ্জের সফর শুরু করা যেতে পারে, সেখান থেকে সফর করতে হবে।

১৫. বদলা হজ্জকারী যেন হজ্জ নষ্ট না করে। হজ্জ নষ্ট করার পর তার কাযা করলে যে বদলা হজ্জ করাচ্ছে তার ফরয আদায় হবে না।

১৬. হানাফীদের মতে বদলা হজ্জকারীর জন্যে এ শর্ত আরোপের প্রয়োজন নেই যে, তাকে প্রথমে আপন ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে এবং তারপর সে বদলা হজ্জ করতে পারবে। অবশ্য আহলে হাদীসের কাছে শর্ত এই যে, প্রথমে ফরয হজ্জ করে না থাকলে সে বদলা হজ্জ করতে পারবে না।

মদীনায় উপস্থিতি

মদীনায়ে তাইয়েবাতে হাজিরা দেয়া অবশ্য হজ্জের কোনো রুকন নয়। কিন্তু মদীনার অসাধারণ মহত্ত্ব ও ফযীলত মসজিদে নববীতে নামাযের প্রভূত সওয়াব এবং নবীর দরবারে হাজিরার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মু'মিনকে মদীনায় টেনে নিয়ে যায়। চিরদিন তা-ই হয়ে এসেছে। মানুষ দূর-দূরান্তের সফর করে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তারপর দরবারে নববীতে দরূদ ও সালাম পেশ না করেই বাড়ী ফিরবে এ এক চরম বেদনাদায়ক নৈরাশ্য। তার জন্যে মু'মিনের দিল আর্তনাদ করে ওঠে।

মদীনা তাইয়েবার মহত্ত্ব ও ফযীলত

এর থেকে অধিক মহত্ত্ব ও ফযীলত মদীনার আর কি হতে পারে যে, এখানে মানবতার মহান শুভাকাঙ্ক্ষী তার জীবনের দশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এখানে তার পবিত্র হস্তে নির্মিত মসজিদ রয়েছে। যার মধ্যে তিনি তার সাহাবায়ে কেরামসহ নামায আদায় করেছেন। এখানেই সেই ঐতিহাসিক প্রান্তর রয়েছে যেখানে হক ও বাতিলের সিদ্ধান্তকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং এ পাক যমীনেই বদরের শহীদগণ শান্তিতে শায়িত রয়েছেন যাদের জন্যে গোটা উম্মাতে মুসলেমা গর্বিত। এখানেই ঐসব পাকরূহ বিশ্রাম করছে যাদেরকে তাদের জীবদ্দশায় নবী (স) বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, আর এ পাক যমীনেই রহমতের নবী স্বয়ং অবস্থান করছেন।

হিজরতের পূর্বে এ শহরের নাম ছিল ইয়াসরাব। হিজরতের পর মদীনায়ে তাইয়েবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এর নাম রেখেছেন তাবা (طابہ) বলে।[১]

তাবা, তীবা ও তাইয়েবা (طابہ - طیبہ - اور طیبہ) শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে পবিত্র ও মনোরম, সত্য কথা বলতে কি মদীনার পাক যমীন প্রকৃতপক্ষে পবিত্র ও মনোরম।

হিজরতের পর হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত বেলাল (রা) কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। কারণ এখানকার আবহাওয়া ছিল খুবই খারাপ ও অস্বাস্থ্যকর। প্রায়ই মহামারি রোগ দেখা দিত। নবী (স) দোয়া করেন, হে পরওয়ারদেগার ! মদীনার জন্যে আমাদের হৃদয়ে মহব্বত পয়দা করে দাও যেমন মক্কার জন্যে আমাদের মহব্বত রয়েছে। এখানকার জ্বর ব্যধিকে

---

১. হযরত জাবের বিন সামরা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা মদীনার নাম 'তাবা' রেখেছেন।−(মুসলিম)

হুজফার দিকে বিতাড়িত করে দাও এবং এখানকার আবহাওয়া মনোরম করে দাও।–(বুখারী)

মদীনার প্রতি নবী (স)-এর যে অসাধারণ মহব্বত ছিল এর থেকে অনুমান করা যায় যে, যখনই তিনি কোনো সফর থেকে মদীনায় ফিরতেন, তখন দূর থেকে শহরের দালান কোঠা দেখেই তিনি আনন্দে অধীর হয়ে পড়তেন এবং বলতেন, এইতো তাবা এসে গেল।[১] তারপর তিনি ঘাড়ের ওপর থেকে চাদর নামিয়ে ফেলে বলতেন, এ হচ্ছে তাইয়েবার বাতাস ওহ! কত মধুর !

তার সঙ্গী সাথীদের মধ্যে যারা ধূলাবালি থেকে বাঁচবার জন্যে মুখ ঢেকে রাখতেন তাঁদেরকে বলতেন, "মদীনার মাটিতে আরোগ্য রয়েছে।"[২]

নবী (স) বলেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, মদীনার মাটিতে সকল রোগের ওষুধ রয়েছে।

হযরত সাদ (রা) বলেন, আমার মনে হয়, নবী বলেছিলেন, এর মাটিতে কুষ্ঠরোগেরও আরোগ্য রয়েছে।[৩]

মদীনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের তাকীদ করে নবী (স) বলেছেন—

"ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হেরেম বলে ঘোষণা করেন এবং আমি মদীনাকে হেরেম ঘোষণা করছি। মদীনার দু' ধারের মধ্যবর্তী স্থানও হেরেম। এখানে না খুনখারাবি করা যাবে, না অস্ত্র ধারণ করা যাবে। গাছের পাতা পর্যন্ত ছেঁড়া যাবে না। অবশ্য পশুর খাদ্যের জন্যে তা করা যেতে পারে।"–(মুসলিম)

মদীনায় বসবাস করতে গিয়ে সেখানের দুঃখ কষ্ট স্বীকার করার ফযীলত বয়ান করে নবী (স) বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি মদীনায় দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে বসবাস করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্যে শাফায়াত করব।–(মুসলিম)

নবী (স) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সকলের প্রথমে আমি মদীনাবাসীদের শাফায়াত করব। তারপর মক্কাবাসীর এবং তারপর তায়েফবাসীর।–(তাবারানী)

হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কা ভূমিতে তাঁর বংশধরকে পুনর্বাসিত করতে গিয়ে এ দোয়া করেন–

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ (ابراهيم)

১. বুখারী, ২. জাযবুল কুলুব, ৩. আত্ তারগীব।

"অতএব (হে আল্লাহ) তুমি মানুষের অন্তঃকরণ তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদের খাদ্যের জন্যে ফলমূল দান কর। যাতে করে তারা কৃতজ্ঞ বান্দাহ হতে পারে।"–(সূরা ইবরাহীম)

নবী (স) এ দোয়ার বরাত দিয়ে মদীনার সপক্ষে কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করেন—

"আয় আল্লাহ ! ইবরাহীম (আ) তোমার খাস বান্দাহ। তোমার দোস্ত এবং তোমার নবী ছিলেন। আমিও তোমার বান্দাহ ও নবী। তিনি মক্কার কল্যাণ ও বরকতের জন্যে তোমার কাছে দোয়া করেন। আমিও মদীনার কল্যাণ ও বরকতের জন্যে তেমনি দোয়া করছি বরঞ্চ তার চেয়ে অধিক।"–(মুসলিম)

মদীনার পবিত্রতা ও দীনি গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে নবী (স) বলেন— কিয়ামত সে সময় পর্যন্ত হবে না, যতোক্ষণ না মদীনা তার ভেতর থেকে দুষ্কৃতিকারীদেরকে এমনভাবে বের করে দেবে যেমন কর্মকারের চুল্লী লোহার ময়লা বের করে দেয়।–(মুসলিম)

মদীনায় মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা করার ফযীলত বর্ণনা করে নবী (স) বলেন—

কেউ মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারলে যেন তা অবশ্যই করে। এজন্যে যে, যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তার শাফায়াত করব।–(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি)

হযরত ইবনে সাদ (রা) বলেন, হযরত আওফ বিন মালেক আশজানী (রা) স্বপ্ন দেখেন যে, হযরত ওমর (রা)-কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। এ স্বপ্নের কথা তার কাছে বলা হলে তিনি দুঃখ করে বলেন—

আমার শাহাদাতের ভাগ্য কেমন করে হবে। আমি তো আরব ভূখণ্ডেই অবস্থান করছি, স্বয়ং কোনো জেহাদেই শরীক হই না এবং লোক আমাকে সর্বদা ঘিরে রাখে। তবে হাঁ যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলেও এ অবস্থাতে তিনি আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করবেন। তারপর তিনি এ দোয়া পড়লেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ ـ

"আয় আল্লাহ ! আমাকে তোমার পথে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান কর এবং তোমার রসূলের শহরে আমার মৃত্যু দাও।"

মসজিদে নববীর মহত্ত্ব

মসজিদে নববীর বড়ো মহত্ত্ব এই যে, নবী পাক তাঁর পবিত্র হাতে এ মসজিদ তৈরী করেন এবং কয়েক বছর ধরে তার মধ্যে নামায পড়েন। এ মসজিদকে তিনি তাঁর নিজের মসজিদ বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আমার মসজিদে এক নামায পড়া অন্য মসজিদে হাজার নামাযের চেয়ে বেশী উত্তম, শুধু মসজিদুল হারাম ছাড়া।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ক্রমাগত চল্লিশ ওয়াক্ত নামায এভাবে পড়বে যে মাঝের একটি নামাযও বাদ যাবে না, তার জন্যে জাহান্নামের আগুন ও অন্যান্য আযাব মাফ করা হবে এবং এভাবে মুনাফেকী থেকেও তাকে রক্ষা করা হবে।-(মুসনাদে আহমাদ, আত-তারগীব)

নবী (স) বলেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানের মধ্যে একটি এবং আমার মিম্বর 'হাউযে কাওসার।'-(বুখারী, মুসলিম)

রওযা পাকের যিয়ারত

সেসব মুসলমান কত ভাগ্যবান ছিলেন যাদের চক্ষু শীতল হতো রাসূলে পাক (স)-এর দীদার লাভে তাঁরা সর্বদা রাসূলের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং তাঁর কথায় প্রেরণা লাভ করেছেন। এ সৌভাগ্য শুধু সাহাবায়ে কেরামের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এ সুযোগ তো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে যে, রাসূল প্রেমিকগণ তাঁর রওযা পাকে হাজিরা দেবে এবং তার দহলিজে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করবে।

০ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করলো এবং আমার মৃত্যুর পর আমার রওযা যিয়ারত করলো, সে আমার যিয়ারতের সৌভাগ্য ঠিক তার মতো লাভ করলো যে আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত লাভ করেছে।-(বায়হাকী)

০ যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করলো। যে আমার কবর যিয়ারত করলো, তার জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল। আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আমার কবর যিয়ারত করলো না, তার কোনো ওযর ওযরই নয়।-(ইলমুল ফেকাহ)

০ যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারতের জন্যে এলো এবং এছাড়া তার আর অন্য কোনো কাজ ছিল না, তার জন্যে আমার ওপর এ হক হয়ে গেল যে, আমি তার শাফায়াত করি।-(ইলমুল ফেকাহ)

রওযা পাকের যিয়ারতের হুকুম

রওযা পাক যিয়ারত করা ওয়াজেব। হাদীস থেকে তাই মনে হয়। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করলো কিন্তু আমার কবর যিয়ারত করতে এলো না সে আমার ওপর যুলুম করলো। আর এক হাদীসে আছে, যে শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আমার কবর যিয়ারত করলো না, তার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। এসব হাদীসের আলোকে ওলামায়ে কেরাম রওযা পাক যিয়ারত ওয়াজিব বলেছেন।

বস্তুত সাহাবায়ে কেরাম (রা), তাবেঈন এবং অন্যান্য ইসলামী মনীষীগণ রওযা পাক যিয়ারতের বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। হযরত ওমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল যখনই কোনো সফর থেকে আসতেন সর্বপ্রথমে রওযা পাকে গিয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করতেন।

হযরত ওমর (রা) একবার কাব আহবারকে নিয়ে মদীনা এলেন এবং সর্বপ্রথম রওযা পাকে হাজির হয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করলেন।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয সিরিয়া থেকে এ উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী বাহককে মদীনায় পাঠালেন যে, সে সেখানে পৌঁছে দরবারে রেসালাতে তাঁর (ওমর বিন আবদুল আযীয) সালাম পৌঁছাবে।

এক নজরে হজ্জের দোয়া

হজ্জের সময় বিভিন্ন স্থানে হজ্জের আরকান আদায় করতে গিয়ে দোয়া করতে হয়। সেগুলো যথাযথ এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং সে সবের তরজমাও করে দেয়া হয়েছে। দোয়াগুলোর সূচী ও পৃষ্ঠা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

আবে যমযম পানের দোয়া–২০৭ পৃঃ
তালবিয়ার পর দোয়া–১৬৬ পৃঃ
রামী করার দোয়া–১৮৭ পৃঃ
সায়ীর দোয়া–১৮২ পৃঃ
তাওয়াফের দোয়া–১৭৬ পৃঃ
দোয়া কবুলের স্থানসমূহ–২০৮ পৃঃ

কুরবানীর দোয়া–১৯৬ পৃঃ
মুলতাযিমের দোয়া–২০৭ পৃঃ
আরাফাতের ময়দানের দোয়া–১৬৮ পৃঃ

হজ্জের স্থানসমূহ

হেরমে পাক ও তার পার্শ্ববর্তী যেসব পবিত্র স্থানগুলোতে হজ্জের আমল ও রুকন আদায় করা হয় তা খুবই সম্মানের স্থান। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন। ইসলামের ইতিহাসের সাথে এগুলোর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, তা অবগত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে হজ্জ যাত্রীদের জন্যে। এর ফলে তারা হজ্জের পুরো ফায়দা হাসিল করতে পারবেন। হজ্জে তাদের সে আধ্যাত্মিক আবেগ অনুভূতি সৃষ্ট হবে যা হজ্জের প্রাণ। সেসব স্থানের নাম ও পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. বায়তুল্লাহ

এ এক চতুষ্কোণ পবিত্র গৃহ যা আল্লাহর আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) তৈরী করেছিলেন। এ আশায় করেছিলেন যে, যতোদিন দুনিয়া থাকবে ততোদিন তা সমগ্র মানবতার জন্যে হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকবে। এখান থেকেই সেই রসূলের আবির্ভাব হয় যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্যে হেদায়াতের বিরাট দায়িত্ব পালন করেন। এখান থেকেই তাঁর নেতৃত্বে এক জাতির উত্থান হয়, যারা কিয়ামত পর্যন্ত দীনের তাবলীগ ও রেসালাতের কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে থাকবে। কুরআন সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ায় আদম সন্তানের জন্যে আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরী করা হয়েছিল তা এ বায়তুল্লাহ। এটা সমগ্র বিশ্বের জন্যে কল্যাণ ও বরকতের উৎস ও হেদায়াতের কেন্দ্র। হজ্জের সময় হেরেম যিয়ারতকারীগণ এর চারদিকে পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিনয়-নম্রতা সহকারে তাওয়াফ করে।

২. বাতনে উরনা

আরাফাতের ময়দানে এক বিশেষ স্থান যা বাতনে উরনা অথবা উরনা প্রান্তর নামে প্রসিদ্ধ। বিদায় হজ্জের সময় এ প্রান্তরেই নবী (স) জনসমাবেশে ভাষণ দান করেন।

৩. জাবালে রহমাত

আরাফাতের ময়দানের এক বরকতময় পাহাড়।

৪. জাবালে কাযাহ

মুযদালফায় মাশয়ারুল হারামের নিকটে একটি পাহাড়।

৫. জাবালে আরাফাত

ময়দানে আরাফাতের এক পাহাড়। এ পাহাড়ের জন্যেই এ উপত্যকা বা প্রান্তরকে আরাফাত বা ময়দানে আরাফাত বলা হয়।

৬. হুজফা

মক্কা থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় একশ' আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম হুজফা। সিরিয়াবাসী এবং সিরিয়ার পথে আগমনকারী সকলের জন্যে হুজফা মীকাত। হেরেমে আসার জন্যে সেখানে ইহরাম বাঁধতে হয়।

৭. জুমরাত

মিনায় কিছু দূরে অবস্থিত তিনটি স্তম্ভ রয়েছে। এগুলোকে জুমরাত বলে। প্রথম স্তম্ভ যা মসজিদে খায়েফের দিকে বাজারে অবস্থিত তাকে বলে জুমরায়ে উলা। বায়তুল্লাহর দিকে অবস্থিত দ্বিতীয় স্তম্ভের নাম জুমরায়ে ওকবা। এ দুয়ের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। তার নাম জুমরায়ে ওস্তা।

৮. হেরেম

যে মক্কা শহরে বায়তুল্লাহ এবং মসজিদুল হারাম অবস্থিত তার আশেপাশের কিছু এলাকাকে হেরেম বলে। হেরেমের সীমানা নির্ধারিত আছে এবং তা সকলের জানা। প্রথমে এ সীমানা নির্ধারণ করেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তারপর নবী (স) তাঁর যামানায় এ সীমানা নবায়িত ও সত্যায়িত করেন। মদীনার দিকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার হেরেমের সীমানা। ইয়ামেনের দিকে প্রায় এগারো কিলোমিটার, তায়েফের দিকেও প্রায় এগারো কিলোমিটার এবং এতো কিলোমিটার ইরাকের দিকে। নবী (স)-এর পর হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাদের আপন আপন যুগে এ সীমানা ঠিক রাখেন। আল্লাহর দীনের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের দাবি এই যে, মুসলমান এ সীমারেখাগুলোর মহত্ত্ব, শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখবে এবং এ সীমারেখার ভেতর যেসব কাজ নিষিদ্ধ তা করা থেকে বিরত থাকবে।

৯. হাতীম

বায়তুল্লাহর উত্তর-পশ্চিমের অংশ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে কা'বা গৃহের শামিল ছিল এবং পরবর্তীকালে সংস্কারের সময় তা মূল গৃহের শামিল করা হয়নি। নবী পাকের নবুয়াতের পূর্বে আগুন লেগে কা'বা ঘরের কিছু অংশ

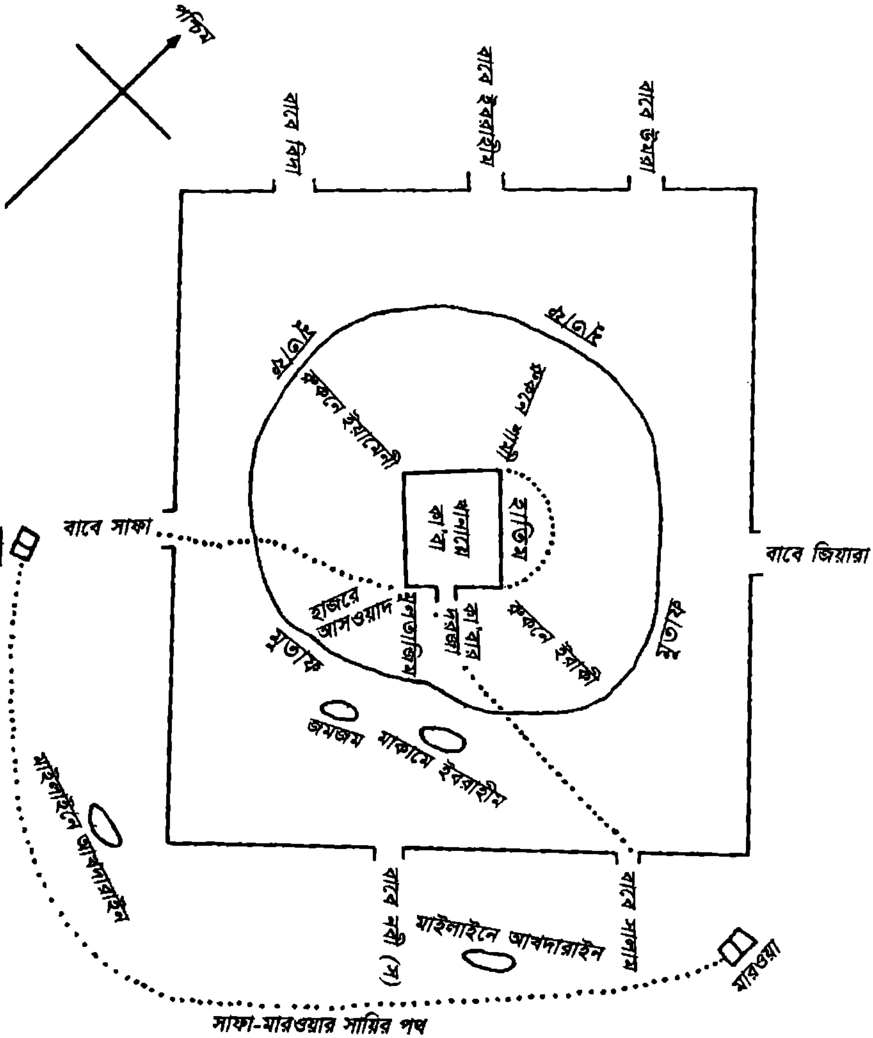

পুড়ে যায়। কুরাইশগণ পুনরায় তা নির্মাণ করতে গেলে পুঁজি কম পড়ে যায় এবং কিছু দেয়াল ছোট করে রেখে দেয়া হয়। এ অসমাপ্ত অংশকে হাতীম বলে। হাতীম যেহেতু বায়তুল্লাহরই অংশ, সে জন্যে তাওয়াফকারীগণ হাতীমের বাহির দিক দিয়ে তাওয়াফ করেন, যাতে করে হাতীমেরও তাওয়াফ হয়ে যায়।

১০. যাতে ইরাক

মক্কা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি স্থান যা ইরাকবাসীদের জন্যে মীকাত নির্ধারিত আছে এবং ঐসব লোকদেরও জন্যে ইরাকের পথে যারা হেরেমে প্রবেশ করে।

১১. যুল হুলায়ফাহ্

মদীনা থেকে মক্কা আসার পথে মদীনা থেকে আট নয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যুল হুলায়ফা নামক স্থানটি। এটা মক্কা থেকে কয়েকশ' কিলোমিটার দূরে মদীনাবাসীদের ও মদীনা থেকে আগমনকারীদের জন্যে মীকাত।

১২. রুকনে ইয়ামেনী

বায়তুল্লাহর যে কোণ ইয়ামেনের দিকে তাকে রুকনে ইয়ামেনী বলে। এটা অতি বরকতপূর্ণ স্থান। নবী (স) বলেন, রুকনে ইয়ামেনী এবং হিজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়।–(আত্-তারগীব)

১৩. যমযম

যমযম একটি ঐতিহাসিক কূপ যা বায়তুল্লাহর পূর্ব দিকে অবস্থিত। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহর হুকুমে হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাতা হযরত হাজেরাকে মক্কায় বারিহীন মরুভূমিতে এনে পুনর্বাসিত করেন তখন আল্লাহ্ তাঁদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং এ প্রস্তরময় প্রান্তরে তাঁদের জন্যে যমযমের এ ঝরণা প্রবাহিত করেন। হাদীসে এ ঝরণা ও তার পানির বড়ো ফযীলত বয়ান করা হয়েছে। নবী (স) বলেন, যমযমের পানি পেট ভরে পান করা উচিত। এ যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তা ফলদায়ক হবে। এ ক্ষুধার্তের জন্যে খাদ্য, রোগীর জন্যে আরোগ্য।

১৪. সাফা

বায়তুল্লাহর পূর্ব দিকে একটি পাহাড়ের নাম সাফা। এখন সে পাহাড়ের সামান্য চিহ্নই বাকী আছে। তার বিপরীত বায়তুল্লাহর উত্তরে মারওয়াহ

পাহাড়। এ দুয়ের মাঝখানে হেরেম দর্শনার্থীর সায়ী করা ওয়াজিব। এ সায়ীর উল্লেখ কুরআন পাকে রয়েছে।

১৫. আরাফাত

আরাফাত মক্কা থেকে প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে এক অতি প্রশস্ত ময়দান। হেরেমের সীমানা যেখানে শেষ সেখান থেকে আরাফাতের সীমানা শুরু। আরাফাতের ময়দানে পৌঁছা ও অবস্থান করা হজ্জের অতি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এ রুকন ছেড়ে দিলে হজ্জ হবে না। হাদীসে আরাফাতে অবস্থানের বড়ো ফযীলত বলা হয়েছে।

১৬. কারনুল মানাযিল

মক্কা থেকে পূর্বমুখী সড়কের ওপর এক পাহাড়ী স্থানের নাম কারনুল মানাযিল। এটা মক্কা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটা নাজদবাসীদের জন্যে এবং নাজদের পথে যারা হেরেমে প্রবেশ করে তাদের জন্যে মীকাত।

১৭. মুহাস্সাব

মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি প্রান্তর যা দুটি পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। আজকাল এটি বসতিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন তাকে 'মুয়াহেদা' বলে। নবী (স) মিনা থেকে যাবার সময় এখানে কিছুক্ষণ থেমে ছিলেন। কিন্তু এখানে থামা হজ্জের ক্রিয়াকলাপের কিছু নয়।

১৮. মুযদালফা

মিনা ও আরাফাতের একেবারে মাঝখানে এক স্থানের নাম মুযদালফা। একে জমাও বলে—এজন্যে যে, ১০ই যুলহাজ্জের রাতে হাজীদের এখানে জমা হতে হয়। মুযদালফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। অবস্থানের সময় ফজরের সূচনা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

১৯. মসজিদুল হারাম

মাসজিদুল হারাম দুনিয়ার সকল মসজদি থেকে উৎকৃষ্ট। বরঞ্চ নামাযের প্রকৃত স্থানই এ মসজিদ এবং দুনিয়ার সকল মসজিদ প্রকৃতপক্ষে এ মসজিদেরই স্থলাভিষিক্ত। এ হচ্ছে সেই মুবারক মসজিদ যার মাঝখানে আল্লাহর সেই ঘর

অবস্থিত যা দুনিয়ায় ইবাদাতের প্রথম ঘর এবং সমস্ত মানবতার হেদায়াত ও বরকতের উৎস। নবী (স) বলেন, এ মসজিদে এক নামায পড়ার সওয়াব অন্য স্থানের এক লক্ষ নামাযের সমান।

২০. মসজিদে নববী

নবী (স) যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন তখন তিনি এখানে একটি মসজিদ তৈরী করেন। নির্মাণ কাজে সাহাবীদের সাথে তিনি নিজেও বরাবর শরীক ছিলেন। তিনি বলেন, এ আমার মসজিদ। তিনি দশ বছর এ মসজিদে নামায পড়েন এবং সাহাবায়ে কেরামও বহু বছর এতে নামায পড়েন। এ মসজিদের ফযীলত ও মহত্ত্ব বর্ণনা করে নবী (স) বলেন—

শুধুমাত্র তিনটি মসজিদের জন্যে মানুষ সফর করতে পারে। মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আক্‌সা ও আমার এ মসজিদ।-(বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায এভাবে আদায় করে যে, মাঝের এক ওয়াক্তও ছুটে যাবে না, তাকে জাহান্নামের আগুন ও অন্যান্য আযাব থেকে নাজাত দেয়া হবে। এভাবে মুনাফেকী থেকেও তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে।-(আত্-তারগীব)

২১. মসজিদে খায়েফ

এ হচ্ছে মিনার একটি মসজিদ। মিনায় অবস্থানকালে হাজীগণ এ মসজিদে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর নামায আদায় করেন।

২২. মসজিদে নিমরাহ্

এ হেরেম ও আরাফাতের ঠিক সীমান্তের ওপর অবস্থিত। এ মসজিদের যে দেয়াল মক্কার দিকে রয়েছে তাই হেরেম ও আরাফাতের সংযোগস্থল। জাহিলিয়াতের যুগে কুরাইশগণ আরাফাতে না গিয়ে হেরেমের সীমার মধ্যেই অর্থাৎ মাশয়ারুল হারামের পাশেই অবস্থান করতো এবং একে নিজেদের বৈশিষ্ট্য মনে করতো। কিন্তু নবী (স) বিদায় হজ্জে এ নির্দেশ দেন যে, তাঁর তাঁবু যেন নিমরাতে খাটানো হয়। তাই করা হয়। এ স্থানেই মসজিদে নিমরা রয়েছে।

২৩. মাশয়ারুল হারাম

মুযদালফা প্রান্তরে এক উঁচু নিশানা রয়েছে। তার ধার দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে। এ স্থানকে বলে মাশয়ারুল হারাম। এখানে অধিক পরিমাণে যিকর ও

তসবীহ পাঠের তাকীদ করা হয়েছে। নবী (স) ঐ উঁচু স্থানে ওঠে তসবীহ পাঠ ও দোয়া করেন। এটাও দোয়া কবুলের একটি স্থান। কুরআন পাকেও বলা হয়েছে যে, এখানে বেশী করে আল্লাহ্‌র যিকির করতে হবে–

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ـ(البقرة : ١٩٨)

"অতএব, তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে আসবে তখন মাশয়ারুল হারামের নিকটে আল্লাহ্‌র যিকর কর যেভাবে করতে বলা হয়েছে।"

২৪. মুতাফ

বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে যে ডিম্বাকৃতির স্থান রয়েছে যার মধ্যে হাতীমও শামিল—একে মুতাফ বলে অর্থাৎ তাওয়াফ করার স্থান। এখানে দিন-রাত প্রতি মুহূর্তে মানুষ পতংগের ন্যায় বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করে। শুধু নামাযের জামায়াতের সময় তাওয়াফে বিরতি থাকে।

২৫. মাকামে ইবরাহীম

বায়তুল্লাহ্‌র উত্তর-পূর্ব দিকে কা'বার দরজার একটু দূরে একটা কোব্বা বানানো আছে। তার ভেতরে এক পবিত্র পাথর আছে যার ওপরে ইবরাহীম (আ)-এর দু পায়ের দাগ রয়েছে। একেই বলা হয় মাকামে ইবরাহীম। এটি অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতপূর্ণ স্থান এবং আল্লাহ্‌র বিরাট নিদর্শনাবলীর একটি। আল্লাহ্ বলেন–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ط ـ البقرة ١٢٥)

"এবং মাকামে ইবরাহীমকে স্থায়ী ইবাদাতগাহ বানিয়ে নাও।"

তাওয়াফের সাত চক্কর শেষ করার পর তাওয়াফকারী মাকামে ইবরাহীমের পাশে দু' রাকায়াত নামায পড়ে। নামাযের স্থান মাকামে ইবরাহীম ও কা'বার দরজার মাঝখানে। ইমাম মালেক (র) বলেন, মাকামে ইবরাহীম ঠিক ঐ স্থানেই আছে যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) রেখে গেছেন।

২৬. মুলতাযেম

বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালের ঐ অংশকে মুলতাযেম বলে যা হিজরে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মাঝখানে অবস্থিত। এটা প্রায় ছ' ফুট অংশ। এটি দোয়া

কবুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মুলতাযেম শব্দের অর্থ হলো আবিষ্ট হওয়ার স্থান অর্থাৎ বক্ষ, মুখমণ্ডল, হাত দিয়ে আবেষ্টন করার স্থান। এভাবে আবেষ্টন করে অত্যন্ত বিনয় ও আন্তরিক আবেগ সহকারে এখানে দোয়া করা মসনূন।

২৭. মিনা

হেরেমের সীমার মধ্যে মক্কা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি স্থান। যুলহজ্জের আট ও নয় তারিখের মধ্যবর্তী রাতে হাজীগণ এখানে অবস্থান করেন। ৯ই তারিখে ভালোভাবে সূর্য উদয় হওয়ার পর হাজীগণ এখান থেকে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হন।

২৮. মাইলাইনে আখ্‌দারাইনে (দু'টি সবুজ নিশানা)

সাফা মারওয়ার মাঝখানে মারওয়া যাবার পথে বাম দিকে দু'টি সবুজ চিহ্ন আছে। এ দু'টিকে বলে 'মাইলাইনে আখ্‌দারাইনে'। এ দু'টির মাঝখানে দৌড়ানো মসনূন। তবে শুধু পুরুষের জন্যে মেয়েদের জন্যে নয়।

২৯. ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সার

মুযদালফা ও মিনার মাঝ পথে একটি স্থানকে বলে মুহাস্‌সার। নবী পাক (স)-এর জন্মের কিছু দিন পূর্বে হাবশার খৃষ্টান শাসক আবরাহা বায়তুল্লাহকে ধূলিস্মাৎ করার দূরভিসন্ধিসহ মক্কা আক্রমণ করে। যখন সে এ মুহাস্‌সার প্রান্তরে পৌঁছে তখন আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের দিক থেকে বহু সংখ্যক ছোট ছোট পাখীর ঝাঁক পাঠিয়ে দেন। এসব পাখীর ঠোঁটে ও পায়ে ছোট ছোট পাথর ছিল। এসব পাথর আবরাহার সৈন্যদের উপর এমন প্রবল বেগে ও অবিরাম বর্ষণ করতে থাকে যে, গোটা সেনাবাহিনী তস্‌নস্‌ হয়ে যায়। হজ্জযাত্রীগণ এ স্থান থেকে ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে আনে এবং তাই দিয়ে রামী করে। এ সংকল্পসহ রামী করা হয় যে, দীনে হক বরবাদ করার দুরভিসন্ধি নিয়ে যদি কেউ অগ্রসর হয় তাহলে তাকেও এভাবে তস্‌নস্‌ করে দেয়া হবে যেমন পাখীর ঝাঁক আবরাহার সৈন্যবাহিনীকে করেছিল। হাজীদের উচিত এখান থেকে ছোলার পরিমাণ ছোট ছোট পাথর প্রয়োজন মতো সংগ্রহ করে নেয়া এবং অবিলম্বে এ স্থান পরিত্যাগ করা। কারণ এ হলো আযাবের স্থান।

৩০. ইয়ালামলাম

মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইয়ামেন থেকে আসার পথে একটি স্থানের নাম। এ মক্কা থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে। ইয়ামেন এবং ইয়ামেনের

দিক থেকে আগমনকারীদের মীকাত এ স্থানটি। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতবাসী হাজীদের এখানে ইহরাম বাঁধতে হয়।

পরিভাষা

১. ইহরাম

হজ্জের নিয়ত করে হজ্জের পোশাক পরিধান করা এবং তালবিয়া পড়াকে ইহরাম বলে। ইহরাম যে বাঁধে তাকে মুহরেম বলে। নামাযের জন্যে তাকবীরে তাহরিমা বলার পর যেমন খানাপিনা, চলাফেরা প্রভৃতি হারাম হয়ে যায় তেমনি ইহরাম বাঁধার পর বহু এমন সব জিনিস হারাম হয়ে যায় যা পূর্বে মুবাহ ছিল। এ জন্যে একে ইহরাম বলা হয়।

২. এহ্সার

এহসারের আভিধানিক অর্থ হলো বাধা দেয়া, বিরত রাখা। পরিভাষায় এর অর্থ হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরার নিয়ত করলো, তারপর তাকে হজ্জ বা ওমরা থেকে বিরত রাখা হলো। এমন ব্যক্তিকে বলে মুহাস্‌সার।

৩. ইস্তেলাম

এর অর্থ স্পর্শ করা, চুমো দেয়া। তাওয়াফে প্রত্যেক চক্কর শুরু করার সময় এবং তাওয়াফ শেষে হিজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা বা চুমো দেয়া সুন্নাত। রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা মুস্তাহাব।

৪. ইস্তেবাগ

চাদর এমনভাবে গায়ে দেয়া যাতে তার একধার ডান কাঁধের ওপর দেয়ার পরিবর্তে ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের ওপর ফেলতে হবে। ডান কাঁধ খোলা থাকবে। এতে চটপটে ভাব, শক্তিমত্তা ও উৎসাহ প্রকাশ পায় এবং এভাব প্রকাশ করা হয় যে, আল্লাহর সৈনিক দুশমনের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত।

৫. এতেকাফ

এতেকাফ অর্থ হলো লোক কিছু সময়ের জন্যে দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা পরিত্যাগ করে কোনো মসজিদে অবস্থান করবে এবং সেখানে যিকর, তসবীহ,

আল্লাহর ইয়াদ প্রভৃতিতে মগ্ন থাকবে। রমযানের শেষ দশ দিনে এ আমল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

৬. আফাকী

মীকাতের বাইরে বসবাসকারী লোকদেরকে আফাকী বলে।

৭. ইফরাদ

হজ্জ তিন প্রকার। তার এক প্রকার ইফরাদ। এ হজ্জকারীদের মুফরেদ বলে।

৮. আল্‌মাম

আল্‌মাম অর্থ নেমে পড়া। পরিভাষায় আল্‌মাম অর্থ ইহরাম খোলার পর আপন পরিবারের লোকজনের মধ্যে গিয়ে পড়া।

৯. উকীয়া

এক ওজন যা ৪০ দিরহামের সমান।

১০. আইয়ামে বীয

প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ আইয়ামে বীয অর্থাৎ উজ্জ্বল দিনগুলো।

১১. আইয়ামে তাশরীক

যুলহজ্জ মাসের ৯ই তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত আইয়ামে তাশরীক।

১২. তালবিয়া

হেরেম যিয়ারতকারীদের জন্যে বিশেষ দোয়া যা তারা বরাবর পড়তে থাকে।

১৩. তামাত্তু

তামাত্তু এক প্রকারের হজ্জ। হজ্জ ও ওমরা এক সাথে করা এবং উভয়ের জন্যে পৃথক পৃথক ইহরাম বাঁধা। ওমরার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। তখন

তার জন্যে ঐসব জিনিস হালাল হবে যা ইহরামের সময় হারাম। তারপর পুনরায় হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধবে। এমন ব্যক্তিকে মুতামাত্তা বলে।

১৪. তামলিক

তামলিক অর্থ মালিক বানিয়ে দেয়া। যাকাতের একটি শর্ত এই যে, যাকাতের মাল যার হাওয়ালা করা হবে তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া যাতে করে সে যেমন খুশী তেমন ভাবে তা ব্যয় করবে।

১৫. জেনায়েত

জেনায়েত অর্থ কোনো নিষিদ্ধ ও মন্দ কাজ করা। পরিভাষায় এর অর্থ হলো এমন কোনো কাজ করা যা হেরেমে থাকা অবস্থায় অথবা ইহরাম অবস্থায় করা হারাম।

১৬. দমে এহ্সার

নিয়ত করার পর কাউকে যদি হজ্জ বা ওমরা থেকে বিরত রাখা হয় তাহলে তাকে সাধ্যানুযায়ী কুরবানী করতে হয়। এ কুরবানীকে বলে "দমে এহ্সার"।

১৭. রমল

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে হেলে দুলে দ্রুত চলাকে রমল বলে।

১৮. রামী

মিনাতে কিছু দূরে দূরে তিনটি স্তম্ভ আছে। সেগুলো লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে হয়। তাকে রামী বলে। স্তম্ভগুলোকে জুমরাত বলে।

১৯. সায়েমা

সায়েমা এমন সব পশু যারা বনে-জঙ্গলে ঘাস খেয়ে বাঁচে। তাদেরকে বাড়ীতে চারা প্রভৃতি খাওয়াতে হয় না। কিন্তু দুধের জন্যে সেগুলো প্রতিপালন করা হয়।

২০. তাওয়াফে কুদুম

মক্কায় প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে কুদুম বলে। যারা মীকাতের বাইরে বসবাস করে তাদের জন্যে এটা ওয়াজিব।

২১. তাওয়াফে যিয়ারত

আরাফাতের অবস্থানের পর ১০ই যুলহজ্জ যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে যিয়ারত বলে। এ তাওয়াফ ফরয।

২২. তাওয়াফে বেদা বা বিদায়ী তাওয়াফ

বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় হবার পূর্বে যে তাওয়াফ করা হয় তা বিদায়ী তাওয়াফ। এ তাওয়াফ আফাকীদের জন্যে ওয়াজিব।

২৩. ওমরাহ

ওমরাহ হলো ছোট হজ্জ। এ যে কোনো সময় হতে পারে। যখনই সুযোগ হবে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে। সায়ী করবে এবং মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছাঁটার পর ইহরাম খুলবে। হজ্জের সাথেও ওমরাহ করা যায়, পৃথকভাবেও করা যায়।

২৪. ফিদিয়া

রোযা রাখতে না পারার কারণে শরীয়াতে অক্ষম ব্যক্তিকে এ সুযোগ দিয়েছে যে, সে তার বদলে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ খাদ্যশস্য কোনো অভাবগ্রস্তকে দেবে অথবা দু' বেলা খানা খাওয়াবে। একে পরিভাষায় ফিদিয়া বলে। শস্যের মূল্য দেয়াও জায়েয।

২৫. কেরান

হজ্জ ও ওমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধা এবং উভয়ের রুকন আদায় করা। এমন হজ্জকারীকে কারেন বলে। কেরান হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে ইফরাদ উভয় থেকে উৎকৃষ্ট।

২৬. কীরাত

এক কীরাত পাঁচ যবের সমান। বিশ কীরাতে এক মিসকাল হয়।

২৭. কাফ্‌ফারা

কোনো শরীয়াতের দৃষ্টিতে ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করার শরীয়াত যে আমল বলে দিয়েছে তাকে কাফ্‌ফারা বলে।

২৮. মিসকাল

এক প্রকার ওযনকে বলে মিসকাল। তাহলো তিন মাশা এক রতির সমান।

২৯. মুহরিম

মীকাত থেকে যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরার ইহরাম বাঁধে তাকে মুহরিম বলে।

৩০. মুহাস্‌সার

যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করার পর কোনো কারণে হজ্জ ও ওমরা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়, তাকে মুহাস্‌সার বলে।

৩১. মীকাত

মীকাত এমন এক নির্দিষ্ট স্থান যেখান থেকে ইহরাম না বাঁধলে মক্কা মুকাররমা যাওয়া নিষিদ্ধ। যে কোনো উদ্দেশ্যেই কাউকে মক্কা যেতে হোক তাকে মীকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধতে হবে। ইহরাম ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া মাকরূহ তাহরিমী।

৩২. ওয়াসাক

ওয়াসাক অর্থ এক উটের ওযন যা ৬০ সা-এর সমতুল্য।

৩৩. হাদী

শাব্দিক অর্থ তোহফা, হাদিয়া, শরীয়াতের পরিভাষায় হাদী বলতে সেই পশু বুঝায় যা হেরেম যিয়ারতকারী কুরবানীর জন্যে সাথে করে নিয়ে যায় অথবা কোনো উপায়ে সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়।

৩৪. ইয়াওমে তারবিয়া

যুলহজ্জ মাসের ৮ই তারিখকে ইয়াওমে তারবিয়া বলে। বলার অর্থ এই যে, ঐদিন হজ্জের আমল শরু হয়।

৩৫. ইয়াওমে আরাফাত

যুলহজ্জ মাসের ৯ই তারিখ অর্থাৎ হজ্জের দিনকে ইয়াওমে আরাফাত বা আরাফাতের দিন বলে। এ দিন হজ্জকারীগণ আরাফাতের ময়দানে জমায়েত হন।

৩৬. ইয়াওমে নহর

যুলহজ্জ মাসের ১০ তারিখকে ইয়াওমে নহর বলে। কারণ ঐদিন থেকে কুরবানী শুরু হয়।

সমাপ্ত